২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কী লেখক
ওরহান পামুক
সফেদ দুর্গ
অনুবাদ • তপোব্রত দাস
বাংলাবুক.অর্গ
VII
I
II
III
IV

বোরহেস, নবোকভ ও দেলিও-র সঙ্গে তুলনীয় তুর্কী লেখকের এই চমকপ্রদ সৃষ্টি একাধারে এক মনোমুগ্ধকর ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং অস্তিত্বের প্রহেলিকা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যর সম্পর্ক বিষয়ক এক উচ্চাবচ আখ্যান। সপ্তদশ শতকে ভেনিস থেকে নেপলস্ যাওয়ার পথে এক অল্পবয়সী ইতালীয় পণ্ডিতপ্রবরকে বন্দী করে কনস্ট্যানটিনোপলে চালান করা হয়। সেখানে সে বিলকুল তারই মতো দেখতে হোজা (প্রভু) নামক এক বিদ্যোৎসাহীর হাতে পড়ে। পরবর্তী বহু বছর ধরে সে দাস হিসেবে তার প্রভুকে ঔষধবিদ্যা থেকে শুরু করে আতসবাজি নির্মানের কৌশল পর্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকে। কিন্তু হোজা আরও জানতে চায় যে সে ও তার দাস যেমন মানুষ তেমন তারা হল কেন এবং পরস্পরের গোপনতম কথাগুলো জানতে পারলে কি তারা একে অপরের পরিচয়ও অদলবদল করতে পারবে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভয় জাগানো আদিমতায় পূর্ণ এক দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে রচিত সফেদ দুর্গ হল কল্পনার এক জটিল ও বহুবর্ণশোভিত দলিল।

এই মনোরম, উত্তরাধুনিক উপন্যাসে তুরস্কের অন্যতম অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক প্রতিরূপতার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে প্রভু ও তার দাসের মধ্যে এক দ্ব্যর্থব্যঞ্জক সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলেছেন। সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় যুবক তুর্কী নৌবহরের হাতে ধরা পড়লে তাকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে এমন এক বিদগ্ধ ব্যক্তি তাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করেন যাকে অনায়াসেই তার যমজ ভাই বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। হোজা অর্থাৎ তার সেই প্রভুর দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে ইতালীয় যুবকের ইউরোপীয় শিক্ষা তার প্রাপ্ত শিক্ষার থেকে উন্নততর এবং ফলস্বরূপ সে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু যুবকের জ্ঞানের অগভীরতা টের পাওয়ার পরে সে তার কাছ থেকে অন্য কথা বিশেষত তার বেড়ে ওঠার কথা জানতে চায়। তাও যখন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে তখন দাস যুবকটি সত্য ও কল্পনা মিশিয়ে নিজের নানাপ্রকার পাপের বর্ণনা দিতে শুরু করে এবং তার জন্য তার কপালে প্রহারও বরাদ্দ হয়। বছরের পর বছর ধরে একের উপর অন্যজনের প্রাধান্য পালা করে পাল্টে যেতে থাকে এবং লেখক অত্যন্ত সুচারুরূপে উভয় চরিত্রকে দর্পনের প্রতিবিম্বের মতো একে অপরের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেন। পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অটোমান সুলতানকে সাহায্য করার জন্য তারা দুজনে মিলে এক উদ্ভট যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে এবং যুদ্ধে তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা তাদের অযোগ্যতাকে প্রমাণ করে। লেখক হোজা ও তার দাসের চূড়ান্ত পরিণতি পাঠকের অনুমানের উপর ছেড়ে দিলেও তার নিপুন কূটাভাসের প্রশংসা করতেই হয়।

"সমসাময়িক উপন্যাসের অন্যতম সতেজ ও মৌলিক কণ্ঠস্বর" হিসেবে বর্ণিত ওরহান পামুক 'দ্য হোয়াইট ক্যাসল্'সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। 'দ্য ডার্কনেস অ্যাণ্ড লাইট' ও 'মি. সেভদেত্ অ্যাণ্ড হিজ সানস্'-এর পরে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তার তৃতীয় উপন্যাস 'দ্য হোয়াইট ক্যাসল্'। ১৯৯০ সালে এই উপন্যাসের জন্য তাকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর ফরেন ফিকশন' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯৯০ ও ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তার 'দ্য ব্ল্যাক বুক' ও 'নিউ লাইফ' তুর্কী সাহিত্য জগতে প্রবল সাড়া ফেলে। ২০০৩ সালে 'মাই নেম ইজ রেড' উপন্যাসের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক IMPAC পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৪ সালে ফেবার প্রকাশনী 'স্নো' উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করে এবং 'দ্য টাইমস্' তার এই উপন্যাসটিকে "বর্তমান সময়ের পক্ষে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক একটি উপন্যাস" বলে অভিহিত করে। তার লেখা 'ইস্তাম্বুল' গ্রন্থটিকেও জ্যান মরিস "অপ্রতিরোধ্যভাবে সম্মোহক" বলে অভিহিত করেছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। নোবেল প্রাপ্তির পরে তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হল 'মিউজিয়াম অফ ইনোসেন্স' (২০০৮)। তার দশম তথা সাম্প্রতিকতম উপন্যাসটি হল 'দ্য রেড-হেয়ার্ড ওম্যান' (২০১৬)। ওরহান পামুক ৭ জুন ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন ইস্তাম্বুল শহরে।

অনুবাদক : **তপোব্রত দাস**-এর জন্ম ১৯৭৪ সালে। কলকাতানিবাসী, পেশায় উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বই পড়া, ভাষাশিক্ষা ও ভ্রমণ তার শখ। সাহিত্যানুরাগ থেকেই অনুবাদের শুরু। ইতিপূর্বে কলকাতার পত্রপত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

# সফেদ দুর্গ

# *Beyaz Kale*

The White Castle

Orhan Pamuk

২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কী লেখক

# সফেদ দুর্গ

মূল : ওরহান পামুক

অনুবাদ : তপোব্রত দাস

ISBN-978-984-92298-1-0

সফেদ দুর্গ

মূল : ওরহান পামুক

অনুবাদ : তপোব্রত দাস

White Castle by Orhan Pamuk
First Published 1979



প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১২৩২

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।



২৪০.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার স্ত্রী, রিঙ্কু সরকারকে

অনুবাদকের আরো বই :

অমরত্ব / মূল : মিলান কুণ্ডেরা

# অনুবাদকের ভূমিকা

তুর্কী ভাষার বিশিষ্ট লেখক, ওরহান পামুক, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'শ্বেত প্রাসাদ' (তুর্কী শিরোনাম বেয়াজ কালে) তাঁর লেখা তৃতীয় উপন্যাস। এটি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় ও ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে।

সপ্তদশ শতকের ইস্তাম্বুলের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাস 'মুখবন্ধ'-র আকারে লিখিত 'ফ্রেম টেল' দিয়ে শুরু হয়। পামুকের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নীরব বাড়ি'তে (তুর্কী শিরোনাম সেসিজ এভ্) উল্লেখিত চরিত্র, ঐতিহাসিক ফারুক দারভিনোগ্লু এই মুখবন্ধের রচয়িতা। 'মুখবন্ধ'-র আগে উৎসর্গলিপিটিও কাল্পনিক যেখানে ফারুক তার মৃত বোনের নাম লেখেন।

বর্তমান বাংলা অনুবাদটি 'কারকানেট প্রেস লিমিটেড'-এর সহযোগিতায় 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার" কর্তৃক মুদ্রিত ও ভিক্টোরিয়া হলব্রুক দ্বারা কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা হয়েছে। এই অনুবাদটি ছাপানোর জন্য সন্দেশ প্রকাশনী ও তার কর্ণধার জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরীর প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। অনুবাদটি যদি পাঠকমহলে সমাদৃত হয় তাহলেই আমি আমার প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

—তপোব্রত দাস

মূল বইয়ের উৎসর্গপত্র

স্নেহের বোন,
নিলগুন দারভিনোগ্লু (১৯৬১-১৯৮০)-এর জন্য

যে মানুষ আমাদের মনে কৌতূহল জাগায় তার নিশ্চয় কোনো অজানা জীবনের পথে অধিগম্যতা আছে এবং সেই জীবনের রহস্যময়তার কারণেই সে অধিকতর আকর্ষণীয় এরূপ কল্পনা করা, এই বিশ্বাস রাখা যে কেবল সেই ব্যক্তির ভালবাসার হাত ধরেই আমরা বাঁচতে শুরু করব—একে যদি তীব্র কামনার জন্ম না বলা যায় তবে আর কী বলা যেতে পারে?

মার্সেল প্রুস্ত,
ওয়াই. কে. কারাওসমানোগলু-র অযথার্থ অনুবাদ থেকে

# মুখবন্ধ

আমি এই পাণ্ডুলিপিটি গোবজের শাসনকর্তার দপ্তর লাগোয়া বিস্মৃতপ্রায় মহাফেজখানা থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে খুঁজে বার করি। প্রতি গ্রীষ্মেই সপ্তাহখানেকের জন্য আমি সেখানে খোঁজাখুঁজি চালাই। একটি ধুলোভরা দেরাজে অসংখ্য রাজকীয় আদেশনামা, দখলনামা, আদালতের নিবন্ধীকরণ খাতা, গোল করে পাকানো করসংক্রান্ত কাগজপত্রের তলা থেকে আমি একে উদ্ধার করি। ফ্যাকাসে হয়ে আসা সরকারি কাগজপত্রের মধ্যে দেখামাত্র এর বাঁধাইয়ের স্বপ্নসম নীল রঙ ও উজ্জ্বল হস্তলিপিশিল্প আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাতের লেখার বিভিন্নতা থেকে আমি অনুমান করি যে আদি হস্তলিপিবিশারদের পরে অন্য কেউ, যেন আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই, বইয়ের প্রথম পাতায় একটি শিরোনাম লিখে দিয়েছে 'কম্বলওয়ালার সৎপুত্র'। আর কোনো শিরোনাম ছিল না। খালি পাতাগুলোতে ও অন্যান্য পাতার ধারের খালি অংশে ছোট মাথাওয়ালা মানুষের অসংখ্য বোতাম আঁটা পোষাক পরা বেশকিছু শিশুসুলভ ছবি আঁকা রয়েছে। তীব্র আনন্দের সঙ্গে আমি বইটি তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেললাম। তীব্র আনন্দ হলেও পাণ্ডুলিপিটির প্রতিলিপি তৈরি করার কথা ভাবতেই এত আলস্য লাগল যে আমি পাণ্ডুলিপিটিকে চুরি করাই মনস্থ করলাম। কাগজপত্রের সেই স্তূপটির এমন অবস্থা হয়েছিল যে অল্পবয়সী শাসনকর্তাও তাকে 'মহাফেজখানা' বলতে সাহস পেতেন না, আর আমার প্রতি বিশ্বাসবশত তত্ত্বাবধায়কের উদাসীনতার সুযোগে আমি চোখের পলকে পাণ্ডুলিপিটিকে আমার হাতবাক্সে চালান করে দিলাম।

বারবার পড়া বইটিকে নিয়ে আর কী করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রথমে আমার কোনো ধারণা ছিল না। ইতিহাসের প্রতি আমার অবিশ্বাস তখনো বেশ শক্তিশালী ছিল, ফলত পাণ্ডুলিপিটির বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা 'ঐতিহাসিক' মূল্য নিয়ে না ভেবে আমি কেবল কাহিনীটির উপরেই মনোনিবেশ করেছিলাম। এবার আমার লেখকের দিকে নজর পড়ল। আমি ও আমার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ার পরে আমি আমার ঠাকুরদার পেশা অর্থাৎ বিশ্বকোষ

রচনার কাজ গ্রহণ করেছিলাম। এই সময় বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে রচিত বিশ্বকোষের ইতিহাস অংশে লেখকদের নামের তালিকায় এই নামটি জুড়ে দেওয়ার কথা মাথায় এল। একে আমি আমার দায়িত্ব বলেই মনে করলাম।

বিশ্বকোষের কাজ ও আমার পানাসক্তি মেটাবার পরে যে সময় আমার হাতে পড়ে থাকত তা আমি এই কাজে লাগাতাম। সেই যুগের প্রাথমিক কিছু তথ্যসূত্রের সাহায্য নিতে গিয়ে দেখতে পেলাম যে কাহিনীতে বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনার সাথে বাস্তবের সাদৃশ্য খুব অল্পই আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে মহামাত্য হিসেবে কোপরুলুর পাঁচ বছরের কার্যকালের মধ্যে কোনো এক সময়ে এক ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ইস্তান্বুল প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কাহিনীতে বর্ণিত মহামারী হিসেবে প্লেগের আবির্ভাবের কথা তো বাদই দিন, কোনো রোগের আক্রমণ ঘটেছিল নথিপত্রে এমন কোনো প্রমাণই নেই। সেই যুগের কিছু মহামাত্যর নামের বানান ভুল লেখা হয়েছে, কিছু নাম অন্য নামের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কিছু একদম পাল্টেই দেওয়া হয়েছে। প্রাসাদের নথিতে রাজগণক হিসেবে যেসব নাম রয়েছে তার সঙ্গে কাহিনীতে উল্লেখিত নামের মিল নেই, তবে কাহিনীতে যেহেতু এই অমিলের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাই ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। অপরদিকে, আমাদের ইতিহাসের 'জ্ঞান' কিন্তু সাধারণভাবে বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলোকে সমর্থনই করেছে। এমনকি কখনো কখনো ছোটখাটো খুঁটিনাটিতেও এই 'বাস্তবধর্মিতা'র পরিচয় মেলে। উদাহরণস্বরূপ ঐতিহাসিক নাইমা রাজগণক হুসেইন এফেন্দির মৃত্যুর বা মিরাথের প্রাসাদে চতুর্থ মেহ্মেতের খরগোশ শিকারের অনুরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন। লেখক যে পড়তে ও কল্পনা করতে ভালবাসতেন তা পরিষ্কার। আমার মনে হল যে, লেখক এসব উৎস ও অন্য আরও অনেক বই, যেমন ইউরোপীয় পর্যটক বা মুক্ত দাসদের স্মৃতিকথা প্রভৃতির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন এবং নিজের বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এসব উৎস থেকেও সংগ্রহ করেছেন। তিনি হয়তো এভ্লিয়া চেলেবির ভ্রমণ বৃত্তান্তও পড়ে থাকবেন, তাকে তো তিনি চিনতেন বলেই লিখেছেন। সম্পূর্ণ উল্টোটাও সত্যি হতে পারে ধরে নিয়ে আমি আমার কাহিনীর লেখককে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু ইস্তান্বুলের গ্রন্থাগারগুলোতে গবেষণা করতে গিয়ে আমার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ১৬৫২ থেকে ১৬৮০-র মধ্যে চতুর্থ মেহ্মেতকে যত নিবন্ধ ও বই উপহার দেওয়া হয়েছিল তার একটাও আমি তোপকাপি প্রাসাদের গ্রন্থাগারে অথবা অন্য কোনো সাধারণ বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও খুঁজে পেলাম না। আমি কেবল একটিই সূত্র পেলাম এই কাহিনীতে উল্লেখিত 'বাঁহাত হস্তলিপিবিশারদ'-এর অন্যান্য কাজ এসব গ্রন্থাগারে রয়েছে। আমি কিছুদিন তাদের পিছনে দৌড়ে বেড়ালাম,

ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিরন্তর পত্রাঘাতে বিরক্ত করে তুললেও তাদের কাছ থেকে হতাশাজনক উত্তরই আসতে লাগল; গেব্জে, জেন্নেথিসার ও উস্কুদার কবরখানার বিভিন্ন সমাধিফলকে লেখকের নামের সন্ধানও অসফল থেকে গেল এবং ততদিনে আমি যথেষ্ট হাঁফিয়ে উঠেছি আমি অন্যান্য সম্ভাব্য সূত্রসন্ধান করা ছেড়ে দিলাম ও কেবল কাহিনীর উপর নির্ভর করেই বিশ্বকোষের জন্য প্রয়োজনীয় লেখাটা লিখে ফেললাম। কিন্তু আমার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে ওই প্রবন্ধটি ছাপা হল না। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের অভাবে যে ছাপা হলো না তা কিন্তু নয়, কাহিনীর বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলে মনে করা হল না বলেই তা অমুদ্রিত থেকে গেল।

সম্ভবত এই কারণেই কাহিনীটির প্রতি আমার মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেল। প্রতিবাদস্বরূপ আমি পদত্যাগ করব বলেও ভেবেছিলাম, কিন্তু আমি আমার কাজ ও বন্ধুদের ভালোবাসতাম। পরবর্তী বেশ কিছুদিন যার সঙ্গেই আমার দেখা হত তাকেই আমি কাহিনীটি এত তীব্র আবেগের সঙ্গে শোনাতাম যেন বইটি খুঁজে পাওয়ার বদলে আমিই লিখছি। কাহিনীটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আমি এর প্রতীকী মূল্য, আমাদের সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে এর প্রাসঙ্গিকতা, আমাদের নিজেদের সময়কে বোঝার জন্য এই কাহিনীর গুরুত্ব প্রভৃতি নিয়েও কথা বলতাম। অল্পবয়সীরা সাধারণত রাজনীতি, সক্রিয়তাবাদ, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্পর্ক, গণতন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে বেশি মশগুল থাকে। আমি যখন তাদের কাছে আমার দাবীগুলো পেশ করতাম তখন তারাও প্রথমে উৎসাহ বোধ করত, কিন্তু তারপর আমার পানের আসরের বন্ধুদের মতো তারাও আমার কাহিনীটির কথা ভুলে যেত। পাণ্ডুলিপিটি দেখার জন্য আমি আমার এক অধ্যাপক বন্ধুকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম। পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দিয়ে সে বলল যে এই জাতীয় কাহিনীতে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের অগুনতি গলিঘুজির অসংখ্য পুরনো বাড়িতে হাজারে হাজারে পাওয়া যাবে। ওই সমস্ত বাড়িতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ পুরনো অটোমান লিপি সমন্বিত ওইসব পাণ্ডুলিপিকে যদি আরবি কোরান ভেবে তাকের উপরে সম্মানের আসনে না রেখে থাকে, তবে সেগুলোর পাতার পর পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নির্ঘাৎ জ্বালানির প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

তাই আমার বারবার পড়া কাহিনীটি আমি নিজেই ছাপাবো বলে ঠিক করলাম। অতীব ধূমপায়ী ও চশমাপরা একটি মেয়ে অবশ্য আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। আমার পাঠকেরা দেখতেই পাবেন যে আধুনিক তুর্কী ভাষায় ছাপানোর জন্য আমি এর লিখনশৈলীতে কোনো পরিবর্তন করিনি। পাণ্ডুলিপিটি থেকে কয়েক পাতা পড়ার পরে তাকে একটি টেবিলের উপর রেখে আমি পাশের ঘরে চলে যেতাম এবং আমার মাথায় যতটুকু থেকে যেত তা সেখানে বসে আজকের রীতি অনুযায়ী লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম। বইটির শিরোনাম কিন্তু আমি ঠিক করিনি, যে

প্রকাশনা সংস্থা বইটি ছাপতে রাজি হয়েছে তারাই এই নাম ঠিক করেছে। শুরুতে উৎসর্গলিপি দেখে তার কোনো ব্যক্তিগত তাৎপর্য আছে কি না তা পাঠক জানতে চাইতে পারেন। আমার মনে হয় প্রতিটি জিনিসকেই অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখাটা বর্তমান সময়ের নেশা। এর জন্যই তো এই কাহিনী প্রকাশ করে আমি সেই রোগের হাতেই ধরা দিয়েছি।

ফারুক দারভিনোগ্‌লু

# সফেদ দুর্গ

## ১

তুর্কী নৌবহর যখন দেখা গেল তখন আমরা ভেনিস থেকে নেপলসের দিকে যাচ্ছিলাম। সর্বমোট তিনটি জাহাজ নজরে এল, কিন্তু কুয়াশা ভেদ করে তাদের একের পর এক বেরিয়ে আসা দেখে নৌবহরকে অনন্ত বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের স্নায়ু আর বশে রইল না, জাহাজে মুহূর্তের মধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল এবং আমাদের দাঁড়ীরা আনন্দে চিৎকার করতে লাগল। তাদের অধিকাংশই ছিল তুর্কী আফ্রিকীয় আরব। বাকি দুইটি জাহাজের মতো আমাদেরটার গলুইও পশ্চিমদিকে স্থলাভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু ওদের মতো আমরা গতি তুলতে পারলাম না। ধরা পড়লে পাছে শাস্তির মুখে পড়তে হয় এই ভয়ে আমাদের ক্যাপ্টেন দাঁড়ে বসা বন্দীদের উপর চাবুক চালানোর হুকুম দিতে সাহস করলেন না। পরবর্তী জীবনে আমার প্রায়শই মনে হয়েছে যে ভীরুতার ওই মুহূর্তই আমার গোটা জীবনটাকে পাল্টে দিয়েছিল।

এখন আমার মনে হয় যে আমাদের ক্যাপ্টেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে না পড়লে আমার জীবনটা অন্যরকম হত। বহু মানুষই বিশ্বাস করেন যে জীবনের কোনো কিছুই আগে থেকে নির্ধারিত থাকে না এবং সব গল্পই আবশ্যিকভাবে সমাপতনের এক শৃঙ্খলমাত্র। কিন্তু তারাও যখন পিছনপানে তাকান তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে যেসব ঘটনাকে তারা দৈবাৎ ভেবেছিলেন তা আসলে ছিল অমোঘ। আমি এখন সেই মুহূর্তে উপনীত হয়েছি। এক পুরনো টেবিলে বসে লিখতে লিখতে কুয়াশার মধ্যে থেকে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে আসা তুর্কী জাহাজের রঙ আমার চোখে ভাসছে। এখনই তো মনে হয় গল্প বলার সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

তুর্কী জাহাজের নাগাল এড়িয়ে বাকী দুটি জাহাজকে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখে আমাদের ক্যাপ্টেনের বুকে বল এল। অবশেষে তিনি দাঁড়ীদের চাবুক মারার সাহস করে উঠতে পারলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। স্বাধীনতার আবেগ প্রজ্বলিত হওয়ায় দাসদের চাবুক মেরেও কথা শোনানো গেল না। কুয়াশার দেওয়াল ভেদ করে দশটারও বেশী বহুবর্ণে সজ্জিত তুর্কী জাহাজ হঠাৎই আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। তখন আমাদের ক্যাপ্টেন লড়াই করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সিদ্ধান্তে শত্রুকে জয় করার থেকে নিজেদের ভয় ও লজ্জাকে জয় করার ইচ্ছাই বেশি পরিস্ফুট ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। তিনি দাসদের নির্দয়ভাবে চাবকানোর ও কামান প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আবেগ যেমন দেরিতে

জ্বলেছিল তেমনই দ্রুত নিভেও গেল। আমরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাঝে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ লড়াই বন্ধ না করলে আমাদের জাহাজ ডুবেই যেত, আমরা আত্মসমর্পণের পতাকা উত্তোলন করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

শান্ত সমুদ্রের বুকে এবার তুর্কী জাহাজগুলোর আমাদের জাহাজের গায়ে এসে ভিড়তে লাগল। ইতিমধ্যে আমি আমার ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগলাম, যেন আমার জীবন বদলে দিতে উদ্যত চিরশত্রুদের বদলে আমার কিছু বন্ধু বেড়াতে আসছে। ছোট্ট পেটিকা খুলে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। ফ্লোরেন্স থেকে বড় সাধ করে আমি একটি বহুমূল্য বই কিনেছিলাম, তার পাতা ওল্টাতে গিয়ে আমার চোখ জলে ভরে এল। বাইরে চিৎকার, ব্যস্ত পায়ের ছোটাছুটি, গর্জন শোনা যাচ্ছিল। আমি জানতাম, যে কোনো মুহূর্তে আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নেওয়া হবে, তবু আমি তা নিয়ে না ভেবে ওই বইয়ে লিখিত বিষয়ের কথাই কেবল ভাবতে চেষ্টা করছিলাম যেন ওতে উল্লেখিত যাবতীয় ভাবনা, বাক্য ও সমীকরণের মধ্যেই আমার সম্পূর্ণ অতীত ধরা আছে এবং সেই অতীতকে হারিয়ে ফেলব ভেবে আমি আশঙ্কায় ভুগছি। ওই বইয়ের যত্রতত্র থেকে যা চোখে পড়ল তাই আমি দমবন্ধ করে প্রার্থনা উচ্চারণের ভঙ্গিতে পড়ে যেতে লাগলাম। গোটা বইটাকেই স্মৃতিতে ধরে রাখতে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম; যাতে ওরা যখন সত্যি সত্যিই এসে পড়বে যখন তখন যেন ওদের কাছ থেকে প্রাপ্য যন্ত্রণার কথা না ভেবে আমি ভালবাসার কোনো বইয়ের প্রিয় শব্দগুচ্ছের মধ্যে ডুবে থাকার মতো আমার অতীতের রঙীন স্মৃতিতে নিমজ্জিত থাকতে পারি।

সেই সময়ে আমি ছিলাম এক ভিন্ন মানুষ। আমার মা, প্রেমিক ও বন্ধুরা এক অন্য নামে আমায় ডাকত। অতীতে যে মানুষটা আমি ছিলাম বা ছিলাম বলে আমার এখনকার বিশ্বাস সেই মানুষটাকে আমি এখনো কদাচিৎ স্বপ্নে দেখি আর ঘামে ভিজে গিয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই মানুষটি আমার মনে জাগিয়ে তোলে অস্তিত্বহীন সব জায়গা ও নানান প্রাণী এবং পরবর্তীকালে বছরের পর বছর ধরে আমাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন অবিশ্বাস্য অস্ত্র সম্বন্ধে ফ্যাকাসে হয়ে আসা এক স্বপ্নালু আবছায়া। সেই মানুষটার তখন বয়স ছিল তেইশ, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে সে সবে 'বিজ্ঞান ও কলা' অধ্যয়ন শেষ করেছে, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও চিত্রকলা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জানে বলে সে তখন বিশ্বাস করে। সে অবশ্যই গর্বিত ছিল : নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিষয়গুলোর অধিকাংশই আত্মস্থ করার পরে সবকিছুতেই সে মাথা গলাতে চেয়েছিল, সে যে আরও অনেক উন্নতি করবে ও তার সমকক্ষ যে কেউ নেই এই নিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, সে এও জানত যে অন্য যে কোনো কারোর থেকে সে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও সৃজনশীল। সংক্ষেপে, সে ছিল এক গড়পড়তা যুবক। নিজের অতীত খুঁড়তে গিয়ে এটা ভাবলে আমার এখন কষ্ট হয় যে যে যুবক নিজের প্রেমিকার সাথে তার আবেগ-উদ্দীপনা, পরিকল্পনা, দুনিয়া, বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে কথা বলত সে আসলে আমি, তাকে মনোহারী লাগাটাই তার প্রেমিকার কাছে স্বাভাবিক বলে যার মনে হত সেও এই আমিই। কিন্তু এই ভেবে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে অন্তত কিছু মানুষ কোনো একদিন আমার এই লেখা ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং আমি বলতে যে কেবল সেই যুবকটিই নয় তা বুঝতে পারবে। এখন আমি যেমন ভাবি

তেমনই সেই ধৈর্য্যশীল পাঠকরাও তার মূল্যবান বইগুলো পড়তে পড়তে হয়তো ভাববেন যে সেই যুবক তার জীবনকে বয়ে যেতে দিলেও পরবর্তীকালে আবার সেই ছেদবিন্দু থেকেই সে তার যাত্রা শুরু করেছিল।

তুর্কী সৈন্যরা যখন পাটাতন লাগিয়ে আমাদের জাহাজে উঠে এল তখন আমি বইগুলোকে পেটিকার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বাইরে উঁকি দিলাম। জাহাজে ততক্ষণে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। ওরা ডেকের উপরে সবাইকে জড়ো করে নগ্ন করে দিচ্ছিল। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিতে পারি কিনা সেই ভাবনাটা এক মুহূর্তের জন্য আমার মাথায় খেলেছিল, কিন্তু তারপর আমি ভাবলাম যে ওরা জলের মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে বা আমাকে বন্দী করে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে পারে আর তাছাড়া আমি তো এও জানি না যে আমরা ডাঙার কত কাছে রয়েছি। প্রথমে আমার দিকে কেউ নজরই দিল না। মুসলমান দাসেরা শৃঙ্খলের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে চিৎকার করছিল। যারা চাবুক মেরেছিল তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি দল ঝাঁপিয়ে পড়ল। শীঘ্রই ওরা আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল, আমার ঘরে ঢুকে যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করে দিল। সোনার লোভে ওরা আমার পেটিকাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল। আমার যাবতীয় জামাকাপড় ও কিছু বইপত্র নিয়ে নেওয়ার পরে একজন আমাকে খামচে ধরে ওদের এক ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেল। যেতে যেতে পড়ে থাকা বইগুলোর দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করল। পরে জেনেছিলাম যে জেনোয়ানিবাসী ক্যাপ্টেন এখানে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। সে আমার পেশা সম্বন্ধে জানতে চাইল। দাঁড়ে বসা এড়ানোর জন্য আমি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলাম যে জ্যোতির্বিদ্যা ও নৈশ জাহাজ চালনায় আমার ব্যুৎপত্তি আছে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। তারপর আমি নিজেকে চিকিৎসক বলে জাহির করলাম, শারীরবিদ্যার যে বইটা ওরা ফেলে রেখে এসেছিল সেটাই ছিল আমার একমাত্র ভরসা। আমাকে তখন হাত-কাটা এক ব্যক্তিকে এনে দেখানো হল, কিন্তু আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম যে আমি তো শল্য চিকিৎসক নই। এতে ওরা রেগে গেল। ওরা আমাকে দাঁড়ে বসিয়েই দিচ্ছিল কিন্তু আমার বইগুলো লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞেস করল যে আমি প্রস্রাব ও নাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানি কিনা। জানি বলাতে দাঁড়ে বসা থেকে আমি রেহাই পেলাম এবং এমনকি কয়েকটা বইও ফেরত পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এই বিশেষ সুবিধার জন্য আমাকে প্রচুর মূল্য চোকাতে হল। অন্যান্য যেসব খ্রিস্টানদের দাঁড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ ঘৃণা করতে শুরু করল। রাতে খোলের মধ্যে আমাদের যখন আটকে রাখা হত তখন তারা হয়তো আমাকে মেরেই ফেলত, কিন্তু তাদের মনে একটা ভয় ছিল কারণ আমি তুর্কীদের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিলাম। আমাদের ভীতু ক্যাপ্টেনের সদ্য প্রাণ গিয়েছিল এবং আমাদের প্রতি সতর্কতাবার্তাস্বরূপ দাসদের চাবুক মেরেছিল যেসব নাবিক তাদের নাক ও কান কেটে কাঠের ভেলায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি মূলত আমার সাধারণ বোধবুদ্ধির উপর ভরসা করেই কয়েকজন তুর্কীর চিকিৎসা করলাম এবং তাদের ক্ষতও আপনাআপনি সেরে গেল। ফলে প্রত্যেকেই আমাকে চিকিৎসক বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল। এমনকি যেসব

হিংসুক খ্রিস্টান তুর্কীদের জানিয়েছিল যে আমি কোনো চিকিৎসকই নই তারাও রাতে খোলের মধ্যে আমাকে তাদের ক্ষত দেখিয়ে নিল।

তাক-লাগানো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করলাম। আমাদের বলা হল যে বালক সুলতান বিজয়োৎসব উদ্‌যাপনে উপস্থিত আছেন। প্রতিটি মাস্তুলে ওরা ওদের নিশান উড়িয়ে দিল আর তলায় ঝুলতে লাগল আমাদের পতাকা। আমাদের প্রতীক কুমারী মেরী ও ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। জাহাজে লাফ দিয়ে উঠে পড়া আবেগপ্রবণ নাগরিকরা তাদেরকেই নিজেদের নিশানা করে নিল। কামান থেকে আকাশে গোলা ছোঁড়া হচ্ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে দুঃখ, বিরক্তি ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতিসহ এই উৎসবানুষ্ঠান আমাকে আরও অনেকের মতো ডাঙা থেকে দেখতে হবে। কিন্তু সেদিনের সেই অনুষ্ঠান এত দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল যে অনেক চমকপ্রদ দৃশ্যই সূর্যের আলোয় হারিয়ে গেল। সন্ধ্যার মুখে আমরা কাশিমপাশায় নোঙর ফেললাম। সুলতানের সামনে পেশ করার আগে ওরা আমাদের শিকলে বাঁধল, বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে আমাদের সৈন্যদের অস্ত্রাদি আবার শরীরে বেঁধে নিতে বাধ্য করল এবং আমাদের পদস্থ আধিকারিকদের গলায় লোহার নাল পরিয়ে দিল। আমাদের জাহাজ থেকে লুটে আনা শিঙা ও ট্রাম্পেট বিজয়ীর ঔদ্ধত্যে ফুঁকতে ফুঁকতে ওরা আমাদের প্রাসাদে নিয়ে এল। শহরবাসীরা রাস্তার দু'পারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আমোদ ও কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখছিল। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকেই সুলতান নিজের ভাগের দাসদের বেছে নিলেন। তারপর ওরা আমাদের পালতোলা জাহাজে চাপিয়ে সোনালি শিঙা পার করে গালাতায় নিয়ে এল এবং সাদিক পাশার কারাগারে ঠুসে দিল।

জেলখানাটা ছিল এক ভয়ংকর পূতিগন্ধময় জায়গা। স্যাঁতসেঁতে, ঘুপচি নোংরা ঘরগুলোর মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে বন্দী পচত। আমার নতুন পেশা অনুশীলনের জন্য সেখানে আমি অনেককে পেয়ে গেলাম এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি সারিয়েও তুললাম। পিঠ বা পায়ের যন্ত্রণায় কাতর রক্ষীদের জন্যও আমি নিদান লিখে দিতে লাগলাম। ফলে, এখানেও আমাকে তারা বাকিদের চেয়ে অন্য চোখে দেখতে লাগল এবং সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার আছে এমন একটা কুঠুরি আমাকে দেওয়া হল। অন্যদের হাল দেখার পরে আমি নিজের পরিস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই চেষ্টা করতাম, কিন্তু একদিন সকালবেলা বাকি বন্দীদের সঙ্গে আমাকেও জাগিয়ে তুলে জানিয়ে দেওয়া হল যে কাজে যেতে হবে। ঔষধ ও বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্পন্ন ডাক্তার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আমি যখন প্রতিবাদ জানালাম তখন তারা কেবল হাসল। পাশার বাগানের চারিধারে পাঁচিল দেওয়া হবে, ফলে লোকের প্রয়োজন ছিল। প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের সবাইকে এক সাথে শিকলে বেঁধে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হত। সারাদিন ধরে পাথর সংগ্রহের পরে সন্ধ্যাবেলায় আবার পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে আমরা যখন জেলখানায় ফিরে আসতাম তখন ইস্তাম্বুলকে প্রকৃতই সুন্দর একটি শহর বলে মনে হত। তবে এটাও আমি বুঝেছিলাম যে এই শহরে থাকতে গেলে মালিকই হতে হবে, দাস নয়।

তথাপি আমি কোনো সাধারণ দাস ছিলাম না। আমি যে চিকিৎসক তা লোকের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে এখন জেলখানায় পচতে থাকা দাসদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও চিকিৎসা করতে হত। চিকিৎসা করে আমি যা উপার্জন করতাম তার একটা বড় অংশই

আমাকে রক্ষীদের দিয়ে দিতে হত কারণ তারা আমাকে লুকিয়ে জেলখানা থেকে বার করে আনত। যেটুকু আমি ওদের থেকে বাঁচাতে সমর্থ হতাম তা আমি তুর্কী ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় করতাম। পাশার দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখভাল করত এমন এক বয়স্ক, পছন্দসই ব্যক্তি ছিল আমার শিক্ষক। আমি দ্রুত তুর্কী শিখতে পারছি দেখে সে খুশি হত এবং বলত যে আমি শীঘ্রই মুসলমান হয়ে যাব। শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে সম্মান দক্ষিণা নেওয়ার জন্য প্রতিদিনই তাকে জোর করতে হত। আমি তাকে খাবার আনার জন্যও অর্থ দিতাম কারণ নিজের পরিচর্যা ঠিকমতো করব বলে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

কুয়াশাচ্ছন্ন এক সন্ধ্যাবেলায় এক পদস্থ আধিকারিক আমার কুঠুরিতে এসে বলল যে পাশা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আমি ভাবলাম যে দেশ থেকে আমার কোনো বিত্তবান আত্মীয়, হয়তো আমার বাবা বা আমার ভাবী শ্বশুর নিশ্চয় মুক্তিপণ হিসেবে টাকা পাঠিয়ে থাকবেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার মতো আমার মনে হল যে সরু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এখনি বোধহয় আমি আমার বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হব অথবা কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে। সম্ভবত আমার মুক্তির বিষয়ে কথা বলবার জন্য কাউকে হয়তো তারা পাঠিয়েছে, হয়তো আজ রাতে এই কুয়াশার মধ্যেই আমাকে জাহাজে করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পাশার প্রাসাদে প্রবেশের পর আমি উপলব্ধি করলাম যে অত সহজে আমার মুক্তি নেই। এখানে মানুষ যেন আঙুলের ডগায় ভর করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে আমাকে একটা লম্বা হলঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দীর্ঘ অপেক্ষার পরে আমাকে একটা ঘরে হাজির করানো হল। নাতিদীর্ঘ একটি খাটে কম্বল গায়ে দিয়ে প্রসন্নমুখে এক ছোটখাটো মানুষ শুয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। শায়িত ব্যক্তিটিই হলেন পাশা। তিনি আমাকে তার কাছে ডাকলেন। আমরা কথা বললাম। তিনি আমাকে কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম যে আমার পড়াশুনার প্রকৃত ক্ষেত্র হল জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও কিয়দংশে কারিগরীবিদ্যা, তবে আমার চিকিৎসাশাস্ত্রেও জ্ঞান আছে এবং আমি অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছি। তার প্রশ্ন চলতেই থাকল। এত দ্রুত তুর্কী শিখে নিতে পারার জন্য তিনি আমাকে বুদ্ধিমান বলে প্রশংসা করলেন এবং আরও বললেন যে তার একটা স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্যা আছে যা অন্য কোনো চিকিৎসক সারাতে পারেনি এবং আমার কথা শোনার পর তিনি আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখতে চান।

তিনি এমনভাবে তার সমস্যার বর্ণনা দিলেন যে মনে হল তা যেন অত্যন্ত দুরূহ ও তামাম দুনিয়ায় একমাত্র তার উপরই তা ভর করেছে কারণ শত্রুরা তার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তার সম্বন্ধে আল্লাকে ভুল বুঝিয়েছে। কিন্তু আদতে তিনি কেবল হাঁপিয়ে পড়ার অভিযোগই করছিলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে প্রশ্ন করলাম, তার কাশির আওয়াজ শুনলাম, তারপর হেঁশেলে গিয়ে পুদিনা জাতীয় ভেষজ দিয়ে সবুজ রঙের গুলির মতো সুগন্ধী ওষুধ বানালাম, সঙ্গে একটা কাশির সিরাপও তৈরি করলাম। বিষ প্রয়োগের ভয় থাকায় পাশার চোখের সামনে আমাকে এক ঢোক সিরাপের সাথে একটি গুলি খেয়ে দেখাতে হল। তিনি আমাকে সকলের দৃষ্টির অগোচরে অতি গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করে জেলখানায় ফেরত যাওয়ার নির্দেশ

দিলেন। আধিকারিকটি পরে আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল যে পাশা অন্যান্য চিকিৎসকদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক ঘটাতে চান না। পরদিন আমি আবার ফেরত গেলাম, তার কাশির শব্দ শোনার পরে তাকে আবার ওই একই ওষুধ দিলাম। হাতের তালুতে পুদিনার গুলি নিয়ে তিনি শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠলেন। কুঠুরিতে ফিরে আসতে আসতে আমি তার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করলাম। তার পরদিন ঠাণ্ডা, মৃদু উত্তুরে বাতাস বইতে লাগল। এই আবহাওয়ায় কোনো মানুষের ইচ্ছা না থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে বাধ্য, কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

একমাস বাদে মাঝরাতে আবার আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখলাম যে পাশা সুস্থ শরীরে নিজের পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আশপাশের কিছু লোককে তিরস্কার করার সময় তার সাবলীল শ্বাসপ্রশ্বাস শুনে আমি স্বস্তিবোধ করলাম। তিনি আমাকে দেখে খুশি হলেন, তার সেরে ওঠার খবর দিলেন ও সুচিকিৎসক হিসেবে আমার প্রশংসা করলেন। আমি তার কাছ থেকে কী অনুগ্রহ কামনা করি? আমি জানতাম যে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে মুক্তি বা দেশে ফেরার অনুমতি দেবেন না। তাই আমি আমার জেলখানা ও কুঠুরি সম্পর্কে অভিযোগ জানালাম, তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চায় নিয়োজিত থাকলে আমি যখন আরও বেশি উপযোগী হতে পারি তখন অনাবশ্যকভাবে আমার উপরে ভারী কায়িক শ্রম চাপিয়ে দিয়ে আমাকে ক্ষইয়ে ফেলা হচ্ছে। আমার কথার কতটুকুই বা তিনি শুনলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তার দেওয়া অর্থের সিংহভাগই রক্ষীরা নিয়ে নিল।

সপ্তাহখানেক বাদে রাত্রিবেলা এক আধিকারিক আমার কুঠুরিতে এসে হাজির হল এবং পালানোর চেষ্টা করব না এই কসম খাওয়ানোর পরে সে আমার শিকল খুলে দিল। আমাকে আবার বাইরে কাজে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দাস-পরিচালকরা এখন আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতে লাগল। তিন দিন পরে এক আধিকারিক আমায় নতুন পোষাক এনে দিল এবং আমি উপলব্ধি করলাম যে পাশার সুরক্ষাবলয় আমাকে ঘিরে রয়েছে।

তারপরেও রাতের দিকে বিভিন্ন প্রাসাদে আমার ডাক পড়তেই লাগল। বাতে ভোগা বৃদ্ধ জলদস্যু বা পেট ব্যথায় কাহিল তরুণ সৈন্য সকলকেই আমি ওষুধ দিতাম। এছাড়াও চুলকানি, ফ্যাকাশে মেরে যাওয়া বা মাথার যন্ত্রণাতেও আমাকে নিদান দিতে হত। একবার এক চাকরের তোতলা ছেলেকে সিরাপ দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তার সমস্যা কমে গেল এবং সে আমাকে একটি কবিতাও আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল।

এভাবে শীত চলে গেল । বসন্তের সাথে খবর এল যে পাশা নাকি নৌবহর নিয়ে ভূমধ্যসাগরে রয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকমাস তিনি আমাকে স্মরণ করেননি। গ্রীষ্মের উষ্ণ দিনগুলোতে যারা আমার হতাশা ও বিরক্তির সাক্ষী ছিল তারা আমাকে অনুযোগ না করার পরামর্শ দিল কারণ চিকিৎসক হিসেবে আমি ভালোই উপার্জন করছিলাম। বহু বছর আগে ইসলামে ধর্মান্তরিত এক প্রাক্তন দাস আমাকে না পালাবার উপদেশ দিল। কোনো দাস তাদের কাজে লাগলে তারা তাকে রেখেই দেয়, নিজের দেশে ফেরার অনুমতি তারা তাকে কখনোই দেয় না। তার মতো আমিও যদি মুসলমান হয়ে যেতাম তবে হয়তো দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতাম, কিন্তু তার থেকে বেশি কিছু হত

না। আমার মনে হল যে আমাকে একটু পরখ করে দেখার জন্যই হয়তো সে ওই কথা বলে থাকবে, তাই আমি তাকে বললাম যে পালানোর কোনো ভাবনাই আমার নেই। ইচ্ছার কোনো কমতি ছিল এমন নয়, কমতি ছিল সাহসে। যারা পালিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই বেশী দূর যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। মার খাওয়ার পরে রাতে দুর্ভাগাগুলোর কুঠুরিতে গিয়ে তাদের ক্ষতে মলম তো আমিই লাগিয়ে দিতাম।

শরৎ দোরগোড়ায় এসে পড়াতে পাশা নৌবহর নিয়ে ফেরত এলেন। কামান দেগে তিনি সুলতানকে অভিবাদন জানালেন, গত বছরের মতো এবারও শহরকে চাগিয়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু এই মরশুমটা যে তাদের খুব একটা ভালো যায়নি তা পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছিল। নিতান্তই অল্প কিছু দাস তারা জেলখানায় ভরতে পারল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে ভেনিসীয়রা ছয়টি জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিল। দেশের খবর পাওয়ার আশায় আমি দাসদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। তাদের অধিকাংশই ছিল স্পেনীয়, কিন্তু তারা এতই চুপচাপ, বেকুব ও নিষ্প্রাণ গোছের যে সাহায্য বা খাবারের জন্য ভিক্ষা করা ছাড়া অন্য কথা বলার কোনো ইচ্ছাই যেন তাদের ছিল না। তাদের মধ্যে মাত্র একজনই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল—সে একটা হাত হারিয়েছিল কিন্তু খুব আশা ভরে জানাল যে তার এক পূর্বপুরুষকেও একইরকম দুর্ভাগ্য পোহাতে হলেও বেঁচে যাবার পরে সে তার অবশিষ্ট হাত দিয়ে বীরগাথা লিখে গিয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে সেও একই প্রকার সুযোগ পাবে। পরবর্তীকালে আমি যখন গল্প লিখে জীবনধারণ করতাম তখন গল্প লেখার জন্য বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখা সেই লোকটির কথা আমার মনে পড়ত। তারপর অল্প কয়েকদিন যেতে না যেতেই জেলখানায় এক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল। কিছু বোঝার আগেই সেই অভিশপ্ত মহামারী দাসদের অর্ধেক সাবাড় করে ফেলল। রক্ষীদের উৎকোচে উৎকোচে ভরিয়ে তুলে তবেই আমি নিজেকে সেই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

যারা বেঁচে গেল তাদেরকে নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। আমি গেলাম না। সোনালি শিঙার শেষবিন্দু পর্যন্ত গোটা রাস্তা কেমনভাবে তাদের হেঁটে যেতে হত এবং সেখানে ছুতোর, দর্জি, চিত্রকর প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে নানা কাজে তাদের কেমনভাবে নিযুক্ত থাকতে হত তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় ফিরে গল্প করত। তারা কাগজের মণ্ড দিয়ে জাহাজ, দুর্গ, স্তম্ভ প্রভৃতি নানারকম নমুনা তৈরি করছিল। পরে আমরা কারণটা জানতে পেরেছিলাম। পাশার পুত্রের সঙ্গে প্রধান উজীরের কন্যার বিবাহ ঠিক হয়েছে এবং তাই পাশা এক তাকলাগানো বিবাহের আয়োজন করছেন।

একদিন সকালে পাশার প্রসাদে আমার ডাক পড়ল। হাঁফ ধরার রোগ আবার তাকে আক্রমণ করেছে ভেবে আমি সেখানে গেলাম। তিনি ব্যস্ত ছিলেন, অপেক্ষা করার জন্য আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে আমি সেখানে বসে পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত পরে অন্য একটা দরজা খুলে গেল এবং আমার থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড় এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল। আমি তার মুখের দিকে চমকিত হয়ে তাকালাম—আতঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রাস করল।

## ২

যে ব্যক্তিটি এইমাত্র ঘরে ঢুকল তার সাথে আমার সাদৃশ্য অবিশ্বাস্য।

এ তো আমিই... প্রথম দর্শনে এই ছিল আমার প্রতিক্রিয়া। কেউ যেন আমার সঙ্গে মজা করার জন্য প্রথমে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম তার ঠিক বিপরীত দরজা দিয়ে আবার আমাকে ভিতরে নিয়ে এল। সে যেন বলতে চাইছে যে দেখুন, আপনার আসলে এরকম হওয়া উচিত ছিল, দরজা দিয়ে এভাবে আপনার ঢোকা উচিত ছিল, আপনার হাতের ভঙ্গীমা এরকম হওয়া উচিত ছিল, ঘরে বসে থাকা অন্য ব্যক্তিটির আপনার দিকে এরকমভাবে তাকানো উচিত ছিল। চোখাচোখি হতেই আমরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানালাম, কিন্তু তাকে বিস্মিত বলে মনে হল না। তখন আমি ভাবলাম যে তার সঙ্গে আমার সম্ভবত খুব একটা মিল নেই, তার তো দাড়ি আছে আর আমার মুখটা যে কেমন দেখতে ছিল আমি তো বোধহয় তাই ভুলে গেছি। সে আমার মুখোমুখি এসে বসতে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি শেষবার আয়নার সামনে দাঁড়াবার পর বছর পেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম তা খুলে গেল এবং সেই ব্যক্তিকে ভিতরে ডেকে নেওয়া হল। অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে হল যে, এ কোনো পরিকল্পিত রসিকতা নয়, এ বুঝি আমারই চিন্তাক্লিষ্ট মনের কল্পনা। আমি ঘরে ফিরব, সকলে আমায় স্বাগত জানাবে, এরা আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত করে দেবে, আদতে আমি জাহাজে আমার কেবিনেই এখনো ঘুমিয়ে আছি, এসব নিছকই এক স্বপ্ন নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য সেসময় আমি সর্বদাই এসব কল্পনা করতাম। এটাও নিশ্চয় জীবন্ত হয়ে ওঠা ওরকমই এক দিবাস্বপ্ন অথবা সবকিছু পাল্টে গিয়ে আবার পূর্ববৎ হয়ে যাওয়ার সঙ্কেত। আমি যখন এসব ভাবছিলাম ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল ও ভিতরে আমার ডাক পড়ল।

পাশা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার একটু পিছনেই ছিল আমার মতো দেখতে ব্যক্তিটি। পাশা আমাকে তার পোষাকের প্রান্তভাগে চুম্বন করার সুযোগ দিলেন। তিনি যখন আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমার ইচ্ছা হল যে তাকে জেলকুঠুরিতে আমার কষ্টের কথা ও দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানাই, কিন্তু তিনি আমার কথা মোটেই শুনছিলেন না। মনে হল যে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও কারিগরীবিদ্যায় আমার ব্যুৎপত্তির কথা তিনি মনে রেখেছেন—বেশ, বারুদঠাসা যেসব বাজি আকাশে ছাড়া হয় সে সম্বন্ধে আমি কি কিছু জানি? তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম যে আমি জানি, কিন্তু ওই

লোকটির চোখে চোখ পড়ামাত্রই আমার সন্দেহ হল যে আমাকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। পাশা বললেন যে তার পুত্রের বিবাহানুষ্ঠানটি অতুলনীয় হওয়া চাই, তাতে তিনি আতসবাজীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তা যেন অনন্য হয়। আমার মতো দেখতে লোকটি অতীতে সুলতানের জন্মের সময়ে মাল্টার এক অধিবাসীর সাহায্যে আগুনখেকোদের নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যু হওয়ায় সে এখন সমস্যায় পড়ে গেছে। পাশা লোকটিকে 'হোজা' বা 'ওস্তাদ' বলে ডাকছিলেন এবং তার ধারণা ছিল যে আমি 'হোজা'কে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব এবং আমরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারব। আমাদের প্রদর্শনী ভালো হলে পাশা আমাদের পুরস্কৃত করবেন। এবার সঠিক সময় সমাগত ভেবে আমি তার কাছে আমার ঘরে ফেরার ইচ্ছার কথা সাহস করে ব্যক্ত করলাম। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে এখানে আসার পর আমি কোনো বেশ্যাখানায় গিয়েছি কিনা, আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন যে, নারীর প্রতিই যদি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবে স্বাধীনতা দিয়ে আমার কী হবে? তিনি রক্ষীদের মতো অভব্য ভাষা ব্যবহার করছিলেন এবং তার যুক্তি শুনে আমাকে নির্ঘাৎ বিমূঢ় দেখাচ্ছিল, কারণ তিনি এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। তারপর তিনি 'হোজা' নামক ভুতুড়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন : এখন থেকে দায়িত্বটা তারই। আমরা বেরিয়ে এলাম।

সকালে আমার মতো দেখতে লোকটির বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবছিলাম যে, আমি বোধহয় তাকে কিছুই শেখাতে পারব না। কিন্তু আমার চেয়ে তার জ্ঞান বেশি বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হল না। তাছাড়া আমরা এই বিষয়েও সহমত হলাম যে কর্পূরের সঠিক মিশ্রণটা ঠিক করাই হল মূল সমস্যা। ফলে নিক্তিতে মেপে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে মিশ্রণ প্রস্তুত করা, শহরের উঁচু দেওয়ালের পাশে সুরদিবি এলাকায় রাতের আঁধারে সেসব মিশ্রণে আগুন দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এই হল আমাদের কাজ। আমাদের বানানো হাউইগুলোতে যখন আগুন দেওয়া হত তখন শিশুরা অবাক হয়ে দেখত আর আমরা ঘনান্ধকার গাছগুলোর তলায় উদ্বেগ নিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। বহু বছর পরে সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্রের পরীক্ষার সময় ঠিক এরকমভাবেই দিনের বেলাতেও আমরা অপেক্ষায় থাকতাম। পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে কখনো চাঁদের আলোয় আবার কখনো ঘুটঘুটে অন্ধকারেই আমি একটা ছোট খাতায় আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করতাম। রাতে যে যার মতো আলাদা হওয়ার আগে আমরা সোনালি শিঙার উপরে অবস্থিত হোজার বাড়িতে যেতাম ও পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতাম। তার বাড়িটা ছিল ছোট, শ্বাসরোধী ও আকর্ষণহীন। প্রবেশপথের সামনের বাঁকাচোরা রাস্তাটার উপর দিয়ে সবসময় নোংরা জলের ধারা বয়ে যেত আর গোটা রাস্তাটা কর্দমাক্ত হয়ে থাকত। ওই নোংরা জলের উৎসটা আমি কখনোই আবিষ্কার করতে পারিনি। বাড়িতে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই আমার দমবন্ধ হয়ে আসত এবং এক অদ্ভুত ক্লেশের অনুভূতি হত। অনুভূতির কারণ সম্ভবত লোকটি নিজেই। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, তাকে দেখে মনে হত যে সে আমার কাছ থেকে কিছু একটা শিখতে চায়, কিন্তু তা যে কী সে ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তার ঠাকুরদার নামানুসারে

তাকে ডাকা হোক তা তার পছন্দ ছিল না, সে চাইত যে আমি তাকে 'হোজা' বলে ডাকি। দেওয়াল ঘেঁষে সার দিয়ে পাতা নিচু ন্যাড়া কেদারায় বসা আমার কিছুতেই অভ্যেস হল না, তাই আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনার সময় আমি দাঁড়িয়েই থাকতাম, কখনো কখনো আবার উদ্বিগ্নভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতাম। হোজা তা উপভোগ করত বলেই আমার ধারণা, সে বসে বসে বাড়ির মৃদু আলোতেও আমাকে প্রাণভরে দেখে যেত।

আমি অনুভব করতাম যে তার চোখ আমাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু আমাদের দুজনের সাদৃশ্যটা সে লক্ষ্য করছে না এটা ভাবলেই আমার অস্বস্তিটা আরও বেড়ে যেত। এক দুবার আমার এমনো মনে হয়েছে যে সে তা লক্ষ্য করলেও না করার ভান করছে। সে যেন আমাকে নিয়ে খেলা করছিল, আমি জানতে পারছি না এমন সব তথ্য জোগাড় করে সে যেন আমার উপর ছোটখাটো একটি পরীক্ষা চালাচ্ছিল। প্রথম কয়েকদিন সে প্রায় শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল এবং যত বেশি সে জানতে লাগল ততই তার কৌতূহল বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এসব অদ্ভুতুড়ে জ্ঞানের আরও গভীরে প্রবেশ করতে সে দ্বিধাবোধ করছে বলে আমার মনে হত। এই সিদ্ধান্তহীনতাটাই আমার কাছে নিপীড়ন বলে প্রতীয়মান হত আর সেই নিপীড়নের ফলেই বাড়িটা আমার কাছে দমবদ্ধ লাগত! এটা সত্যি যে তার দ্বিধার ফলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলাম কিন্তু তা আমাকে খুব একটা নিশ্চিন্ত করেনি। একবার আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনার সময় এবং আরেকবার আমি এখনো কেন মুসলমান হইনি তা নিয়ে তার প্রশ্নের মুখে পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে সে যেন সংগোপনে আমাকে একটা বিতর্কের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, তাই আমি তার কোনো উত্তর দেইনি। সে আমার থমকে যাওয়াটা আঁচ করেছিল, এর জন্য যে সে আমাকে একটু নীচু নজরে দেখছে তাও আমি উপলব্ধি করেছিলাম আর এই উপলব্ধিটাই আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। সেই সময়ে একে অপরকে একটু নীচু চোখে দেখার মাধ্যমেই আমরা পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করতাম। আতসবাজীর প্রদর্শনীটি কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই উতরে দিতে পারলে আমাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে এই আশায় আমি তখন নিজেকে সংযত রাখতাম।

এক রাতে অকল্পনীয় উচ্চতায় উঠে যাওয়া হাউইয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে হোজা বলল যে একদিন সে এমন হাউই বানাবে যা চাঁদ সমান উচ্চতায় উঠে যাবে। একমাত্র সমস্যা হল বারুদের মশলার সঠিক অনুপাত ঠিক করা এবং এমন একটি আধার তৈরি করা যা ওই মিশ্রণটাকে সহ্য করতে পারবে। আমি যখন বলতে গেলাম যে চাঁদ অনেক দূরে তখন সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে জানাল যে সে তা ভালো করেই জানে, কিন্তু এটাই কি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ নয়? আমি তার বক্তব্য মেনে নিলাম, কিন্তু তাতে সে স্বস্তি পেল না, বরঞ্চ সে আরও বেশি করে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, তবে মুখে আর রা কাড়ল না।

দুদিন পরে মাঝরাতে সে আবার সেই একই প্রশ্ন করল—চাঁদই যে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ এ ব্যাপারে আমি এত নিশ্চিত হলাম কী করে? এমনো তো হতে পারে যে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে এরকম মনে হচ্ছে। তখন আমি তাকে জ্যোতির্বিদ্যা

সম্পর্কে আমার চচার কথা জানালাম এবং টলেমির মহাবিশ্বতত্ত্বের প্রাথমিক নীতিসমূহ তাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম। আমি লক্ষ করলাম যে সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে শুনল, কিন্তু এমন কিছু বলল না যাতে তার কৌতূহল প্রকাশ পায়। খানিক বাদে আমার বলা যখন শেষ হয়ে গেল তখন সে বলল যে টলেমি সম্বন্ধে জ্ঞান তারও আছে, কিন্তু চাঁদের থেকেও পৃথিবীর নিকটতর অন্য কোনো গ্রহ থাকতে পারে তার এই ধারণাকে সেই জ্ঞানও বদলাতে পারল না। ভোরের দিকে তো সে এমনভাবে ওই গ্রহ সম্বন্ধে কথা বলতে লাগল যেন ইতিমধ্যেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ সে পেয়ে গেছে।

পরের দিন সে আমার হাতে অপটুভাবে অনূদিত একটি পাণ্ডুলিপি ধরিয়ে দিল। আমার তুর্কী কমজোরি হলেও আমি তার অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম। উল্টেপাল্টে দেখার পর আমার মনে হল যে পাণ্ডুলিপিটি 'আলমা জেইস্ট'-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ হতে পারে, এবং তাও আসল থেকে নয়, অন্য কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ থেকেই এটিকে অনুবাদ করা হয়েছে। কেবল গ্রহগুলোর আরবি নামগুলোই আমাকে আকৃষ্ট করল, কিন্তু সে সময়ে নাম নিয়ে উত্তেজিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। হোজা যখন দেখল যে বইটি আমাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারল না এবং অল্পক্ষণ পরেই আমি তাকে পাশে সরিয়ে রাখলাম তখন সে রেগে গেল। এই বইটির জন্য সে সাত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছে, দম্ভ সরিয়ে রেখে বইটি একটু ভালো করে দেখাই আমার পক্ষে যথার্থ হবে। বাধ্য ছাত্রের মতো আমি আবার বইটি খুললাম এবং ধীরে সুস্থে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি প্রাচীন নকশা আমার চোখে পড়ল। তাতে পৃথিবীর নিরিখে গ্রহগুলোকে কতগুলো গোলক হিসেবে দেখানো হয়েছে। অপটুভাবে আঁকা গোলকগুলোর অবস্থান ঠিক হলেও তাদের পারস্পরিক দূরত্ব সম্বন্ধে নকশাকারের কোনো ধারণাই ছিল না। তারপর চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্কিত একটি ছোট্ট গ্রহে আমার চোখ আটকে গেল। একটু ভালো করে পরীক্ষা করতেই কালির তুলনামূলক সতেজতা দেখে আমি সহজেই বুঝতে পারলাম যে নকশায় এই গ্রহটিকে পরবর্তীকালে ঢোকানো হয়েছে। গোটা পাণ্ডুলিপিটি দেখে নিয়ে হোজাকে ফেরত দিলাম। সে আমাকে বলল যে সে ওই গ্রহটিকে শীঘ্রই খুঁজে বার করে ফেলবে এবং তার কথায় রসিকতার লেশমাত্র ছিল বলে আমার মনে হল না। আমি কিছু বললাম না, আমাদের নীরবতা আমার মতো ওকেও ধন্দে ফেলে দিল। ভবিষ্যতে আর কোনো হাউইকেই আমরা কখনোই এমন উচ্চতায় পাঠাতে পারলাম না যাতে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আবার কথোপকথন শুরু করা যেতে পারে, ফলত সেই বিষয় আর উত্থাপিতই হল না। আমাদের সামান্য সাফল্য এমন এক সমাপতন হয়েই রয়ে গেল যার রহস্য আমরা ভেদ করতে পারলাম না।

কিন্তু আলো ও অগ্নিশিখার তীব্রতা ও ঔজ্জ্বল্যর ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো ফল পেলাম। আমরা আমাদের সাফল্যের রহস্যটা জানতাম। এক ওষধি গাছগাছড়ার দোকানে তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে হোজা এমন একটি হলদেটে গুঁড়োর সন্ধান পেয়েছিল যার নাম দোকানের মালিক নিজেও জানত না। আমাদের মনে হল যে ওই দুর্দান্ত ঔজ্জ্বল্য উৎপাদনকারী গুঁড়োটি নিশ্চয় সালফার ও কপার সালফেটের মিশ্রণ হবে। পরবর্তীকালে আমরা যা কিছুই বানাবার চেষ্টা করতাম তাতেই বাড়তি ঔজ্জ্বল্য আনার জন্য ওই গুঁড়ো মেশাতাম, কিন্তু প্রায় একইরকম দেখতে কফিরঙা খয়েরী ও

ফ্যাকাসে সবুজ রঙ ছাড়া আমরা আর কোনোকিছুই কখনো প্রস্তুত করতে পারিনি। অবশ্য হোজার মতানুযায়ী এমনকি সেটাও নাকি ইস্তাম্বুল এতদিন যা দেখে এসেছে তার থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

উদ্‌যাপনের দ্বিতীয়রাতে আমাদের প্রদর্শনীটিও তেমনই উৎকৃষ্ট হল। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাসহ প্রত্যেকেই একই কথা বলল। যখন খবর এল যে আমাদের প্রদর্শনী দেখতে সোনালি শিঙার বিপরীত তটভূমিতে সুলতান এসে পৌছেছেন তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। তার উপস্থিতিতে কোনো বিচ্যুতি ঘটে গেলে কি হবে এই ভেবে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল যে কোনো ভুলচুক হয়ে গেলে আরও বহুবছর আমি দেশে ফিরতে পারব না। শুরু করার নির্দেশ পাওয়ার পরে প্রথমে আমি একটু প্রার্থনা সেরে নিলাম। অতিথিদের স্বাগত জানানো ও প্রদর্শনীর সূচনা ঘোষণার্থে আমরা প্রথমে আকাশে বর্ণহীন হাউই ছুঁড়ে দিলাম। তার ঠিক পরেই আমরা চাকী প্রদর্শনী শুরু করলাম যাকে হোজা ও আমি 'অগ্নিপরীক্ষা' নাম দিয়েছিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই ভয়জাগানো সব বিস্ফোরণের সাথে সাথে আকাশ লাল, হলুদ ও সবুজ হয়ে উঠতে লাগল। হাউই আকাশে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাকতিগুলো গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল, ঘূর্ণির মতো প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই চারপাশের এলাকাকে দিনেরবেলার মতো আলোকিত করে শূন্যে নিশ্চলভাবে ঝুলতে শুরু করল। সে দৃশ্যের সৌন্দর্য ছিল আমাদের প্রত্যাশারও অধিক। মুহূর্তের জন্য মনে হল আমি যেন ভেনিসেই আছি, এক আট বছরের বালক প্রথম কোনো আতসবাজীর প্রদর্শনী দেখছে অথচ নিজের রঙ মেলানো চকচকে বোতামসহ নতুন লাল স্যুট পরতে না পারায় সেদিন তার খুব মন খারাপ। আমার বড় ভাই আগের দিন মারামারি করতে গিয়ে নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমার স্যুটটি তার গায়ে খুবই ছোট হলেও সেদিন সেটি তারই জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। ক্রমাগত ফাটতে থাকা আতসবাজীগুলো সেই রাতে আমার না পরতে পারা স্যুটের মতোই লাল ছিল। আমি কসম খেয়েছিলাম যে ওই স্যুট আমি আর কখনো পরব না।

তারপর আমরা 'ফোয়ারা' নামক আতসবাজীর প্রদর্শনী শুরু করলাম। প্রায় পাঁচমানুষ সমান উঁচু মাচা থেকে অগ্নিশিখা ফোয়ারার মতো ঝরে পড়তে লাগল। যারা দূরবর্তী সমুদ্রতীরে বসেছিল তারা নিশ্চয় ওই অগ্নিশিখার স্রোত ভালোই দেখতে পাচ্ছিল। যখন সেই ফোয়ারার মুখ থেকে হাউই ছিটকে বেরোতে শুরু করল তখন তারাও নিশ্চয় আমাদের মতোই উদ্বেল হয়ে থাকবে। তাদের উত্তেজনাকে থিতিয়ে যেতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিল না  সোনালি শিঙার তটে বেঁধে রাখা পালতোলা জাহাজগুলোকে ভাসিয়ে দেওয়া হল। তারপর কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি দুর্গ ও দুর্গচূড়াতে আগুন দিতেই সেগুলো জ্বলতে শুরু করল এবং সেখান থেকে হাউই আকাশের দিকে ছিটকে বেরোতে লাগল। অতীত বিজয়কে তুলে ধরতেই এই সমগ্র ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। যে বছর আমাকে বন্দী করা হল সেই বছরের জাহাজগুলোর প্রতিভূ হিসেবে কিছু জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হল। অন্যান্য জাহাজগুলো একের পর এক জ্বলন্ত হাউইয়ের সাহায্যে আমাদের জাহাজটিকে আক্রমণ করল। এভাবে আমার দাস বনে যাওয়ার দিনটিকে আমি আবার নতুন করে সৃষ্টি করলাম।

জাহাজটি জ্বলতে জ্বলতে যখন ডুবে যেতে লাগল তখন উভয় পাড় থেকেই 'ঈশ্বর! ওহ্ ঈশ্বর' চিৎকার শোনা যেতে লাগল। তারপর একে একে আমরা আমাদের ড্রাগনগুলোকে ছেড়ে দিলাম। তাদের বিশাল নাকের পাটা, হাঁ করা মুখ ও খাড়া কান থেকে আগুনের শিখা ছিটকে বেরোতে লাগল। পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিলাম, প্রাথমিকভাবে কেউই কাউকে হারাতে পারল না। তারপর পাড় থেকে আরো হাউই ছুঁড়ে আমরা আকাশটাকে লাল করে তুললাম, আকাশের রঙ আরো একটু গাঢ় হতে নৌকায় থাকা আমাদের লোকেরা উত্তোলকযন্ত্র ঘোরাতে লাগল এবং ড্রাগনগুলো আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যেতে লাগল। এবার ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রত্যেকে চিৎকার করতে শুরু করল, ড্রাগনগুলো আবার প্রচণ্ড গর্জন করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল, সব নৌকা থেকে এক সঙ্গে সব হাউই আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হল, জন্তুগুলোর দেহের মধ্যে আমরা যে সলতে ভরে দিয়েছিলাম তার সবকটিতেই সঠিক সময়ে আগুন ধরে গেল। গোটা দৃশ্যটি আমাদের পরিকল্পনামাফিক একটি জ্বলন্ত নরকের দৃশ্যে পরিণত হল। কাছেই একটি শিশু চিৎকার করে কাঁদছিল, কিন্তু তার বাবার ছেলের প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। সে ভয়ংকর আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তখনই আমি আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম যে এবার নিশ্চয় আমাকে ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে যে জন্তুটিকে আমি 'শয়তান' নাম দিয়েছিলাম সেটি সেই নারকীয় আকাশ থেকে একটি ছোট্ট কালো নৌকার উপর নেমে এল। নৌকাটিকে চোখে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ওতে এত হাউই ঠাসা ছিল যে আমাদের আশঙ্কা ছিল যে আমাদের লোকজনসমেত সব নৌকাগুলোই না তার বিস্ফোরণের অভিঘাতে উড়ে যায়। কিন্তু সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক চলল। আগুনের থুতু ছেটাতে ছেটাতে যুদ্ধরত ড্রাগনরা আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল আর ঠিক তখনই 'শয়তান' ও সবকটি হাউইতেই একসঙ্গে আগুন ধরে গেল এবং তারা একযোগে শোঁ করে আকাশে উঠে গেল। 'শয়তান' এর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল এবং তা থেকে আগুনের গোলা আকাশে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সমগ্র ইস্তাম্বুলকে এক মুহূর্তে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছি এই ভেবেই আমি উল্লসিত বোধ করলাম। জীবনে যা করতে চাইতাম তা করার সাহস অবশেষে দেখাতে পারলাম এই ভেবে আমার নিজেরও একটু ভয় করছিল। সেই মুহূর্তে আমি কোন্ শহরে রয়েছি তা আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি কেবল চাইছিলাম শয়তান আকাশে ভাসতে ভাসতে রাতভর দর্শকদের উপর আগুন ঝরাতে থাকুক। কিছুক্ষণ দোলবার পর সে কারোর কোনো ক্ষতি না করে সোনালি শিঙার উপর নেমে আসতে লাগল। উভয় তীর থেকেই প্রবল হর্ষধ্বনি শোনা যেতে লাগল। জলে ডুবে যেতে যেতেও সে তার মুখ থেকে আগুন ছেটাচ্ছিল।

রূপকথার গল্পে যেমন হয় ঠিক তেমনই পরের দিন সকালবেলা পাশা হোজাকে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন যে প্রদর্শনী তার অত্যন্ত ভালো লেগেছে তবে 'শয়তান'-এর জয় তার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। আমরা আরও দশদিন ধরে আতসবাজী প্রদর্শনী চালিয়ে গেলাম। দিনের বেলা আমরা পুড়ে যাওয়া নমুনাগুলোকে মেরামত করতাম, নতুন নতুন দৃশ্যের পরিকল্পনা করতাম এবং

বন্দীদের জেলখানা থেকে নিয়ে এসে হাউইতে বারুদ ঠাসার কাজ করাতাম। দশ বস্তা বারুদ মুখের উপর ফেটে যাওয়াতে একটি দাস অন্ধও হয়ে গিয়েছিল।

বিবাহ-উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর হোজাকে আমি আর দেখতে পেলাম না। আমার দিকে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকত যে কৌতূহলী লোকটি তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে পেরে আমার স্বস্তিবোধ হল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে একত্রে কাটানো সেইসব প্রাণবন্ত, আনন্দমুখর দিনগুলোকে আমার মনে পড়ত না। আমি যখন ঘরে ফিরব তখন আমি সবাইকে এই লোকটির কথা অবশ্যই বলব যার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজে সেই মিলের কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। আমি কারাগারে আমার কুঠুরিতে বসে থাকতাম আর রুগী দেখে সময় কাটাতাম। এরপর পাশার আহ্বান যখন এল তখন আমি এমন এক শিহরণ বোধ করলাম যাকে প্রায় আনন্দই বলা চলে এবং তার কাছে ছুটে গেলাম। প্রথমে তিনি যান্ত্রিকভাবে আমার প্রশংসা করলেন, প্রত্যেকেই আতসবাজীর প্রদর্শনী দেখে অত্যন্ত তৃপ্ত, অতিথিরা খুশি হয়েছে, আমি যথেষ্ট প্রতিভাবান ইত্যাদিও বললেন। তারপর হঠাৎই তিনি ঘোষণা করলেন যে আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তবে তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে স্বাধীন করে দেবেন। আমি ধাক্কা খেলাম, প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম। আমি বললাম যে আমি আমার দেশে ফিরতে চাই এবং ভুল করেই আমার মা ও প্রেমিকা সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলে ফেললাম। পাশা তার আগের কথাগুলোরই এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন যেন তিনি আমার কথা শুনতেই পাননি। আমি এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেলাম। কেন জানি না ছোটবেলায় দেখা অলস, অকর্মণ্য, বদমাইশ ছেলেগুলোর কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। তারা তাদের বাবাদের গায়ে হাত তুলত। এরপর যখন আমি বললাম যে আমি আমার ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করব না তখন পাশা অসম্ভব রেগে গেলেন। আমি আবার আমার কুঠুরিতে ফিরে এলাম।

তিনদিন পরে পাশা আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। এবার তার মেজাজ ভালো ছিল। ধর্ম পরিবর্তন আমাকে এখান থেকে বেরোতে সাহায্য করবে কি না তা আমি তখনো বুঝে উঠতে পারছিলাম না, ফলে আমি কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারিনি। পাশা আমার মত জানতে চাইলেন এবং বললেন যে এখানে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দেবেন। কিন্তু হঠাৎই আমি সাহস করে বলে ফেললাম যে আমি ধর্ম পরিবর্তন করব না। পাশা শুনে হতচকিত হয়ে গেলেন এবং আমাকে মূর্খ বলে অভিহিত করে দিলেন। আর যাই হোক, আমার চারপাশে এমন কেউ তো নেই যাকে আমি মুসলমান হয়ে গেছি একথা জানাতে লজ্জা পাব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ ইসলামের অনুশাসন নিয়ে আমার কাছে বক্তৃতা দিলেন। বলা শেষ হয়ে গেলে তিনি আমাকে আবার আমার কুঠুরিতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয়বারে আমাকে আর পাশার সামনে হাজির করানো হল না। তার এক সেবক এসে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলো। আমি হয়তো আমার মত পাল্টেই ফেলতাম, কিন্তু একজন সেবক জিজ্ঞেস করল বলেই তা আর করা হয়ে উঠল না! আমি বললাম যে আমি আমার ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দিতে এখনো রাজি নই। সেবকটি আমার হাত খামচে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে অন্য একজনের হাতে আমাকে

সমর্পণ করল। সেই লম্বা লোকটি আমার নিত্য স্বপ্নে দেখা লোকগুলোর মতোই রোগা ছিল। কোনো শয্যাশায়ী অক্ষমকে যেভাবে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবে সে আমাকে হাত ধরে বাগানের এক কোণের দিকে নিয়ে চলল। এবার বিশাল আকৃতির একটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল, সে এতোই ঘনঘোর বাস্তব যে তাকে স্বপ্নে দেখা অসম্ভব। এই দুটি লোক আমাকে নিয়ে এসে একটি দেওয়ালের সামনে থামল ও আমার হাত বেঁধে দিল। তাদের একজনের হাতে একটি কুড়াল ছিল। সে বলল যে পাশা আদেশ দিয়েছেন যে মুসলমান হতে না চাইলে তৎক্ষণাৎ যেন আমার মুণ্ডুচ্ছেদ করা হয়। শুনে আমি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম।

এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে একথা আমি ভাবতে পারছিলাম না। লোকদুটি আমাকে করুণার চোখে দেখছিল। আমি কিছুই বললাম না, শুধু মনে মনে ভাবছিলাম যে ওরা যেন সেই একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস না করে বসে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরে সেটাই ঘটল। হঠাৎই ধর্ম জিনিসটা আমার কাছে এত দামি হয়ে উঠল যে তার জন্য সহজে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই যায়। আমার নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল আবার একই সাথে আমার প্রতি এই দুজনের করুণা দেখে আমার নিজের জন্যই করুণা হচ্ছিল। যত তারা আমাকে জেরা করছিল ততই আমার পক্ষে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমি অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলাম। আমাদের বাড়ির পিছনের যে বাগানটিকে জানালা দিয়ে দেখা যেত তা আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল—টেবিলের উপরে ঝিনুকের বহুবর্ণ খোলাখচিত ট্রেতে পিচ ও চেরী সাজানো, টেবিলের পিছনে একটা ছোট কেদারা, সবুজ জানালার ফ্রেমের সঙ্গে রঙ মেশানো পালকের কুশন ও খড়ের মাদুর দিয়ে সেই কেদারা ঢাকা দেওয়া, আরও পিছনে অলিভ ও চেরী গাছের ঝাড়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা কুয়ার কিনারায় একটা চড়ুই বসে আছে, ওয়ালনাট গাছের একটি উঁচু ডাল থেকে লম্বা দড়ি দিয়ে ঝোলানো দোলনাটা বাতাসে মৃদুমন্দ দুলছে। তারা আবার যখন আমায় একই কথা জিজ্ঞেস করল তখন আমি তাদের জানিয়ে দিলাম যে আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করব না। তারা একটা গুঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ওই গুঁড়ির উপর মাথা রাখতে আমাকে বাধ্য করল। আমি চোখবন্ধ করলাম, তারপর আবার খুলে ফেললাম। একজন কুডুল তুলেছিল। অন্যজন বলল যে আমার হয়তো সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ইচ্ছা হয়েছে। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার এই নিয়ে আরও একটু ভাবা উচিত।

আমাকে আরও একটু ভাবার সুযোগ দিয়ে তারা ওই গুঁড়িটার ঠিক পাশেই মাটি খুঁড়তে শুরু করল। আমার মনে হল তারা বুঝি এখানে এক্ষুনি আমায় দাফন করে দেবে। মৃত্যুভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্যান্ত মাটিচাপা পড়ার ভয়ও ধরে গেল। আমি ভাবলাম যে তারা কবর খোঁড়া শেষ করতে করতে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলব, কিন্তু তারা একটা অগভীর গর্ত খুঁড়েই আমার দিকে এগিয়ে এল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে এখানে মরাটা খুবই মূর্খামি হবে। আমার মনে হল যে আমি তো মুসলমান হয়ে যেতেই পারতাম, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সময়ই পেলাম না। আমি যদি জেলখানায় ফিরে যেতে পারতাম, এতদিনে অভ্যাস হয়ে যাওয়া আমার প্রিয় কুঠুরিতে ফিরে গিয়ে সারারাত ধরে বসে বসে যদি ভাবতে পারতাম তবে আমি

ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটা সহজেই নিতে পারতাম। কিন্তু এখানে এভাবে এক্ষুনি তা সম্ভব নয়।

তারা হঠাৎ আমাকে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে দিল। গুঁড়ির উপরে মাথা রাখার ঠিক পূর্বমুহূর্তে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আরে, এ তো আমিই, আমার মুখে কেবল লম্বা দাড়ি, আমি নীরবে হেঁটে আসছি! গাছের সারির মধ্যে দিয়ে প্রায় উড়ে উড়ে নিজেকেই আসতে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার ছায়ামূর্তিকে আমি ডাকতে চাইলাম, কিন্তু গুঁড়িতে মাথাটা ঠেসে রাখাতে আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। ব্যাপারটা ঘুমের থেকে খুব একটা আলাদা কিছু বলে মনে হল না এবং তাই অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলেও আমি কোনো আপত্তি করলাম না। ঘাড়ের পিছনে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি বোধ হল। আমি কিছু ভাবতে চাইছিলাম না, কিন্তু ঘাড়ের পিছনের ঠাণ্ডা ভাবটা আমাকে ভাবতে বাধ্য করল। কিন্তু তারপর হঠাৎই তারা আমাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল ও পাশা অসম্ভব রেগে যাবেন বলে গজগজ করতে লাগল। আমার হাত খুলে দিতে দিতে তারা আমাকে আল্লাহ্ ও মুহম্মদের (সঃ) শত্রু বলে ভর্ৎসনা করল। অবশেষে তারা আমাকে প্রাসাদের দিকে নিয়ে চলল।

পাশা তার পোষাকের প্রান্তভাগে চুম্বন করতে দেওয়ার পর আমার সঙ্গে শান্তভাবেই কথা শুরু করলেন। জীবন বাঁচানোর জন্য আমি যে নিজের বিশ্বাস বিসর্জন দিইনি তা তার ভালো লেগেছে বলে জানালেন, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই তিনি প্রবল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং আমি অকারণে গোঁয়ার্তুমি করছি, ইসলাম উৎকৃষ্টতর ধর্ম ইত্যাদি নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন। তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার রাগও বাড়তে লাগল। তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু তিনি যে কারোর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি বুঝতে পারলাম যে ওই প্রতিশ্রুতিই নানাপ্রকার যন্ত্রণা সহ্য করার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছে। অবশেষে আমার বোধোদয় হল যে যার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে হল হোজা। পাশার কথা শুনে মনে হল যে সে বেশ অদ্ভুত মানুষই বটে। তারপর পাশা হঠাৎই জানালেন যে তিনি আমাকে উপহার হিসেবে হোজাকে দান করে দিয়েছেন। আমি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, পাশা আমাকে বুঝিয়ে বলে দিলেন যে আমি এখন থেকে হোজার দাস। আমি স্বাধীনতা পাব কি পাব না তা ঠিক করার ক্ষমতা পাশা দলিল মারফৎ হোজাকে দিয়ে দিয়েছেন, আমাকে নিয়ে হোজা এখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এরপর পাশা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমাকে বলা হল যে হোজাও এই প্রাসাদেই আছে, নীচে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে বাগানে গাছের ফাঁকে আমি আসলে তাকেই দেখেছিলাম। আমরা হাঁটতে হাঁটতে তার বাড়ি গেলাম। সে বলল যে সে নাকি বরাবরই জানত যে আমি আমার বিশ্বাস পরিত্যাগ করব না। তার বাড়িতে আমার জন্য একটা ঘরও প্রস্তুত ছিল। আমি ক্ষুধার্ত কি না সে জানতে চাইল। তখনো আমার মৃত্যুভয় কাটেনি, ফলে কোনোকিছু খাওয়ার মতো আমার অবস্থা ছিল না, তবু সে আমার সামনে রুটি ও একপ্রকার মণ্ডজাতীয় খাদ্য রাখল। আমি তা থেকে দু-চার গ্রাস মুখে দিলাম। হোজা খুশিমনে আমার খাওয়া দেখছিল। বাজার থেকে ঘোড়া কিনে আনার পরে

ভবিষ্যতে ঘোড়াটি কী কী কাজ করবে তা ভাবতে ভাবতে কৃষক যেমন খুশিমনে ঘোড়াটিকে খাওয়ায় সেও তেমনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে খাওয়াচ্ছিল। তারপর একসময় সে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিজের তত্ত্ব ও পাশাকে উপহারের জন্য নিজের পরিকল্পিত ঘড়ির নকশার গভীরে ডুবতে ডুবতে আমাকে ভুলে গেল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওই দৃষ্টিটাকে মনে রাখার মতো আমার কাছে বহু উপলক্ষ্য ছিল।

পরে সে আমাকে বলেছিল যে আমি যা জানি সে সবকিছু তাকে শেখাতে হবে, সেই কারণেই সে পাশার কাছ থেকে আমাকে চেয়ে নিয়েছিল এবং এই কাজ শেষ হলে তবেই সে আমাকে মুক্তি দেবে। সেই 'সবকিছু' যে কী তা বুঝতে আমার বহুমাস কেটে গিয়েছিল। 'সবকিছু'র মধ্যে ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমার শেখা সবকিছু, দেশ থেকে শিখে আসা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরীবিদ্যা, আমার সব বইয়ে যা লেখা ছিল ইত্যাদি। (আমাকে নিয়ে আসার পরের দিন চাকর পাঠিয়ে জেলকুঠুরি থেকে সব বই সে নিয়ে এসেছিল।) 'সবকিছু'র মধ্যে আরও ছিল যা কিছু আমি শুনেছি ও দেখেছি, নদী, সেতু, হ্রদ, গুহা, মেঘ ও সমুদ্র, ভূমিকম্প ও বাজ পড়ার কারণ প্রভৃতিও 'সবকিছু'র মধ্যে ছিল । মাঝরাত নাগাদ সে আমাকে জানাল যে গ্রহনক্ষত্রই তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়ছিল, সে বলল যে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ওই গ্রহটির অস্তিত্ব আছে কি নেই তার নিশ্চিত প্রমাণ অন্তত আমাদের পেতেই হবে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সারাদিন কাটানো কোনো মানুষের বিধ্বস্ত চোখ দিয়ে আমি আমাদের দু'জনের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আবার লক্ষ্য করলাম। হোজা ধীরে ধীরে 'শেখানো' শব্দটার ব্যবহার বন্ধ করে দিল : আমরা একত্রে সন্ধান করব, আবিষ্কার করব, অগ্রসর হব।

সুতরাং, আমরা কাজে নেমে পড়লাম। আমাদের অবস্থা ছিল এমন দুই বাধ্য ভাই বা ছাত্রের মতো যারা নজরে রাখার মতো প্রাপ্তবয়স্ক কেউ বাড়িতে না থাকলেও নিজেরাই নিষ্ঠাভরে কাজ চালিয়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে আমার নিজেকে উৎকণ্ঠিত বড় ভাইয়ের মতো মনে হত যে নিজের পুরনো পড়াগুলো আবার ঝালিয়ে নিতে রাজি হয়েছে যাতে তার অলস ছোটভাই তাকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু হোজার ব্যবহার ছিল বুদ্ধিমান শিশুর মতো, সে সবসময় এটাই প্রমাণ করতে চাইত যে তার বড় ভাইয়ের জ্ঞান এমন কিছু বেশি নয়। তার মতানুযায়ী, তাকে সাজানো বইয়ের সংখ্যা ও আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত বইয়ের সংখ্যা এই দুইয়ের মধ্যে যতটা পার্থক্য, আমার ও তার জ্ঞানের ফারাক তার থেকে বেশি নয়। বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও ক্ষিপ্র মস্তিষ্কের সৌজন্যে ছয় মাসের মধ্যেই ইতালীয় ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানটুকু সে অর্জন করে ফেলল, তারপর ধীরে ধীরে সেই ব্যুৎপত্তি আরও বাড়ল, আমার সব বইই তার পড়া হয়ে গেল এবং আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত যাবতীয় জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করতে যখন সে আবার আমাকে বাধ্য করল তখন আর কোনো অর্থেই আমি তার থেকে এগিয়ে ছিলাম না। তথাপি সে এমন একটা ভাব করত যেন বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে অধিকতর প্রাকৃতিক ও গভীরতর কোনো উচ্চস্তরীয় জ্ঞানে তার অধিগম্যতা আছে। বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের অধিকাংশই যে মূল্যহীন তা সে নিজেই মেনে নিয়েছিল। ছয় মাসের শেষে আমরা আর একত্রে পাঠরত বা একত্রে অগ্রসরমান সঙ্গী রইলাম না। নতুন নতুন ধারণা মূলত সেই

জোগাতে লাগল আর আমি কেবল কিছু খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে অথবা তার অধীত জ্ঞানকে খানিক উসকে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগলাম।

'ভাবনাগুলো' মূলত রাতের দিকেই তার মাথায় খেলত। তার অধিকাংশই আমি অবশ্য এতদিনে ভুলে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলাতেই আমরা রাতের খাওয়া সেরে নিতাম। তার বহু পরে যখন চারপাশের সব বাতি নিভে যেত এবং চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করত তখন তার মাথায় 'ভাবনা' জন্ম নিত। সকালে কয়েকটি মহল্লা পেরিয়ে এক মসজিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে পড়াতে যেত এবং সপ্তাহে দুদিন আবার দূরবর্তী এক জেলায় এক মসজিদের মালখানায় যেত। সেই মসজিদে আবার নামাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল। বাকি সময়টা আমরা হয় নৈশ 'ভাবনা'র জন্য প্রস্তুতি নিতাম অথবা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত 'ভাবনা' নিয়ে চর্চা করতাম। হোজার ওইসব 'ভাবনা' নিয়ে আমার আগ্রহ খুবই কম ছিল, তাছাড়া তখনো আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল যে আমি শীঘ্রই দেশে ফিরতে পারব। নানান 'ভাবনা'র খুঁটিনাটি নিয়ে হোজার সঙ্গে বিতর্ক জুড়ে দিলে পাছে দেশে ফিরতে অযথা বিলম্ব হয় তাই আমি প্রকাশ্যে কখনোই তার 'ভাবনা'র বিরোধিতা করিনি।

কাল্পনিক গ্রহটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে বার করতে গিয়ে আমরা নিজেদেরকে জ্যোতির্বিদ্যায় ডুবিয়ে দিলাম। এভাবেই প্রথম বছরটা কেটে গেল। তারপর দূরবীন তৈরি করবে বলে হোজা প্রচুর পয়সা দিয়ে ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে লেন্স কিনে আনল। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করল, নানান সারণী প্রস্তুত করল আর এসব ব্যস্ততার মাঝে গ্রহটির কথাই সে বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে হোজা আরও এক গভীরতর সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল—সে বলল যে সে টলেমির মত নিয়ে প্রশ্ন তুলবে! আমি কোনো তর্কে জড়ালাম না, সে বলে গেল আর আমি শুনে গেলাম। সে বলল যে স্বচ্ছ বৃত্ত থেকে গ্রহরা ঝুলছে এই বিশ্বাসটাই ভ্রান্ত, অন্য কোনো কিছু, কোনো অদৃশ্য শক্তি, সম্ভবত আকর্ষণের শক্তি তাদেরকে ওখানে ধরে রেখেছে। তারপর সে এমনও বলল যে সূর্যের মতো হয়তো পৃথিবীও অন্য কোনো কিছুর চারপাশে ঘুরছে। সম্ভবত আমাদের অজানা কোনো না কোনো মহাজাগতিক কেন্দ্রের চারপাশে সব তারারাই ঘুরছে। পরে সে আরও দাবী করল যে টলেমির থেকে তার তত্ত্ব অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত হবে। কয়েকটি নতুন গ্রহের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে সে আরও বিস্তৃত এক মহাবিশ্বের পরিকল্পনা পেশ করল। এই নতুন পরিকল্পনার পিছনে সে একটি তত্ত্বও খাড়া করল—সম্ভবত চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে এবং মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে শুক্র। কিন্তু এসব তত্ত্বের ভারে সে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার নতুন বক্তব্য হল যে এসব নতুন ভাবনার প্রস্তাবনার চেয়েও নক্ষত্র ও তাদের চলন সম্বন্ধে এখানকার মানুষকে অবহিত করাটাই হচ্ছে এখন প্রধান সমস্যা। সে ঠিকও করে ফেলল যে এই কাজ সে সাদিক পাশাকে দিয়েই শুরু করবে, কিন্তু সে সময়ই জানা গেল যে পাশাকে এরজুরামে নির্বাসিত করা হয়েছে। তিনি সম্ভবত এমন কোনো চক্রান্তে জড়িত ছিলেন যা ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাসন থেকে পাশার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পরবর্তী কয়েক বছরে আমরা বসফোরাস স্রোত নিয়ে গবেষণা চালালাম। বসফোরাস স্রোতের কারণ সম্বন্ধে হোজা নিবন্ধ লিখবে বলে ঠিক হল। মাসের পর মাস আমরা স্রোত পর্যবেক্ষণ

করতে লাগলাম, হাড় কাঁপানো হাওয়ার মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নীচে প্রণালীর দিকে নজর রাখার পাশাপাশি প্রণালীতে গিয়ে মিলছে যেসব নদী তাদের জলের তাপমাত্রা ও স্রোত মাপার জন্য পাত্র হাতে উপত্যকাতেও নেমে যেতাম।

একবার পাশার অনুরোধে তার কোনো ব্যবসাসংক্রান্ত কাজ দেখভালের জন্য আমরা তিনমাস ইস্তাম্বুলের অদূরে গেব্জে নগরীতে ছিলাম। সেখানকার বিভিন্ন মসজিদে নামাজের সময়ের বিভিন্নতা লক্ষ্য করে হোজার মাথায় নতুন ভাবনা এল—সে এমন একটি ঘড়ি বানাবে যা নামাজের সময় নির্ভুলভাবে জানান দেবে। টেবিল বলতে কী বোঝায় তা এ সময়েই আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। এক ছুতোরকে দিয়ে আমার পছন্দসই একটি টেবিল বানিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসলাম, কিন্তু হোজার তা পছন্দ হল না। টেবিলের সঙ্গে সে চারপেয়ে শবাধারের মিল খুঁজে পেল, ফলে সেটি তার কাছে অশুভ বলে মনে হল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে টেবিল ও কেদারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল এবং ওতেই যে তার ভাবা ও লেখা ভালো হচ্ছে তাও ঘোষণা করে দিল। ডুবন্ত সূর্যের কক্ষপথসদৃশ উপবৃত্তাকার নামাজী ঘড়িটির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনতে আমাদের ইস্তাম্বুল যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে সেই টেবিল খচ্চরের পিঠে চেপে ও নক্ষত্রের দিকে পা তুলে আমাদের পিছু পিছু এল।

প্রথম কয়েকমাস আমরা যখন টেবিলে পরস্পরের মুখোমুখি বসতাম তখন হোজা উত্তরের দেশগুলোতে নামাজ ও উপবাসের সময় নির্ধারণের উপায় ভাবার চেষ্টা করত। সেসব দেশে দিন ও রাতের সময়ের ব্যাপ্তির পার্থক্য বিশাল এবং বছরের পর বছর সূর্যের মুখ না দেখেই মানুষ সেখানে দিন কাটায়। পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা কি আছে যেখানে দাঁড়িয়ে যে কোনো দিকে মুখ ফেরালেই তা মক্কাভিমুখী হয়—এই জিজ্ঞাসাও ছিল আরেকটি সমস্যা। এই সমস্যাগুলো সম্বন্ধে আমার উদাসীনতা সে উপলব্ধি করত। সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি তার অবজ্ঞা ও ঘৃণাও বাড়তে লাগল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে সে আমার 'শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য'র মধ্যে প্রভেদ করতে পেরেছিল এবং সে বিশ্বাস করত যে আমি নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। এই বিশ্বাসটিই সম্ভবত তাকে আমার উপর বিরক্ত করে তুলেছিল। সে তাই বিজ্ঞানের মতোই বুদ্ধিমত্তাকেও সমান গুরুত্ব দিত। সে বলত যে পাশা ফিরে আসলে নিজ পরিকল্পনা, নমুনার সাহায্যে প্রদর্শিত মহাবিশ্বের ক্রমোন্নত তত্ত্ব, নতুন ঘড়ি ইত্যাদির সৌজন্যে সে তার অনুগ্রহ লাভ করবে। তার আশা ছিল যে তার মনের মধ্যে প্রজ্বলিত কৌতূহল ও উৎসাহকে সে আমাদের সকলের মধ্যে সংক্রামিত করে দিয়ে এক নবোন্মেষের বীজ বপন করবে। আমরা দু'জনেই সেই অপেক্ষায় ছিলাম।

## ৩

সেই সময় হোজা বিশাল বড় একটি যান্ত্রিক ঘড়ি বানানোর কথা ভাবছিল যাতে সপ্তাহে একবারের বদলে মাসে একবার দম দিলেই চলবে। ওরকম একটি যন্ত্র বানাতে পারলে তারপরে আরও এমন একটি ঘড়ি বানাবার ভাবনা তার ছিল যাতে বছরে একবার মাত্র দম দিলেই হবে। অবশেষে একদিন সে ঘোষণা করল যে ওই বিশাল ঘড়ির দাঁতওয়ালা চাকাকে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির ব্যবস্থা করতে পারার মধ্যেই সমস্যাটির সমাধান লুকিয়ে আছে, দুবার দম দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাপের উপর নির্ভর করে সেই দাঁতওয়ালা চাকার সংখ্যা ও ওজন বাড়াতে হবে। সেদিনই মসজিদের মালখানায় তার বন্ধুদের কাছ থেকে সে জানতে পারল যে পাশা এরজুরাম থেকে ফিরে উচ্চতর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পরদিন সকালেই হোজা তাকে অভিনন্দন জানাতে গেল। পাশা তাকে দর্শনার্থীদের ভিড় থেকে আলাদা করে নিয়ে তার বিভিন্ন আবিষ্কার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং এমনকি আমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন। সেই রাতে আমরা একাধিকবার ঘড়িটার সব যন্ত্রপাতি খুলে আবার লাগালাম, আমাদের মহাবিশ্বের নমুনায় দু-একটি জিনিস যোগ করলাম ও গ্রহগুলোকে তুলি দিয়ে রাঙিয়ে দিলাম। হোজা অনেক কষ্ট করে গ্রহদের ঘূর্ণনের যুক্তিসমৃদ্ধ একটি বক্তৃতা তৈরি করেছিল। মার্জিত ভাষা ও কাব্যিক অলঙ্কারের জোরে শ্রোতাদের প্রভাবিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সেই বক্তৃতা মুখস্থ করে তার অংশবিশেষ সে আমাকে আগেই পড়ে শুনিয়েছিল। ভোরের দিকে নিজের স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে আমার সামনে আরও একবার সেই মুখস্থ আউড়ে গেল, তবে আবৃত্তি করার কারণে এবার তা জাদুমন্ত্রের মতো শোনালো। তারপর এক ভাড়ার মালগাড়িতে যন্ত্রপাতি চাপিয়ে সে পাশার প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মাসের পর মাস ধরে যে ঘড়ি ও নমুনা আমাদের ঘর জুড়ে পড়েছিল তা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপানোর পর এত ছোট দেখাতে লাগল যে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সেদিন অনেক রাতে হোজা বাড়ি ফিরেছিল।

প্রাসাদের বাগানে ওসব অদ্ভুতুড়ে যন্ত্রপাতি নামানোর পরে পাশা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা পর্যবেক্ষণ করলেন। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার কারণে তাকে নাকি রগচটা বুড়োর মতো দেখতে লাগছিল। প্রতিক্রিয়া জানানোর কোনো সুযোগ না দিয়েই হোজা সঙ্গে

সঙ্গে মুখস্থ করা বক্তৃতাটা তার সামনে আওড়ে গেল। আমাকে ইঙ্গিত করে পাশা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওই কি তোমায় এসব শিখিয়েছে?' এই একই প্রশ্ন বহু বছর পরে সুলতানও করেছিলেন। এই ইঙ্গিতই ছিল পাশার একমাত্র প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু হোজার উত্তর তাকে আরও বেশি বিস্মিত করেছিল। উত্তরে হোজা পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কে?' কিন্তু তারপরই বুঝতে পারে যে পাশা আমার কথা বলছেন। হোজা তাকে জানিয়েছিল যে আমি এক পুঁথিপড়া মূর্খ মাত্র। আমার কাছে সেই ঘটনা বর্ণনা করার সময় সে কিন্তু আমার কথা মোটেই ভাবেনি। সেই ঘটনাতেই তার মন মগ্ন ছিল। সে জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে সবই তার নিজস্ব আবিষ্কার, কিন্তু পাশা তাকে বিশ্বাস করেন নি। তবে দোষ চাপাবার জন্য তিনি যেন অন্য কাউকে খুঁজে পেতে চাইছিলেন কারণ প্রিয় হোজাকে দোষী বলে মেনে নিতে তার মন সায় দিচ্ছিল না।

এভাবে নক্ষত্রের পরিবর্তে আমি তাদের কথোপকথনের বিষয় হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা যে হোজাকে খুশি করেনি তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম। অন্যান্য অতিথিদের প্রতি পাশা যখন মনোযোগ দিচ্ছিলেন তখন সে চুপ করে যাচ্ছিল। খাওয়ার আসরে হোজা আরও একবার জ্যোতির্বিদ্যা ও তার আবিষ্কারের কথা তোলার চেষ্টা করলে তার উত্তরে পাশা বলেছিলেন যে তিনি আমার মুখটা মনে করার চেষ্টা করছেন অথচ আমার মুখের পরিবর্তে হোজার মুখটাই তার মনে পড়ছে। টেবিলে অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিল, মানুষকে কেমন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে তাই নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে অতিরঞ্জিত উদাহরণসহ আলোচনা শুরু হয়ে গেল—এমনসব যমজ যাদের মায়েরাও পৃথক করতে পারে না, একইরকম দেখতে এমন সব মানুষ যারা পরস্পরকে ভয় পাইয়ে দিলেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো অন্যজনকে কখনো ছাড়তেও পারে না, সেইসব ডাকাত যারা নিরপরাধদের নাম ধারণ করে তাদের জীবনযাপন করছে প্রভৃতি। ভোজনান্তে অতিথিরা যখন বিদায় নিচ্ছিল তখন পাশা হোজাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

হোজা আবার কথা বলতে শুরু করার পর পাশা তা আদৌ উপভোগ করছিলেন বলে মনে হল না, পরস্পরবিরোধী ও অবোধ্য সব তথ্যরাজি তার খুশহাল মেজাজকে খারাপ করে দেওয়ায় তাকে এমনকি অপ্রসন্নও দেখাচ্ছিল। কিন্তু হোজার হৃদয়মথিত বক্তৃতা তৃতীয়বার শোনার পরে এবং নিজের চোখের সামনে আমাদের নমুনায় পৃথিবী ও অন্যান্য নক্ষত্রদের ঘুরতে দেখে অবশেষে ব্যাপারটা যেন তার কিঞ্চিৎ বোধগম্য হল। অন্ততপক্ষে ন্যূনতম কৌতূহলের সঙ্গে তিনি হোজার কথা শুনতে শুরু করলেন। এই সময়ে হোজা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করল যে নক্ষত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সকলের চিরাচরিত ধারণা আসলে ঠিক নয় এবং তারা এভাবে ঘোরে। 'খুব ভালো,' অবশেষে পাশা বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি এও সম্ভব, আর সম্ভব হবে নাই বা কেন।' উত্তরে হোজা চুপ করে রইল।

নীরবতা বেশ দীর্ঘই ছিল বলে মনে হয়। জানালা দিয়ে বাইরে সোনালি শিঙার উপর ছেয়ে থাকা অন্ধকারে চোখ রেখে হোজা বলল, 'কেন তিনি ওটুকুতেই থেমে গেলেন, আরও কেন এগোলেন না?' এটা যদি কোনো প্রশ্ন হয়ে থাকে, তবে এর উত্তর হোজার তুলনায় বেশি আমার জানা ছিল না। পাশা আরও কী বলতে পারতেন তা নিয়ে হোজার একটা ধারণা ছিল বলে আমার মনে হল, কিন্তু সে কিছু বলল না।

অন্যরা তার স্বপ্নের ভাগীদার হচ্ছে না বলে সে যেন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিল। পাশা অবশ্য ধীরে ধীরে ঘড়িটি সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন এবং ঘড়িটির কলকজা খুলে তার দাঁতের উপযোগিতা, ক্রিয়াবিধি, প্রতি ওজন প্রভৃতি ব্যাখ্যাসহকারে বুঝতে চেয়েছিলেন। তারপর ঘনান্ধকার ও ঘিনঘিনে সাপের গর্তের দিকে ভয়ে ভয়ে এগোনোর মতো আশঙ্কিত চিত্তে তিনি ঘড়ির কাঁটার উপরে আঙুল রাখলেন ও রেখেই তুলে নিলেন। হোজা তখন ঘড়িদণ্ড ও নির্দিষ্ট সময়ে সকলের সমবেত প্রার্থনার শক্তি নিয়ে বক্তব্য রাখছিল। হঠাৎই পাশা ফেটে পড়লেন, 'ওকে ঝেড়ে ফেল! চাইলে বিষ খাইয়ে মারো, চাইলে স্বাধীন করে দাও। তুমি অনেক স্বস্তিতে থাকবে।' মুহূর্তের জন্য হলেও একইসাথে ভয় ও আশা নিয়ে আমি নিশ্চয় হোজার দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে জানিয়ে দিল যে যতক্ষণ না 'তারা' বুঝতে পারছে ততক্ষণ সে আমাকে স্বাধীনতা দেবে না।

'তারা' কী বুঝবে তা আর আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমার সম্ভবত এই আশঙ্কাও ছিল যে হোজা নিজেও হয়তো জানে না তাদের কী বুঝতে হবে। পরে অন্য নানা ব্যাপারে কথা বললেও পাশা তার সামনে পড়ে থাকা যন্ত্রগুলোর দিকে ঘৃণাভরে তাকাচ্ছিলেন। পাশার আগ্রহ পুনর্জাগ্রত হবে এই আশায় হোজা গভীর রাত পর্যন্ত প্রাসাদে থেকে গিয়েছিল, যদিও সে যে আর সেখানে কাঙ্ক্ষিত নয় তা সে বুঝতে পেরেছিল। অবশেষে সে তার যন্ত্রপাতি গাড়িতে তুলে ফেলল। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম যে সেই অন্ধকার ও নির্জন ফিরতি রাস্তার ধারে কোনো বাড়িতে কেউ বিছানায় শুয়ে জেগে রয়েছে এবং চাকা গড়ানোর আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সেই বিশাল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ সে অবাক হয়ে কান পেতে শুনছে।

ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত হোজা জেগে বসে রইল। ফুরিয়ে আসা মোমবাতিটা আমি বদলে দিতে চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে বারণ করল। আমি বুঝতে পারলাম যে সে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়, তাই আমি বললাম, 'পাশা বুঝতে পারবেন।' তখনো চতুর্দিক অন্ধকার, সম্ভবত আমার মতোই সেও জানত যে আমার কথায় আমার নিজেরই কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলল যে যে মুহূর্তে পাশা কথা বলা থামিয়ে দিলেন সেই মুহূর্তটির রহস্য উন্মোচন করাই হল মূল সমস্যা।

সেই রহস্য সমাধানের লক্ষ্যে প্রথম সুযোগেই হোজা তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। এবার পাশা প্রসন্নচিত্তে হোজাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন যে হোজার যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি, অন্ততপক্ষে যা করতে চাওয়া হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। এভাবে হোজার অনুভূতিকে প্রশমিত করার পরে তিনি তাকে অস্ত্র বানানোর কাজে নিযুক্ত হতে পরামর্শ দিলেন। 'এমন এক অস্ত্র যাতে দুনিয়াটা আমাদের শত্রুদের কাছে জেলখানা হয়ে ওঠে!' এই ছিল তার মন্তব্য, কিন্তু অস্ত্রটিকে কেমন হতে হবে সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না। হোজা যদি বিজ্ঞানের প্রতি নিজের অনুরক্তিকে এই অভিমুখে চালিত করে তবে পাশা তাকে সমর্থন করবেন। আমরা যে ভাতা পাব বলে আশা করেছিলাম তা নিয়ে তিনি কিন্তু কোনো কথাই বললেন না। তিনি হোজাকে কেবল রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ একটি থলি ধরিয়ে দিলেন। বাড়িতে ফিরে সেই থলি খুলতে আমরা সতেরোটি মুদ্রা পেলাম–অদ্ভুত একটা সংখ্যা! থলিটি দেওয়ার পর

তিনি হোজাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে তাকে একবার দর্শন দেওয়ার জন্য তিনি বালক সুলতানকে বোঝাবেন কারণ বালকটি 'এই জাতীয় ব্যাপারে' উৎসাহী। হোজা খুব সহজেই উৎসাহী হয়ে উঠত তবুও সে বা আমি কেউই তার প্রতিশ্রুতিকে খুব গুরুত্বসহকারে নিইনি, কিন্তু এক সপ্তাহ বাদেই খবর এল যে সান্ধ্য উপবাসভঙ্গের পরে সুলতান সমীপে পাশা আমাদেরকে, হ্যাঁ, এমনকি আমাকেও পেশ করবেন।

সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে পাশার সামনে প্রদত্ত বক্তৃতাটিই হোজা আবার মুখস্থ করে ফেলল, তবে নয় বছরের বালকটির কাছে যাতে তা বোধগম্য হয় তার জন্য তাতে কিছু পরিবর্তন ঘটাল। কিন্তু তখনো তার মন সুলতানের বদলে পাশার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল, পাশার নীরব হয়ে যাওয়ার কারণ তখনো সে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। এর পিছনে লুকানো সত্যটি সে একদিন আবিষ্কার করবেই। পাশা যে অস্ত্রটি বানাতে চাইছেন তা আদতে কেমন হবে? আমার বলার সুযোগ আর বেশি ছিল না, হোজা একাই কাজ করছিল। মাঝরাত পর্যন্ত নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সে কাজ করত, আর আমি অলসভাবে জানালায় বসে থাকতাম। নিজের দেশে ফেরার কথাও আমি আর ভাবতাম না, তার বদলে নিষ্পাপ শিশুর মতো দিবাস্বপ্ন দেখতাম যে হোজার স্থানে আমিই টেবিলে বসে কাজ করছি এবং যখন খুশি স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারছি! তারপর এক সন্ধ্যাবেলা মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে আমরা প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ইস্তাম্বুলের রাস্তায় হাঁটতে আমার ভালোই লাগত, বাগানের দৈত্যাকার ঝাউ, চেষ্টনাট ও এরুগুভান গাছেদের মাঝে ভূতের মতো নিজেকে অদৃশ্য বলে মনে হত। পরিচারকদের সাহায্যে আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতীয় দরবারে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে প্রস্তুত হলাম।

সুলতান ছিলেন লালচে গালের এক মিষ্টি শিশু। তার উচ্চতা ছিল তাঁর বয়সানুপাতিক। যন্ত্রপাতিগুলোকে তিনি খেলনা ভেবে নাড়াচাড়া করলেন। আমি কি এখন সেই সময়ের কথা ভাবছি যখন আমি সুলতানের সঙ্গী ও বন্ধু হতে চেয়েছিলাম, নাকি তার থেকে প্রায় পনেরো বছর পরের কথা ভাবছি যখন তার সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল? আমি তা ঠিক বলতে পারব না, তবে একথা আমার তখনই মনে হয়েছিল যে ওনার প্রতি কোনো অন্যায় আমি করতে পারব না। সুলতানের দর্শনাভিলাষী কৌতূহলী ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে হোজার মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। অবশেষে সে যখন সুযোগ পেল তখন সে তার বক্তব্যে নতুন নতুন তথ্য জুড়ে দিতে লাগল। সে নক্ষত্রদের এমনভাবে বর্ণনা করল যেন তাদের বুদ্ধিমান সজীব অস্তিত্ব রয়েছে, পাটিগণিত ও জ্যামিতির জ্ঞানসম্পন্ন আকর্ষণীয় প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তারা ঘুরে চলেছে। বালকটি যে প্রভাবিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝেই বিস্ময়ে আকাশপানে চাইছে তা লক্ষ্য করে সে আরও উদ্দীপিত হয়ে উঠতে লাগল। দেখুন, স্বচ্ছ ঘূর্ণায়মান নভোমণ্ডল থেকে ঝুলন্ত গ্রহগুলোকে ওখানে নমুনার সাহায্যে দেখানো হয়েছে, এই হল শুক্র ও এই পথে তা ঘুরছে আর ওই যে বিশাল ঝুলন্ত গোলকটিকে দেখছেন, ও হল চাঁদ এবং চাঁদ, আপনি বুঝতেই পারছেন, একটা ভিন্ন পথ ধরে পরিক্রমা করছে। হোজা যখন নক্ষত্রদের ঘোরাতে ব্যস্ত তখন নমুনাটির সঙ্গে আটকানো ঘণ্টা থেকে হঠাৎই একটি মিষ্টি ধ্বনি নির্গত হল। ছোট্ট সুলতান ভয় পেয়ে

এক পা পিছিয়ে গেলেন, তারপর সাহস ফিরে পাওয়ার পর তিনি আবার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন এবং ধ্বনি নিঃসরণকারী যন্ত্রটির দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেলেন যেন তিনি কোনো জাদু সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

এখন, নিজের অতীতকে পুনরাবিষ্কার করতে গিয়ে উদ্ভুত এই সুখের প্রতিচ্ছবিকে শৈশবে শোনা কোনো নীতিকথার গল্পের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হল, ঠিক যেমন চিত্রকর রূপকথার বইয়ের জন্য যথাযথ ছবি আঁকেন। ইস্তাম্বুলের রুটির মতো লালরঙা ছাদগুলোকে এমন কাঁচের গোলকে ঢেকে দিতে হবে যা ঝাঁকালে বরফকুচি ছিটকে বেরোবে। বালক সুলতান ইতিমধ্যেই হোজাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন আর সে তার উত্তর দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নক্ষত্ররা আসমানে থাকে কী করে? তারা কি স্বচ্ছ গোলক থেকে ঝোলে! গোলকগুলো কীসের তৈরি? অদৃশ্য বস্তু দিয়ে তৈরি বলে তারা নিজেরাও তবে অদৃশ্য! নক্ষত্রগুলো একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় না? নাকি, প্রত্যেকের নিজস্ব একটি এলাকা আছে, যেমন এই নমুনায় দেখানো হয়েছে! এত নক্ষত্র, অথচ অত গোলক নেই কেন? কারণ তারা অনেক দূরে রয়েছে! কত দূর? অনেক, অনেক! অন্যান্য নক্ষত্রদেরও কি ঘণ্টা আছে যেগুলো তাদের ঘোরার সময়ে বাজতে থাকে? না, নক্ষত্রদের একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন বোঝাবার জন্য আমরা ঘণ্টাগুলো ব্যবহার করেছিলাম! বজ্রপাতের সঙ্গে নক্ষত্রের সম্পর্ক আছে? না, কিছুই নেই! তবে কীসের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে? বৃষ্টি! আগামীকাল কি বৃষ্টি হবে? আসমান পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাচ্ছে যে হবে না! আসমান দেখে সুলতানের অসুস্থ সিংহটা সম্বন্ধে কী জানা যাচ্ছে? সে ক্রমশ ভালো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার জন্য ধৈর্য্য ধরতে হবে। এভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। নক্ষত্র সম্বন্ধে কথা বলার সময় হোজা যেমন আসমানের দিকে দৃষ্টি রেখেছিল তেমনই অসুস্থ সিংহটা সম্বন্ধে বলার সময়েও তার দৃষ্টি আসমানের দিকেই ছিল। ঘরে ফেরার পরে সে এই কথাটা উল্লেখ করল, তবে এও বলল যে তাতে কিছু যায় আসে না। বালকটি বিজ্ঞান ও কুতর্কের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু কিছু জিনিস তার 'উপলব্ধি' করা উচিত এবং সেটাই হল গুরুত্বপূর্ণ। সে আবার একই শব্দ ব্যবহার করল যেন বালকটির কী উপলব্ধি করা উচিত তা আমি বেশ বুঝি, অথচ আমি তখন ভাবছিলাম যে আমি মুসলমান হই বা না হই তাতে কিছু যায় আসে না। প্রাসাদ ত্যাগের সময়ে তাদের দেওয়া পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রাই কেবল থলিতে ছিল। হোজা বলল যে নক্ষত্রদের মধ্যে ঘটমান যাবতীয় ঘটনার পিছনেই যে একটা যুক্তি আছে তা সুলতান বুঝতে পেরেছেন। ওহ্, সুলতান! পরে, বহু পরে আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম! এই একই চাঁদ আমার বাড়ির জানালাতেও উঁকি মারে এই ভেবে আমার বিস্ময় জাগত, আমি আবার শিশু হয়ে যেতে চাইতাম! নিজেকে থামাতে না পেরে হোজা সেই একই বিষয় উত্থাপন করল : সিংহের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বালকটি জন্তু জানোয়ার ভালোবাসে, সেটাই বড় কথা।

পরের দিন সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাজ করতে শুরু করল। কয়েকদিন পরে ঘড়ি ও নক্ষত্রগুলোকে আবার গাড়িতে চাপানো হল। জাফরি কাটা জানালাগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে এবার গাড়ি চলল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে। সন্ধ্যাবেলা সে হতাশ হয়ে ফেরত এল, তবে

চুপ করে থাকার মতো অতটা হতাশও সে ছিল না। "আমি ভেবেছিলাম সুলতানের মতো শিশুরাও বুঝতে পারবে, কিন্তু আমার ভাবনায় ভুল ছিল," সে বলল। শিশুরা কেবল ভয় পেয়েছিল, ভাষণের পরে হোজার প্রশ্নের উত্তরে একটি শিশু কেবল বলেছিল যে, আসমানের অপর পারে দোজখ আছে, আর বলেই সে কাঁদতে শুরু করেছিল। সুলতানের বুদ্ধিমত্তার উপর নিজের ভরসা জোরদার করতে গিয়ে হোজা পরের সপ্তাহটি কাটিয়ে দিল। দ্বিতীয় দরবারে আমাদের কাটানো প্রতিটি মুহূর্তকে সে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে আমার সমর্থন আদায় করতে লাগল বালকটি বুদ্ধিমান, হ্যাঁ, কেমনভাবে ভাবতে হয় তা সে ইতিমধ্যেই জানে, হ্যাঁ, তার চারপাশের মানুষের চাপ সহ্য করার মতো দৃঢ়তা তার ইতিমধ্যেই আছে, হ্যাঁ! এভাবে আমরা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। অনেক বছর পরে সুলতানও আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার বহু আগেই আমরা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। এই সময় হোজা ঘড়িটি নিয়েও ব্যস্ত ছিল এবং আমার বিশ্বাস যে অস্ত্রটা সম্বন্ধেও সে অল্পস্বল্প ভাবনাচিন্তা করছিল। পাশার আহ্বানে তার সামনে হাজির হয়ে হোজা তাকে তেমনি জানিয়েছিল। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে পাশার প্রতি তার আর কোনো ভরসা ছিল না। সে বলত, 'পাশা অন্যদের মতোই হয়ে গিয়েছেন, তিনি যা জানেন না তা আর জানতেও চান না।' এক সপ্তাহ বাদে সুলতান তাকে আবার ডেকে পাঠালেন এবং সে গিয়ে হাজির হল।

সুলতান প্রসন্নচিত্তে হোজাকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন, 'আমার সিংহটি এখন ভালোর দিকে, যেমন আপনি বলেছিলেন।' তারপর নিজের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে সুলতান দরবারের বাইরে বেরিয়ে এলেন। পুকুরের মাছ দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে সুলতান হোজার মত জানতে চাইলেন। 'ওদের গায়ের রঙ লাল।' পরে ফিরে এসে হোজা আমাকে বলেছিল, 'বলার মতো আর কিছু আমার মাথায় আসেনি।' তারপর হঠাৎ তার নজরে এসেছিল যে মাছেদের নড়াচড়ার মধ্যে যেন একটা নক্সা আছে, তারা যেন নক্সাটিকে অধিকতর নিখুঁত করার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছে। হোজা তখন বলেছিল যে মাছগুলোকে তার বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। ঠিক সেই সময় হারেমের এক খোজার পাশে দণ্ডায়মান একটি বামন সুলতানকে ক্রমাগত তার মায়ের সাবধানবাণীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। হোজার ওই মন্তব্য শুনে সে হেসে ফেলাতে সুলতান তাকে তিরস্কার করলেন। শাস্তি হিসেবে গাড়িতে ওঠার পরে তিনি লালচুলো বামনটিকে তার পাশে বসার অনুমতি দিলেন না।

এরপর তারা গাড়ি করে রঙ্গভূমিতে সিংহের ডেরায় হাজির হলেন। একটি সুপ্রাচীন গির্জার বিভিন্ন থামের সঙ্গে শিকল দিয়ে সিংহ, লেপার্ড ও প্যান্থারদের বেঁধে রাখা হয়েছিল। সুলতান হোজাকে একেক করে তাদের ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। যে সিংহটি ভালো হয়ে উঠবে বলে হোজা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার সামনে এসে তারা থামলেন। বালক সুলতান সিংহটির সঙ্গে কথা বললেন এবং তার সাথে হোজার আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর তারা কোণায় শুয়ে থাকা অন্য আরেকটি সিংহীর দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্যান্যদের মতো এর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল না। সিংহীটি গর্ভবতী ছিল। উজ্জ্বল চোখে উৎসাহী দৃষ্টি নিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সিংহীটি ক'টি বাচ্চার জন্ম দেবে? তার মধ্যে কতগুলো মদ্দা হবে আর কতগুলোই বা মাদী?'

প্রশ্নের চোটে ঘাবড়ে গিয়ে হোজা এমন এক কাণ্ড করে বসল যাকে পরবর্তীকালে সে 'মহাভুল' বলে বর্ণনা করেছিল। সে সুলতানকে বলে বসল যে তার জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান আছে, তবে সে ভবিষ্যদ্বক্তা নয়। 'কিন্তু আপনি রাজগণক হুসেইন এফেন্দির থেকে বেশি জানেন!' বালকটি বললেন। আশপাশের কেউ পাছে শুনে নিয়ে হুসেইন এফেন্দিকে বলে দেয় এই ভয়ে হোজা কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু অধীর সুলতান ওই প্রসঙ্গেই আটকে রইলেন নাকি হোজা কিছুই জানে না, সে কি তবে বৃথাই নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে? ফলে হোজা তক্ষুনি এমন সব বিষয় ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছিল যা সে অনেক পরে বলবে বলে ভেবে রেখেছিল। সে সুলতানকে বলল যে নক্ষত্রদের কাছ থেকে সে অনেক কিছু শিখেছে ও সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে অনেক উপযোগী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে। বিস্ফারিত চোখে শোনায় মগ্ন সুলতানের নীরবতাকে সদর্থক বলে ধরে নিয়ে সে বলে বসল যে নক্ষত্র দেখার জন্য একটি মানমন্দির তৈরি করা খুবই প্রয়োজনীয়। হোজার ঠাকুরদার নাম ছিল প্রথম আহ্‌মেত। সেই প্রথম আহ্‌মেতের ঠাকুরদা, তৃতীয় মুরাত মরহুম তাকিউদ্দিন এফেন্দির জন্য নব্বই বছর আগে একটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন, অবহেলার কারণে তা পরবর্তীকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চাইলে সেই মানমন্দিরের থেকে উন্নততর কিছুও তৈরি করা যেতে পারে তা হবে এমন এক বিজ্ঞান মন্দির যেখানে বসে পণ্ডিতরা নক্ষত্র ছাড়াও গোটা দুনিয়া, তার নদী ও মহাসাগর, মেঘ ও পাহাড়, ফুল ও গাছপালা এবং অতি অবশ্যই তার প্রাণীসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে এবং তারপর অবসর সময়ে তারা একত্রে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা ও তাদের প্রজ্ঞার উন্নতিসাধন ঘটাতে পারবে।

সুলতান হোজার এই প্রকল্পের কথা এমনভাবে শুনলেন যেন তিনি কোনো পছন্দসই নীতিকথার গল্প শুনছেন। এই পরিকল্পনা আমিও সেই প্রথম শুনলাম। গাড়িতে চড়ে প্রাসাদে ফেরার সময় সুলতান আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সিংহটি কেমন জন্ম দেবে বলে আপনার মনে হয়?' এবার হোজা খানিক ভেবে উত্তর দিল, 'সমসংখ্যক পুং ও স্ত্রী বাচ্চার জন্ম দেবে।' বাড়িতে ফিরে সে আমাকে বলল যে, এই কথা বলায় কোনো বিপদ নেই। 'ওই নির্বোধ বালকটিকে আমি তালুবন্দী রাখব, আমি রাজগণক হুসেইন এফেন্দির থেকে অধিকতর কুশলী,' সে বলল। তার মুখে সুলতান সম্বন্ধে এই শব্দের ব্যবহার শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, এমনকি খানিকটা বিরক্তিও লাগল। সেই সময় একঘেয়েমি কাটাতে আমি নিজেকে বাড়ির কাজে ব্যস্ত রাখতাম।

পরবর্তীকালে 'নির্বোধ' শব্দটিকে সে এমনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করল যেন তা যেকোনো দরজা খোলায় সক্ষম এমন জাদুকাঠি তারা 'নির্বোধ' বলে মাথার উপরে চলমান নক্ষত্রের দিকে তাকাত না ও সে সম্বন্ধে ভাবতও না, তারা 'নির্বোধ' বলে কোনোকিছু শেখার আগে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে জানতে চাইত, তারা 'নির্বোধ' বলে খুঁটিনাটির বদলে কেবল সারমর্মে আগ্রহী ছিল, তারা 'নির্বোধ,' তাই তারা সবাই একই প্রকৃতির এবং এই জাতীয় আরও অনেক বক্তব্য। মাত্র কয়েক বছর আগেও যখন আমি নিজের দেশে বাস করতাম তখন আমিও এভাবেই মানুষের সমালোচনা করতে পছন্দ করতাম, কিন্তু এ ব্যাপারে হোজাকে আমি কিছুই বলতাম না। সে সময়

আমি নই, নির্বোধরাই তার মন জুড়ে ছিল। আপাতভাবে আমার ত্রুটিটা ছিল অন্যত্র। আমার অর্বাচীনতার ফলে আমার দেখা এক স্বপ্নের কথা আমি তাকে বলে ফেলেছিলাম : আমার পরিবর্তে সে ফিরে গেছে আমার দেশে, আমারই বাগদত্তাকে সে বিয়ে করছে, বিবাহানুষ্ঠানে কেউ বুঝতে পারছে না যে সে আমি নয়, এক তুর্কীর ছদ্মবেশে কোণায় দাঁড়িয়ে আমি অনুষ্ঠানটি দেখছি, সে সময় আমি আমার মা ও বাগদত্তার সামনে গিয়েও দাঁড়ালাম, কিন্তু তারা আমাকে চিনতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমার চোখ জলে ভরে এল এবং সেই জলই অবশেষে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল।

সে সময় পাশার প্রাসাদে হোজা দু'বার গিয়েছিল। তার সতর্ক দৃষ্টিকে এড়িয়ে হোজা সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছে এতে পাশা খুশি হননি বলেই আমার বিশ্বাস। পাশা তাকে জেরা করেছিলেন, আমার কথা জানতে চেয়েছিলেন, আমার সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিয়েছিলেন। তবে হোজা আমাকে এসব জানিয়েছিল অনেক পরে যখন পাশাকে ইস্তাম্বুল থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছিল। তার ভয় ছিল যে আমি ওসব জানলে বিষপ্রয়োগে হত্যার আতঙ্কে দিন কাটাবো। তথাপি আমি জোর দিয়ে একথা বলতে পারি যে পাশা হোজার থেকে আমাকে নিয়েই বেশি চিন্তান্বিত ছিলেন। এই ব্যাপারটা আমার গর্বের পালে বেশ হাওয়া দিত যে হোজার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য আমার নিজের থেকে পাশাকে বেশি খোঁচা দিচ্ছে। সে সময় এই সাদৃশ্য যেন এমন এক গোপনীয় ব্যাপার ছিল যা হোজা কখনোই জানতে চাইত না আর অন্যদিকে যার অস্তিত্ব আমাকে এক অদ্ভুত সাহস জোগাত, কখনো কখনো তো আমি এমনও ভাবতাম যে কেবল এই সাদৃশ্যের কারণেই হোজা যতদিন জীবিত আছে ততদিন আমিও নিরাপদ থাকব। হোজা যখন পাশাকেও ওরকম এক 'নির্বোধ' বলে আখ্যা দিল তখন সম্ভবত এই কারণেই আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম। হোজা এতে বিরক্ত হয়েছিল। সে আমার মধ্যে এক নতুন ঔদ্ধত্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তার জীবনে আমার প্রয়োজনীয়তা এবং আমার সামনে তার অস্বস্তি বা লজ্জা উভয়ই আমি অনুভব করতে চাইতাম। আমি তাকে পাশার ব্যাপারে এবং আমাদের দুজনের প্রতি পাশার মনোভাব সম্বন্ধে ক্রমাগত প্রশ্ন করে যেতাম। সেই নিরন্তর প্রশ্নবাণ হোজার মনে এমন এক দমবন্ধ করা রাগ তৈরি করে দিল যার কারণ, আমার বিশ্বাস, তার নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না। এরপরও সে একগুঁয়েভাবে বলে যেত যে তারা পাশাকেও ঝেড়ে ফেলবে ও রক্ষীবাহিনী শীঘ্রই কিছু একটা করবে কারণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সে টের পেয়েছে। এই কারণে পাশার প্রস্তাব অনুসারে তাকে যদি কোনো অস্ত্র বানাতেই হয় তবে সে তা এমন কোনো উজিরের জন্য বানাবে না যার নিজ পদের স্থায়িত্বই নিশ্চিত নয়, সে তা সুলতানের জন্য বানাবে।

কিছুকালের জন্য আমার ধারণা হয়েছিল যে অস্ত্র তৈরির এই দুর্বোধ্য ভাবনা নিয়েই সে বুঝি মেতে রয়েছে। আমি মনে মনে ভাবতাম যে সে খালি পরিকল্পনাই করছে, কিন্তু অগ্রসর হতে পারছে না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কিছু অগ্রগতি ঘটলে তা সে আমাকে অবশ্যই জানাবে। একথাও ঠিক যে আমার ভূমিকাকে সে অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে চাইবে, কিন্তু নিজের নক্সা সম্বন্ধে আমার মতামত শোনার জন্য তাকে একবার অন্তত সেকথা আমাকে জানাতে হবেই। প্রতি দু-তিন সপ্তাহ

অন্তর সঙ্গীত ও বেশ্যাসঙ্গের আকর্ষণে আমরা আক্‌সারায়ের এক বাড়িতে যেতাম। সেখান থেকে এক সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার সময়ে হোজা জানাল যে তার সকাল পর্যন্ত কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে, তারপর সে আমাকে নারী নিয়ে প্রশ্ন করল—আমরা কখনোই নারী নিয়ে কথা বলিনি—এবং তারপরই হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি ভাবছি...,' কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সে নিজেকে ঘরবন্দী করে ফেলল। সে কী ভাবছে তাও আর প্রকাশ করল না। কেবল বইগুলো রয়ে গেল আমার সাথে, সেগুলোর পাতা উল্টে দেখারও কোনো ইচ্ছা আমার তখন ছিল না। আমি ভাবছিলাম তার কথা : বন্ধ ঘরে সে টেবিলে বসে রয়েছে যদিও টেবিলে বসার ব্যাপারে সে এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি, কি না কি ভাবনা তার মাথায় খেলছে, যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তা নিয়ে সে এগোতে পারবে না, সামনে পড়ে থাকা শূন্য পাতার দিকে তাকিয়ে বসে থেকে লজ্জায় ও রাগে তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নিষ্ফলা কেটে যাবে...

মাঝরাত অতিক্রান্ত হওয়ার অনেক পরে সে ঘর থেকে বেরোল। কোনো তুচ্ছ প্রশ্নে পর্যুদস্ত হলে বিদ্যার্থী যেমন কুণ্ঠিতভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে তেমনি কাঁচুমাচু মুখে সে আমাকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে গেল। 'আমাকে সাহায্য কর,' সে হঠাৎ বলে উঠল। 'তাদের সম্বন্ধে একসাথে ভাবা যাক, আমি একা একা একটুও এগোতে পারছি না।' আমি চুপ করে রইলাম, প্রসঙ্গটা নারীঘটিত বলে আমার মনে হল। আমাকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি নির্বোধদের কথা ভাবছি। তারা এত বোকা কেন?' আমার উত্তর যেন তার জানাই ছিল, তাই সে আবার বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তারা বোকা নয়, কিন্তু তাদের মাথার ভিতরে কিছু একটা নেই।' 'তারা' কারা তা আর আমি জানতে চাইলাম না। 'তাদের মাথার ভিতরে কোনো কোণাতেও কি জ্ঞান সঞ্চয়ের একটুও জায়গা নেই?' একথা বলে সে এদিক-ওদিক এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন সে সঠিক শব্দটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। 'তাদের মাথার ভিতরে এই আলমারির তাকের মতো একটি প্রকোষ্ঠ থাকা উচিত ছিল, এমন একটি জায়গা যেখানে তারা নানান জিনিস রাখতে পারবে, কিন্তু মনে হয় সেরকম কিছুই সেখানে নেই। তুমি কি বুঝতে পারছ?' কিছু একটা বুঝতে পেরেছি বলে আমি বিশ্বাস করতে চাইছিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টায় ঠিক সফল হতে পারলাম না। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা নীরবে একে অপরের মুখোমুখি বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, 'একটা মানুষ যেরকম সেরকম সে কেন তা কে বলতে পারে?' সে আরও বলেই যেতে লাগল, 'আহ্, তুমি যদি সত্যিই একজন চিকিৎসক হতে এবং আমাকে আমাদের শরীর এবং শরীর ও মাথার অভ্যন্তর সম্বন্ধে শেখাতে পারতে! তাকে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত দেখাল। এরপর প্রসন্ন মনে সে ঘোষণা করে দিল যে সে শেষপর্যন্ত যাবে এবং হাল ছাড়বে না কারণ কী ঘটবে তা নিয়ে তার যেমন কৌতূহল আছে তেমনি এছাড়া তার আর অন্য কিছু করারও নেই। এই প্রসন্নতাকে ভান বলে আমার মনে হল কারণ সে সম্ভবত আমাকে ভয় দেখাতে চাইছিল না। আমি কিছুই বুঝলাম না, কিন্তু এটা ভেবেই খুশি হলাম যে এসবই সে আমার কাছ থেকেই শিখেছে।

পরে প্রায়শই সে ওই একই কথা এমনভাবে বলত যেন তার অর্থ আমরা দুজনেই বুঝি। তার কথায় প্রত্যয়ের ছাপ থাকলেও তার মধ্যে যেন প্রশ্ন নিয়ে হাজির কোনো স্বপ্নালু ছাত্রের ভাব ছিল। যতবারই সে শেষপর্যন্ত যাওয়ার কথা বলত ততবারই আমার

তাকে এক পোড়াকপালে প্রেমিক বলে মনে হত। সেই প্রেমিক সবকিছু কেন তার সঙ্গেই ঘটল তা নিয়ে সব সময় যেন বিষণ্ন অথচ ক্রুদ্ধ অভিযোগ করছে। সে সময় একথা সে প্রায়ই বলত সুলতানের রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে তা জানার পরে সে একথা বলেছিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নক্ষত্রের থেকে ফরিস্তায় বেশি উৎসাহী তা বলার পরেও একথা বলেছিল, বহু ব্যয়ে একটি পাণ্ডুলিপি পড়ার সুযোগ পাওয়ার পর সেই পাণ্ডুলিপি যখন অর্ধেক পড়া হওয়ার আগেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তখনো সে একথা বলেছিল এবং এছাড়াও মসজিদের মালখানায় যেসব বন্ধুদের সঙ্গে সে তখন কেবল অভ্যাসবশে মিশত তাদের ছেড়ে আসার পরে, খুব নিম্নমানের উষ্ণায়ন-ব্যবস্থাসম্পন্ন স্নানঘরে জমে যাওয়ার পরে, ফুলতোলা চাদরের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তার প্রিয় বইগুলোর মাঝে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার পরে, মসজিদ চত্বরে ওজু করতে ব্যস্ত মানুষের নির্বোধ কথোপকথন শোনার পরে, ভেনেসীয়দের হাতে নৌবাহিনীর পরাজয় ঘটেছে জানার পরে, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে এবং এবার তার বিয়ে করে ফেলা উচিত প্রতিবেশীদের এই পরামর্শ ধৈর্য্য ধরে শোনার পরেও সে ওই একই কথা বলত : সে শেষপর্যন্ত যাবে।

এখন আমার ভাবতে অবাক লাগে : আমি শেষ পর্যন্ত যা লিখেছি তা পড়ার পরে, যাবতীয় ঘটনার অথবা আমার কল্পনার যতটা আমি বোঝাতে পেরেছি তার সবটা ধৈর্য্য ধরে অনুসরণ করার পরে কোন্ পাঠক এ কথা বলতে পারবে যে হোজা তার নিজের করা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি?

## ৪

গ্রীষ্মের শেষের দিকে একদিন আমরা খবর পেলাম যে রাজগণক হুসেইন এফেন্দির দেহ ইসতিনইয়ের সৈকতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে হত্যার নির্দেশ অবশেষে পাশার কাছে এসে পৌঁছেছিল, আর রাজগণক নিজেও মুখ বন্ধ রাখতে পারেনি। নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী সাদিক পাশা শীঘ্রই মারা যাবেন একথা সে নিকট-দূরের বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠিয়ে জানাচ্ছিল। ফলে তার গোপন আস্তানাও আর গোপন থাকেনি। অবশেষে সে আনাতোলিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আততায়ীরা তার নৌকাকে ধরে ফেলে ও তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মৃত গণকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই খবর পেতেই তার কাগজপত্র ও বইয়ের আশায় হোজা ছুটে গেল এবং সেসব হস্তগত করার জন্য নিজের যাবতীয় সঞ্চয় উৎকোচ প্রদানে ব্যয়ও করে ফেলল। এক সন্ধ্যাবেলায় হাজার কাগজে পরিপূর্ণ এক বিশাল প্যাঁটরা সে বাড়িতে এনে হাজির করল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র গোগ্রাসে গেলার পর সে রাগতসুরে মন্তব্য করল যে এর থেকে ভালো কিছু করার ক্ষমতা তার নিজেরই ছিল।

নিজের কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে পরিশ্রম করতে লাগল আর আমি তার সাহায্যকারীর ভূমিকায় রইলাম। 'পশুদের আজব ব্যবহার' ও 'আল্লার সৃষ্ট প্রাণীদের সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক বিস্ময়' নামক দুটি নিবন্ধ সে সুলতানের জন্য লিখবে বলে মনস্থ করল। এমপোলিতে আমাদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রশস্ত বাগান ও মাঠে আমি দারুণ সব ঘোড়া, গাধা, খরগোশ, গিরগিটি প্রভৃতি দেখেছিলাম। ওই নিবন্ধগুলোর প্রয়োজনে সেসব জন্তুজানোয়ারের কথা আমি তার কাছে বর্ণনা করতাম। হোজা একসময় মন্তব্য করল যে আমার কল্পনাশক্তি বড় সীমাবদ্ধ। তা শুনে আমাদের লিলিপুকুরে দেখা গোঁফওয়ালা ফরাসি কচ্ছপ, সিসিলীয় টানে কথা বলা নীল রঙের তোতাপাখি, সঙ্গমের পূর্বে মুখোমুখি বসে গা-ঘেঁষাঘেষি করা কাঠবিড়ালী প্রভৃতির কথা আমার মনে পড়ে গেল। পিঁপড়েদের ব্যবহার নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধের পিছনে আমরা অনেক সময় ও ভাবনা ব্যয় করলাম। বিষয়টি সুলতানকে বিস্মিত করলেও কিন্তু সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারলেন না কারণ প্রাসাদের প্রথম দরবার অনবরত ধোয়ামোছা করা হচ্ছিল। পিঁপড়াদের শৃঙ্খলাবদ্ধ, যুক্তিনির্ভর জীবন নিয়ে লেখাকালীনই হোজা মনে মনে বালক সুলতানকে শিক্ষাদানের স্বপ্ন পোষণ করত। এই কাজে দেশজ কালো পিঁপড়ে যথেষ্ট নয় বলে

মনে করে সে আমেরিকার লাল পিঁপড়ের বর্ণনা দিল। আমেরিকা নামক এক সর্পসঙ্কুল দেশের অলস আদিবাসীদের সম্বন্ধে আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলকও বটে এমন একটি বই লেখার ভাবনা এর থেকেই তার মাথায় আসে। ওই আদিবাসীরা তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি কখনোই পাল্টায়নি। সেখানকার এক পশু ও শিকারপ্রেমী বালক রাজাকে স্পেনীয়রা শূলে চড়িয়েছিল কারণ সে বিজ্ঞানের প্রতি কোনোরূপ মনোযোগ দিতে চায়নি। এই ঘটনার কথা সে ওই বইতে লিখবে বলে ভেবেছিল। ঘটনাটি খুঁটিনাটিসহ আমাকে বর্ণনা করলেও শেষ পর্যন্ত বইটি সম্পূর্ণ করার সাহস তার হয়নি বলেই আমার মনে হয়। একজন শিল্পীকে আমরা ডানাওলা মোষ, দু-ঠ্যাঙা ষাঁড়, দুমুখো সাপ প্রভৃতির ক্ষুদ্রাকৃতি, প্রাণবন্ত ছবি আঁকার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু তার কাজ আমাদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। 'প্রাচীনকালে বাস্তব এরকম একঢালা হয়ে থাকতে পারে,' হোজা বলল, 'কিন্তু এখন সবকিছুই ত্রিমাত্রিক, বাস্তবেরও ছায়া পড়ে তা কি দেখতে পাও না, এমনকি সবচেয়ে সাধারণ পিঁপড়েটাও তার ছায়াকে যমজ সহোদরের মতো সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সুলতানের কাছ থেকে ডাক এল না। লেখাগুলো তার তরফে সুলতানের কাছে পেশ করার জন্য হোজা পাশাকে অনুরোধ করবে বলে ঠিক করল, কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্তের জন্য সে অনুতাপ করেছিল। পাশা তাকে বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেন—জ্যোতিষ তার মতে ভণ্ডামি, রাজগণক হুসেইন এফেন্দি রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলেন এবং তার সন্দেহ যে সেই শূন্যপদের দিকে এখন হোজার দৃষ্টি পড়েছে, বিজ্ঞান নামক ব্যাপারটিতে তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন কিন্তু তা নক্ষত্রের বদলে অস্ত্রের ক্ষেত্রে কাজে লাগলেই বেশি ভালো হয়, রাজগণকের পদটা যে অশুভ তাও তার কাছে খুব পরিষ্কার কারণ ওই পদ যারাই অলঙ্কৃত করেছে তারাই আগে অথবা পরে খুন হয়েছে অথবা এমনকি পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, তাই তার প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন হোজা ওই পদে বসুক তা তিনি মোটেই চান না, যে কোনোভাবেই হোক না কেন বোকা ও সরল সিটকি এফেন্দিই ওই পদে বসবে এবং সে-ই ওই পদের যোগ্য। হোজা প্রাক্তন গণকের বইপত্র হস্তগত করেছে তা তিনি শুনেছেন, কিন্তু ও নিয়ে সে নিজে যেন আর বেশি মাথা না ঘামায়। হোজা উত্তরে বলেছিল যে সে নিজেকে কেবল বিজ্ঞানের সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখতে চায় এবং সুলতানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিবন্ধ দুটি পাশাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফেরার পরে সে আমাকে বলল যে সে নিজেকে কেবল বিজ্ঞানের সঙ্গেই জড়িয়ে রাখতে চায়, তথাপি বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় কোনোকিছু করতেই সে পিছপা হবে না। নিজের বক্তব্যের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে সে পাশাকে অভিশাপ দিতে শুরু করল।

আমাদের কল্পনার রঙিন জীবজন্তু দেখে বালকটির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তাই আন্দাজ করতে করতে আমাদের পরের মাস কেটে গেল। প্রাসাদ থেকে এখনো তার ডাক এল না কেন তা নিয়ে হোজা চিন্তিত ছিল। অবশেষে আমাদের শিকারে আমন্ত্রণ জানানো হল, আমরা কাগিথানে নদীর পাড়ে অবস্থিত মিরাথের প্রাসাদে উপস্থিত হলাম। হোজার স্থান হল সুলতানের পাশে আর আমাকে শিকারখেলা দেখতে হল দূর থেকে। অগুনতি মানুষের সমাগম হয়েছিল। শিকারের আয়োজন ভালোই হয়েছিল। অনেক খরগোশ ও শিয়াল ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শিকারী কুকুরদেরও প্রস্তুত

রাখা হয়েছিল। আমাদের সকলের দৃষ্টিই একটি খরগোশের পিছু নিল। সে তার দলের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। প্রাণপণ সাঁতার কেটে অপর পাড়ে পৌঁছতেই শিকারীরা আরও অনেক শিকারী কুকুরকে সেখানেও ছেড়ে দিতে উদ্যত হল। কিন্তু সুলতান অনুমতি দিলেন না, অনেক দূর থেকেও আমরা তা শুনতে পেলাম। তিনি আদেশ দিলেন, 'খরগোশটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক।' ওদিকে খরগোশটি ওপার থেকে আবার জলে ঝাঁপ দিতেই একটি জংলী কুকুর তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলল। শিকারীরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল, কুকুরটির কবল থেকে তাকে মুক্ত করে সুলতানের সামনে এনে হাজির করল। তিনি তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন, কোনো গুরুতর আঘাত নেই দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং খরগোশটিকে কোনো পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর হোজা ও লালচুলো বামনসহ একটি দল সুলতানকে ঘিরে ভিড় জমাল।

সেই সন্ধ্যাবেলা হোজা আমাকে জানাল আসলে কী ঘটেছিল—ঘটনাটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত তা সুলতান জানতে চেয়েছিলেন। সবার বলা হয়ে যাওয়ার পরে যখন হোজার সুযোগ এল তখন সে ঘটনাটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলল যে সুলতান সর্বাধিক অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত ক্ষেত্র থেকেই শত্রুতার মুখোমুখি হবেন, তবে সেই বিপদ থেকে তিনি অক্ষত অবস্থাতেই রক্ষা পাবেন। সুলতানের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয়েছে ও এমনকি খরগোশের সঙ্গে তুলনা করার ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে এই যুক্তিতে নবনিযুক্ত রাজগণক সিটকি এফেন্দিসহ হোজার সব প্রতিদ্বন্দ্বীরাই তার ব্যাখ্যার সমালোচনায় মুখর হল কিন্তু সুলতান তাদের সবাইকে থামিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তার কাছে হোজার ব্যাখ্যা তার নিজের কর্ণালঙ্কারের মতো প্রিয় বলেই মনে করেন। পরে, শ্যেনযূথের বিরুদ্ধে একাকী ঈগলের প্রাণপণ লড়াইয়ের দৃশ্য বা হিংস্র শিকারী কুকুরদের আক্রমণে একটি শিয়ালের করুণ মৃত্যু দেখতে দেখতে সুলতান হোজাকে জানালেন যে সিংহীটি তার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেকই একটি মদ্দা ও একটি মাদী বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। তিনি আমাকে আরও জানালেন যে হোজার পশুকথামালাও তার পছন্দ হয়েছে এবং নীল ডানাওয়ালা ষাঁড় ও নীলনদ তীরবর্তীস্থানে বসবাসকারী গোলাপী বিড়াল সম্বন্ধে তিনি বিশদে জানতে চাইলেন। সাফল্য ও আতঙ্কের এক অদ্ভুত মিশ্রণ হোজাকে উত্তেজিত করে তুলল।

বহু পরে আমরা প্রাসাদের কুকীর্তির কথা জানতে পেরেছিলাম—সুলতানের নানি কোসেম সুলতানা রক্ষীদের সঙ্গে যোগসাজসে সুলতান ও তার মাকে হত্যা করে তার জায়গায় যুবরাজ সুলেমানকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। মুখ ও নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কোসেম সুলতানাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মসজিদের মালখানার নির্বোধগুলোর গালগল্প থেকেই হোজা এ সম্বন্ধে জানতে পারে। সে তখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতে যেত, কিন্তু তাছাড়া বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোত না।

শরৎকালে কয়েকদিন সে তার মহাবিশ্বের তত্ত্ব নিয়ে আবার কাজ শুরু করবে বলে ভাবল কিন্তু শীঘ্রই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল—তার একটা মানমন্দির প্রয়োজন ছিল, আর তার থেকেও বড় কথা ছিল এই যে এখানকার নির্বোধরা নক্ষত্র নিয়ে ততটুকুই ভাবত যতটুকু নক্ষত্ররা তাদের নিয়ে ভাবিত।

ইতিমধ্যে শীত এসে গেল, আকাশে কালো মেঘ ভারী হয়ে ঝুলতে থাকল। এসময় একদিন আমরা জানতে পারলাম যে পাশাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। তাকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, কিন্তু সুলতানের মা মত দিলেন না। তাকে এরজিনজানে নির্বাসিত করা হল ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। তার মৃত্যুর আগে তার সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই শুনিনি। হোজা জানিয়ে দিল যে সে আর কাউকে ভয় করে না এবং কারোর কাছেই তার আর কোনো ঋণ নেই—আমার কাছ থেকে কিছু যদি সে শিখে থাকে তবে একথা বলার সময় তা সে বিবেচনায় রেখেছিল কি না তা অবশ্য আমি জানি না। সে দাবি করতে লাগল যে বালক বা তার মা কাউকেই সে আর ভয় পায় না। মৃত্যু ও গৌরবের সঙ্গে পাশা খেলার জন্য প্রস্তুতি তার সম্পূর্ণ হয়েছে বলে সে মনে করতে লাগল, কিন্তু ঘরের মধ্যে বইয়ের মাঝে মেষবৎ শান্ত হয়েই আমাদের দিন কাটতে লাগল। আমেরিকার লাল পিঁপড়ে নিয়ে আমাদের আলোচনা জারি রইল এবং ওই বিষয়ে একটি নতুন নিবন্ধ লেখার স্বপ্ন আমরা মনের মধ্যে লালন করতে লাগলাম।

বিগত ও আগামী বহু শীতকালের মতোই সেই শীতও আমরা বাড়িতে কাটিয়ে দিলাম। কোনোকিছুই ঘটল না। শীতের রাতগুলোতে উত্তুরে বাতাস যখন চিমনী উপড়ে দিত তখন নীচতলায় দরজার পিছনে বসে আমরা ভোর পর্যন্ত কথা বলতাম। সে আমাকে আর নীচু নজরে দেখত না বা দেখার ভানও করত না। প্রাসাদ বা প্রাসাদকে ঘিরে গড়ে ওঠা বৃত্ত কোথাও থেকেই সাড়া না পাওয়ার কারণেই তার আমার প্রতি এই সৌভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত হয়েছে বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। কখনো কখনো আমার এমনো মনে হত যে আমাদের দুজনের অস্বাভাবিক সাদৃশ্য সম্বন্ধে সেও আমার মতোই সজাগ হয়ে উঠেছে এবং আমার দিকে চাইলে সে যেন এখন নিজেকেই দেখতে পায়। সে কী ভাবছে তাই নিয়ে আমার চিন্তা হত। পশুবিষয়ক আরও একটি দীর্ঘ নিবন্ধ আমরা শেষ করে ফেলেছিলাম, কিন্তু পাশার নির্বাসনের পর থেকে তা টেবিলের উপরেই পড়ে ছিল। প্রাসাদে যাদের যাতায়াত ছিল তাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে থাকতে হোজা রাজি ছিল না। কোনো ঘটনা ছাড়াই অলসভাবে দিন কাটতে লাগল। মাঝে মাঝেই আমি নিবন্ধের পাতা উল্টে আমার আঁকা বেগুনি ফড়িং ও উড়ুক্কু মাছের ছবি দেখতাম আর পড়বার সময়ে এগুলো দেখে সুলতান কী ভাববেন তাই চিন্তা করতাম।

অবশেষে বসন্ত সমাগমে হোজার ডাক পড়ল। বালক সুলতান তাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। হোজার কথানুযায়ী সুলতানের প্রত্যেক ভঙ্গিমা ও শব্দ থেকেই নাকি এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হোজার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু দরবারী নির্বোধগুলোর বাধাতেই তাকে ডেকে উঠতে পারছিলেন না। সুলতান তার নানির বিশ্বাসঘাতকতার কথা শোনালেন এবং সেই সূত্রে একথাও স্বীকার করলেন যে হোজা কেবল সেই বিপদেরই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তাই নয়, সুলতান যে অক্ষত দেহে বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন তাও আগাম বলেছিল। সেই রাতে প্রাসাদে আততায়ীদের চিৎকার শোনার পর সুলতান বিন্দুমাত্র ভয় পাননি কারণ তার মনে ছিল যে হিংস্র কুকুরটি খরগোশটিকে নিজের চোয়ালের মধ্যে পেয়েও তার কোনো ক্ষতি করেনি। এসব প্রশংসাসূচক শব্দাবলীর পরে সুলতান হোজাকে একটি যথাযোগ্য ভূখণ্ড প্রদানের

নির্দেশ দিলেন। সেই ভূখণ্ড থেকে অর্জিত উপার্জন হোজা ভোগ করবে। তবে সেদিন জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার আগেই তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে গ্রীষ্মের শেষের দিকে সে ভূখণ্ড প্রাপ্তির আশা করতে পারে।

জমি থেকে প্রত্যাশিত উপার্জনের উপর ভরসা করে হোজা বাগানে একটি ছোট মানমন্দির বানাবার পরিকল্পনা করে ফেলল। ভিত কতটা গভীর করে খোঁড়া হবে এবং তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মূল্য কতটা হতে পারে তাও সে হিসাব করে ফেলল, কিন্তু শীঘ্রই তার উৎসাহ হারিয়ে গেল। এই সময় পুরনো বইয়ের বাজারে সে একটি পাণ্ডুলিপির অপটু প্রতিলিপি খুঁজে পায়। সেই প্রতিলিপিতে তাকিউদ্দীনের পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ ছিল। পর্যবেক্ষণ কতটা নিখুঁত তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সে দুমাস কাটিয়ে দিল। কিন্তু তারপর হঠাৎই একদিন বিরক্তির চোটে সব ছেড়ে দিল। পুঁথিতে সে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু তার কারণ তার নিজের নিম্নমানের যন্ত্রপাতি নাকি তাকিউদ্দীনের নিজের ভুল না প্রতিলিপিকারের বেখেয়াল তা সে ধরতে পারল না। বইটির কোনো এক প্রাক্তন মালিক একগাদা কবিতা লিখে ত্রিকোণমিতির সারণীগুলো ভরিয়ে রেখেছিল আর সেটাই তাকে আরও বেশি বিরক্ত করে তুলল। বিভিন্ন অক্ষরের সাংখ্যামান ও অন্য আরও কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই প্রাক্তন মালিক সেসব কবিতায় দুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার বিনম্র ধারণা পেশ করেছিল চারটি কন্যাসন্তানের পরে অবশেষে তার একটি পুত্রসন্ত্রান জন্মাবে, এক মহামারীর প্রাদুর্ভাবে নিরপরাধ ও দোষীদের পৃথক করে চিহ্নিত করা যাবে এবং তার প্রতিবেশী বাহেউদ্দীন এফেন্দি মারা যাবে। প্রাথমিকভাবে এমৎ ভবিষ্যদ্বাণীতে হোজা আমোদ বোধ করলেও ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়ল। এই সময়ে হোজা এক অদ্ভুত বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন সে এমন কোনো প্যাঁটরা বা দেরাজ নিয়ে কথা বলছে যার ঢাকনাটা খুললেই ভিতরটা দৃশ্যমান হবে।

গ্রীষ্মের শেষে সুলতানের প্রতিশ্রুত দান পাওয়া গেল না, এমনকি শীতের আগমনেও তা অধরা থেকে গেল। পরের বসন্তে হোজাকে জানানো হল যে একটি নতুন দলির তৈরি হচ্ছে, ফলত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। আয়নায় চিড় ধরার অর্থ কি, ইয়ামি দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রে সবুজাভ বজ্রপাত কী ইঙ্গিত বহন করে বা রক্তলাল স্ফঠিক নির্মিত পানপাত্র আপনা থেকেই ফেটে চৌচির হয়ে গেল কেন প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিতে এবং আমাদের অন্তিম নিবন্ধে উল্লেখিত প্রাণীকুল সম্বন্ধে সুলতানের অনুসন্ধিৎসার জবাব দিতে হোজাকে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার প্রাসাদে যেতে হয়েছিল, যদিও তা নিয়মিত ছিল না। বাড়ি ফিরে সে বলত যে সুলতান এখন বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করছেন এবং মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করার এটাই হল সর্বোত্তম সময়। ওই বালকটিকে সে হাতের মুঠোয় রাখবে।

এই লক্ষ্য মাথায় রেখে সে একটি সম্পূর্ণ নতুন বই লেখার কাজে হাত দিল। আজটেকদের পতন ও করটেজের স্মৃতিকথা সম্বন্ধে সে আমার কাছে শুনেছিল আর সেই অসহায় বালক রাজা যাকে বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার অপরাধে শূলে চড়ানো হয়েছিল তার কথা তো সে আগে থেকেই জানত। সে প্রায়শই নীতিহীন মন্দ

ব্যক্তিদের কথা বলত যারা যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে নিজেদের প্রবঞ্চনামূলক গল্পকে ব্যবহার করে সম্মানীয় নিদ্রিত ব্যক্তিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বশীভূত করত। তবে বন্ধ দরজার ওপারে বসে লেখা সবকিছুই সে দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সে প্রাথমিকভাবে আশা করেছিল যে আমি উৎসাহ দেখাব। কিন্তু দেশে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তখন আমার মনে এমন এক অভূতপূর্ব অবসাদ তৈরি করেছিল যার ফলে হোজার প্রতি আমার ঘৃণাও উপর্যুপরি বাড়ছিল। আমি কৌতূহল দমন করে রাখলাম, এমন ভান করলাম যেন তার সস্তা, ধূলিধুসরিত, পলকা বাঁধাইয়ের ওই বইগুলো সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহই নেই। আমারই শিক্ষায় জারিত বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তগুলো সে গ্রহণ করেছিল তাদেরকে আমি অবজ্ঞা করতে লাগলাম। দিন যত গড়াতে লাগল তত সে বিশ্বাস হারাতে লাগল, প্রথমে নিজের উপরে এবং তারপরে তার লেখ্য বিষয় সম্বন্ধে। আমি কেবল প্রতিহিংসামূলক আনন্দ সহকারে তাকে লক্ষ্য করতাম।

উপরের ছোট্ট ঘরটিকে হোজা তার নিজস্ব পড়ার ঘর বানিয়ে নিয়েছিল। ওই ঘরে উঠে গিয়ে আমার বানানো টেবিলে বসে সে ভাবত, কিন্তু আমার ধারণা যে সে কিছুই লিখত না। আমি জানতাম সে লিখতে পারবে না, আমি জানতাম যে তার ভাবনাগুলো সম্পর্কে আমার মতামত আগেভাগে জানতে না পারলে সে কোনোকিছু লেখার সাহসই করে উঠতে পারবে না। আমার ভাবনা জানাটা কিন্তু তার প্রকৃত চাহিদা ছিল না, আমার ভাবনা তার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিত বলে সে তো আমার ভাবনার প্রতি ঘৃণা পোষণ করার ভান করত। যে 'অন্যরা' আমাকে যাবতীয় বিজ্ঞান শিখিয়েছেন, আমার মাথার প্রকোষ্ঠে জ্ঞান ভরে দিয়েছেন তাদের ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই ছিল তার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। তার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে তারা কী ভাবত? আমাকে এই প্রশ্নটা করার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠত, কিন্তু তা বলে উঠতে পারত না। কতদিন আমি এই অপেক্ষায় থেকেছি যে সে আত্মশ্লাঘাকে গলাধঃকরণ করে আমাকে এই প্রশ্ন করার সাহস অর্জন করতে পারবে, কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করেনি। বই লেখার প্রকল্পটিকে সে শীঘ্রই পরিত্যাগ করল। লেখার কাজ সে শেষ করেছিল কি করেনি তাও আমি বলতে পারব না, তবে 'নির্বোধ'দের সম্পর্কে সে তার পুরনো বক্তব্য আবার আওড়াতে শুরু করল সে বিশ্বাস করত যে নির্বোধদের ত্রুটির কারণ বিশ্লেষণ করাই হল অনুশীলনযোগ্য বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ, কিন্তু তার এই বিশ্বাস সে পরিত্যাগ করবে; তাদের মাথার ভেতরটা অমন কেন তা জানার ইচ্ছা ও তা নিয়ে ভাবনা দুইই সে পরিত্যাগ করবে! প্রাসাদ থেকে যে অনুগ্রহ সে প্রত্যাশা করেছিল তা না মেলায় হতাশা তাকে গ্রাস করছিল এবং আমার বিশ্বাস সে হতাশা থেকেই তার মনে ওসব গভীর ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। সময় বৃথাই কেটে যেতে লাগল, সুলতানের বয়ঃসন্ধি বিশেষ কাজে এল না।

অবশেষে পরবর্তী গ্রীষ্মে কোপরুলু মেহ্‌মেত পাশা মহামাত্য হওয়ার আগেই হোজার নামে অনুদান মঞ্জুর হল, তার নিজের পছন্দ করার উপায় থাকলে সে হয়তো এই অনুদানটিই বেছে নিত। গেবজের নিকটবর্তী দুটি কল ও সেখান থেকে ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে অবস্থিত দুটি গ্রাম তাকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হল। ফসল ওঠার সময়ে আমরা গেবজে গেলাম এবং আমাদের পুরনো বাড়িটি খালি থাকায়

সেটিই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওই বাড়িতে কাটানো দিনগুলোর কথা হোজা ভুলেই গিয়েছিল, ছুতোরের কাছ থেকে নিয়ে আসা টেবিলটির দিকে সেই সময়ে সে ঘৃণাভরে তাকিয়ে থাকত। বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিও যেন জরাগ্রস্ত ও কুৎসিত হয়ে পড়ছিল। ঘটনা যাই হোক না কেন, তার মধ্যে তখন এমন একটা অধৈর্য্যভাব ভর করেছিল যে অতীতের কোনোকিছুর দিকেই নজর দেওয়ার অবসর তার ছিল না। বেশ কয়েক দফা সে গ্রাম দুটিকে সরেজমিনে ঘুরে দেখে এল এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোর উপার্জন হিসেব কষে বার করল। মসজিদের মালখানার বন্ধুদের মুখে তারহুনজু আহ্মেত পাশার নাম শুনে তার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হল যে সে ঘোষণা করে বসল যে হিসাবের খাতা বজায় রাখার জন্য সে একটি সরলতর ও সহজবোধ্য উপায় আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারের মৌলিকতা ও উপযোগিতায় তার নিজেরই বিশ্বাস ছিল না, ফলে এই আবিষ্কার তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল না।

প্রাচীন বাড়িটির পিছনের বাগানে বসে আকাশপানে চেয়ে চেয়ে কাটানো ব্যর্থ রাতগুলো তার মনে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি ভালবাসা আবার জাগিয়ে তুলল। আমি কিছুদিন তাকে উৎসাহ দিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে সে তার তত্ত্বগুলোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু পর্যবেক্ষণ বা মস্তিষ্ক সঞ্চালনে তার আগ্রহ ছিল না। তার পরিবর্তে গেবজে শহর ও নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে যত বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ ছিল তাদের সবাইকে সে তার বাড়িতে সর্বোচ্চমানের বিজ্ঞান শেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাল। আমাকে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে নমুনাটি সে আনিয়ে নিয়েছিল। তার ঘণ্টা মেরামত করে ও তাতে তেল দিয়ে এক সন্ধ্যাবেলা পিছনের বাগানে সে সেটি সেই তরুণদের সামনে উপস্থাপিত করল। বহু বছর আগে পাশা ও সুলতানকে যেভাবে সে আকাশ সম্বন্ধে তার তত্ত্ব বুঝিয়েছিল সেভাবেই কোনোপ্রকার বর্জন বা ভুলচুক ছাড়াই ওই একই তত্ত্ব তাদের সামনে আবার সে আওড়ে গেল। কোথা থেকে সে এত উৎসাহ ও উদ্যম পেল তা আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু তার বক্তব্য শেষে মাঝরাতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটি যুবকও কোনো প্রশ্ন করল না। কিন্তু পরের দিন সকালে আমাদের দরজার সামনে একটি ভেড়ার হৃদপিণ্ড পড়ে থাকতে দেখা গেল। তখনও উষ্ণ সেই হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরছিল ও তাতে কিছু তুকতাক করা হয়েছিল। অবশেষে এই ঘটনাই যুবকবৃন্দ ও জ্যোতির্বিদ্যা উভয়ের প্রতিই তার যাবতীয় আশা-ভরসা নষ্ট করে দিল।

কিন্তু এই আশাভঙ্গের চোটে মন খারাপ করে সে পড়ে রইল না। ওই যুবকরা পৃথিবী ও নক্ষত্রের ঘূর্ণন বোঝার মানুষ নয়, আর এই মুহূর্তে তাদের বোঝাটা খুব একটা জরুরীও নয়। তবে যার এটা বোঝা একান্তই প্রয়োজন ছিল তিনি বয়ঃসন্ধির সীমা পেরিয়ে যেতে বসেছেন এবং আমাদের অনুপস্থিতির কালে হয়তো আমাদেরকে খুঁজেও থাকবেন। কিন্তু ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে সামান্য উপার্জনের মোহে এখানে পড়ে থেকে আমরা সেই সুযোগ হারাচ্ছিলাম। তাই আমরা দ্রুত কাজকর্ম গুছিয়ে নিলাম, এখানকার উজ্জ্বল তরুণদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক বুদ্ধিদীপ্তটিকে বেছে নিয়ে তাকে দেখভালের কাজে নিযুক্ত করে আমরা ইস্তাম্বুলে ফিরত চলে এলাম।

পরবর্তী তিনটি বছর ছিল নিকৃষ্টতম। প্রতিটি দিন ছিল আগের দিনের প্রতিলিপি, প্রতিটি মাস ছিল তার আগের মাসের পুনরাবৃত্তি, প্রতিটি ঋতুই ছিল পূর্বে যাপিত

কোনো ঋতুর বিরক্তিকর ও পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তি। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আমরা যেন বিপন্ন ও যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে একই ঘটনার পুনরাভিনয় দেখতে দেখতে অনামা কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কায় অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছি। প্রাসাদে তখনো মাঝে মাঝেই হোজার ডাক পড়ত, সেখানে তার কাছ থেকে অনাপত্তিজনক ব্যাখ্যাই আশা করা হত। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে মসজিদের মালখানায় বিজ্ঞানপ্রেমী বন্ধুদের সঙ্গে সে তখনো মিলিত হত, সকালবেলায় ছাত্রদের সে তখনো পড়াতে যেত ও পেটাত, পূর্বাপেক্ষা অনিয়মিত হলেও বাড়িতে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে লোকে হাজির হত, তাদের তখনও সে প্রতিহত করলেও তার প্রতিরোধে আগের সেই প্রত্যয়ীভাব আর ছিল না, যে গান তার আর শুনতে ভালো লাগত না বলে সে নিজেই স্বীকার করত সেই গানই ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করার সময় সে তখনও শুনতে বাধ্য হত, নির্বোধদের প্রতি ঘৃণায় মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে তার তখনো মনে হত, তখনো সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চতুর্দিকে ছড়ানো অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের পাতা বিরক্তিসহকারে ওল্টাতে থাকত এবং ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেই যেত।

কোপরুলু মেহমত পাশার জয়গাথা সে মসজিদের মালখানার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছিল। এই বিজয়সংবাদ তার দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নৌবহরের হাতে ভেনেসীয়রা পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে, তেনেদোস ও লিমনোসের দ্বীপগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বিদ্রোহী আবাজা হাসান পাশাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রভৃতি খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এও বলতে ভুলত না যে এসব সাফল্যই হল ক্ষণস্থায়ী, তার ধারণা ছিল যে এসবই হল উদ্বায়ী সাফল্যের অন্তিম চরণ এবং মূর্খতা ও অযোগ্যতার পাকে অক্ষমের এই ছলনার খেলা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। তার কথা শুনে মনে হত যে সে যেন এমন কোনো বিপর্যয়ের অপেক্ষায় আছে যা বর্তমান দিনগুলোর একঘেয়েমি দূর করে দেবে। কিন্তু ওই একঘেয়ে দিনগুলোই বারবার ফিরে ফিরে আসায় আমরা অধিকমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। পরিস্থিতি আরও করুণ হয়ে উঠল কারণ 'বিজ্ঞান' বলে যাকে সে অত্যন্ত একগুঁয়েভাবে অভিহিত করত তার প্রতি মনোনিবেশ করার মতো ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে নিজের চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোরও কোনো সুযোগ তার ছিল না  কোনো নতুন ভাবনার প্রতি তার আগ্রহ এক সপ্তাহের বেশি টিঁকত না, শীঘ্রই তার নির্বোধদের কথা মনে পড়ে যেত এবং তখন সে বাকি সবকিছু ভুলে যেত। তাদের জন্য এতদিন পর্যন্ত যত চিন্তাশক্তি সে ব্যয় করেছে তা কি যথেষ্ট ছিল না? তাদের পিছনে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলার কি কোনো যুক্তি ছিল? এত রেগে যাওয়ারও কি কোনো যৌক্তিকতা ছিল? সে তখন সদ্য নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শিখেছিল এবং সম্ভবত সেই কারণেই বিজ্ঞান নিয়ে আনুপূর্বিক অনুসন্ধান চালাবার মতো শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই সে জোগাড় করে উঠতে পারেনি। তবে সে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথম দর্শনেই তাকে আপাদমস্তক হতাশার প্রতিমূর্তি বলে মনে হত। কোনো বিষয়ে দীর্ঘ মনোনিবেশ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার দরুণ তার সময় কাটত না। বখাটে বা হাবাগোবা শিশুর মতো এঘর থেকে ওঘর, সিঁড়ি বেয়ে একতলা থেকে দোতলা, এ জানালা থেকে ও জানালা এই করে সে সময় কাটাত। এই অন্তহীন,

দিশাহীন পাগলপারা ছোটাছুটির ফলে কাঠের বাড়ির মেঝে থেকে গোঙানির আওয়াজ উঠত। আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে চাইত যে আমি তাকে কোনো চুট্‌কি, কোনো নতুন মৌলিক ভাবনা বা উৎসাহবর্ধক কিছু বলি। কিন্তু আমার অসহায়তা যতই সীমাহীন হোক না কেন, তার প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণার তীব্রতা তো বিন্দুমাত্র কম ছিল না, ফলে আমি সাড়াশব্দ করতাম না। এমনকি আমার মুখ থেকে একটা কিছু বার করার জন্য সে যখন নিজের গর্বকে দমিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথায় বিনীত ভঙ্গিতে আমার অবাধ্যতার মুখোমুখি হত তখনো আমি তাকে তার মনমতো কথা শোনাতাম না। যখন সে প্রাসাদের এমন কোনো খবর দিত যাকে আমাদের পক্ষে সুখকর বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অথবা তার মাথায় এমন কোনো নতুন ধারণা খেলে যেত যার পিছনে লেগে থাকলে স্বর্ণমুদ্রায় তার মূল্য নিরূপিত হতে পারে তখনো আমি হয় তার কথা না শোনার ভান করতাম নতুবা সবচেয়ে নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরে তার উৎসাহে জল ঢেলে দিতাম। নিজের মানসিক দীনতায় সে ছটফট করছে এই দৃশ্যটা আমি উপভোগ করতাম।

কিন্তু পরে এই শূন্যতার মাঝেই সে তার প্রয়োজনীয় নতুন ভাবনার সন্ধান পেয়েছিল। তার নিজের একাকিত্বই হয়তো এই সন্ধান পেতে তাকে সাহায্য করেছিল, আবার এমনও হতে পারে যে তার তৎকালীন অশান্ত মন কিছুতেই প্রবল ধৈর্যহীনতা থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। ঘটনাটি যখন ঘটল তখন আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, আমি তাকে উৎসাহিতও করতে চেয়েছিলাম। আমার নিজেরও উৎসাহ জেগেছিল কারণ সে সময় আমি সম্ভবত এমনও ভেবেছিলাম যে সে আমার জন্য চিন্তা করে। এক সন্ধ্যাবেলা হোজার পদশব্দ বাড়ির অন্যত্র থেকে আমার ঘরে এসে হাজির হল এবং অত্যন্ত সাধারণ কোনো প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যেমন তেমন কেন আমি?' প্রশ্ন শুনে আমি তাকে উৎসাহ দিলাম ও উত্তর দিতেও চেষ্টা করলাম। আমি বললাম যে সে যেমন কেন সে তেমন তা আমি জানি না, তবে এও জানাতে ভুললাম না যে এই প্রশ্ন প্রায়শই 'তাদের'ও থাকত ও প্রতিদিনই তারা আরও বেশি বেশি করে জিজ্ঞেস করত। একথা বলার সময় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করার মতো কিছু আমার হাতে ছিল না, বিশেষ কোনো তত্ত্বের কথাও ভাবিনি, কেবল তার প্রত্যাশামতো উত্তর দেওয়ার একটা বাসনা ছিল। আমি আন্দাজ করেছিলাম যে সে সম্ভবত খেলাটাকে উপভোগ করবে। সে বিস্মিত হল, কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল, আমার কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চাইল, আমি যখন চুপ করে গেলাম তখন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, আমার বলা কথাই সে আবার আমার কাছ থেকে জানতে চাইল   তারা তবে এই প্রশ্ন করছে? আমার মুখে সম্মতিসূচক হাসি দেখে সে তৎক্ষণাৎ রেগে গেল। এই প্রশ্ন করার সময় সে ভাবেনি যে 'তাদের' মনেও এই একই প্রশ্ন আছে, তাদের জিজ্ঞাসার কথা না জেনে সে নিজের থেকেই এই প্রশ্ন করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মাথা ব্যথা কিছু কম ছিল না। তারপর এক অদ্ভুত সুরে সে বলল, 'একটি কণ্ঠস্বর আমার কানে যেন গুনগুন করছিল।' সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর তাকে তার প্রিয় আব্বার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, তিনি মারা যাওয়ার আগেও এরকমই একটি কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সেই গান ছিল অন্যরকম। 'সেই কণ্ঠস্বর একই পংক্তি বারবার গুনগুন করতে

থাকে,' একথা বলে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করায় সে হঠাৎই আবার বলে উঠল, 'আমি যা আমি তাই, আমি যা আমি তাই, আহ্!'

আমি প্রায় সশব্দে হেসে ফেলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। এটা যদি কোনো নির্ভেজাল রসিকতা হত তবে তারও হাসা উচিত ছিল। সে কিন্তু হাসল না, তবে সে এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে সে প্রায় হাস্যকর হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমাকে গানের অর্থ ও অসম্ভাব্যতা উভয় বিষয়েই সচেতন হওয়ার ভান করতে হল কারণ আমি চাইছিলাম যে সে কথা চালিয়ে যাক। আমি বললাম যে কণ্ঠটিকে গুরুত্বসহকারে নেওয়া উচিত; যে কণ্ঠ সে শুনেছে তা তার নিজের ছাড়া আর কারোর নয়। আমার কথায় সে নিশ্চয় ব্যঙ্গের ছোঁয়া পেয়ে থাকবে, তাই সে রেগে গেল। সে নিজেও তা জানত। কেবল সেই কণ্ঠস্বর কেন তার কানে একই বাক্যবন্ধ বারবার আওড়ে যাচ্ছিল এই প্রশ্নটাই ছিল তার কাছে দুর্জ্ঞেয়!

সে এত রেগে গেছিল যে আমি তাকে আর কিছুই বলার চেষ্টা করলাম না, কিন্তু খোলাখুলি বলতে পারলে আমার বক্তব্য ছিল এরকম : কেবল নিজের অভিজ্ঞতাই নয়, আমার ভাইবোনদের অভিজ্ঞতার সূত্রেও একথা শিখেছি যে স্বার্থপর শিশুরা যে একঘেয়েমির অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় তা তাদের যেমন সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে তেমনি আবার নির্বোধও তৈরি করতে পারে। আমি তাকে বললাম যে ওই কণ্ঠ সে কেন শুনল তা বিবেচনা না করে কী শুনল তাই তার বিচার করা উচিত। তখন আমি হয়ত এমনও ভেবেছিলাম যে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের অভাবে সে এমনকি পাগলও হয়ে যেতে পারে এবং তখন তাকে দেখে আমি নিজের হতাশা ও ভীরুতার চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আবার তখন এমনও ভেবেছি যে এবার হয়তো আমি তাকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করতে পারব, সে যদি এমনটা করে উঠতে পারে তবে আমাদের উভয়ের জীবনেই হয়তো সত্যসত্যই কিছু একটা ঘটতে পারে। 'তাহলে আমার কী করা উচিত?' অবশেষে অত্যন্ত অসহায়ভাবে সে জিজ্ঞেস করল। আমি তাকে বললাম যে আমি উপদেশ দিতে চাই না তবে এটুকু বলতে পারি যে সে যেমন কেন সে তেমন তা নিয়ে তার ভাবা উচিত। এই ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করতে পারব না, যা করার তা তাকে নিজেকেই করতে হবে। 'তাহলে আমার কী করা উচিত, আয়নায় চোখ রাখা?' শ্লেষের সঙ্গে সে বলল বটে কিন্তু তাকে কিছু কম বিমর্ষ দেখাল না। আমি কিছু বললাম না, যাতে সে একটু ভাবার সময় পায়। 'আমার কি আয়নায় চোখ রাখা উচিত?' আবার সে ওই একই প্রশ্ন করল। হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল, আমি উপলব্ধি করলাম যে হোজা নিজের জোরে কোনোদিনই কোনো কিছু অর্জন করতে পারবে না। আমি চাইতাম যে সে সত্যিটা বুঝুক, আমি তাকে মুখের উপর বলেও দিতে চাইতাম যে আমাকে ছাড়া তার ভাবারও ক্ষমতা নেই, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারিনি। আমি তাকে উদাসীনভাবে বললাম এগিয়ে গিয়ে আয়নায় চোখ রাখতে। না, আমার সাহসের অভাব ছিল না, কেবল আর কিছু বলতে আমার ইচ্ছা করছিল না। সে প্রচণ্ড রেগে গেল, বেরিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল এবং তার চিৎকার শোনা গেল : তুমি একটা নির্বোধ।

তিনদিন বাদে আমি যখন বিষয়টা আবার উত্থাপন করলাম এবং দেখলাম যে সে তখনো 'তাদের' নিয়ে কথা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক তখন আমিও খুশি মনে খেলাটা

চালিয়ে গেলাম। ফলস্বরূপ যাই ঘটুক না কেন, আমার আশা ছিল যে তাকে অন্তত কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত রাখা যাবে। আমি বললাম যে আয়নায় 'তারা' অবশ্যই চোখ রাখে এবং এখানকার মানুষের থেকে অনেক বেশিই রাখে। কেবল রাজা মহারাজা বা উচ্চবিত্তদের বাড়িতেই নয়, সাধারণ মানুষের বাড়ির দেওয়ালেও ফ্রেমবন্দী আয়না যত্ন করে টাঙানো থাকে। তবে এক্ষেত্রে তাদের উন্নতি কেবল এই কারণে ঘটেনি, ঘটেছিল কারণ 'তারা' সর্বদা নিজেদের নিয়ে ভাবত। 'কোন্ ক্ষেত্রে?' তার প্রশ্নে আগ্রহ ও সারল্যের উপস্থিতি আমাকে অবাক করে দিল! আমি প্রথমে ভাবলাম যে সে আমার কথা বোধহয় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে নিচ্ছে, কিন্তু তারপর তার মুখে হাসির আভাস দেখা গেল 'তুমি তাহলে এটাই বলতে চাইছ যে তাদের চোখ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আয়নার দিকেই থাকে!' এই প্রথম সে আমার দেশ ও পিছে ফেলে আসা আমার সবকিছুকে ব্যঙ্গ করল। রেগে গিয়ে আমি তাকে আঘাত করার মতো কোনো কথা ভাবতে লাগলাম এবং কোনো ভাবনাচিন্তা না করেই নিজের বক্তব্যের উপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না রেখেই হঠাৎ বলে বসলাম যে সে কে তা সে নিজেই কেবল আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু তদ্রূপ চেষ্টা করার মতো যোগ্য লোক সে নয়। যন্ত্রণায় তার মুখটা ভেঙেচুরে যাচ্ছিল দেখে আমি খুশি হলাম।

কিন্তু এই আনন্দের জন্য আমাকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল। সে আমাকে বিষপ্রয়োগের ভয় দেখিয়েছিল, তবে তার জন্য আমি একথা বলছি না। আমি তাকে তার সাহসের অভাবের কথা বলেছিলাম। কয়েকদিন পরে সে দাবী করল যে আমাকে এবার সাহস প্রদর্শন করে দেখাতে হবে। প্রথমে আমি ব্যাপারটা মজা করে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, এ তো জানা কথাই যে নিজে কে তা বোঝার জন্য আয়নায় চোখ রাখার চেয়ে চিন্তা করাটা কোনো উন্নততর উপায় হতেই পারে না। এ তো রাগের মাথায় আমি তাকে উত্যক্ত করার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। সাহসের প্রমাণ না দিলে সে আমাকে কম খেতে দেবে ও এমনকি ঘরেও আটকে রাখতে পারে বলে ভয় দেখাল। আমি কে তা আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে আমাকে এবং লিখেও ফেলতে হবে, সমগ্র কর্মপদ্ধতিটি সে পর্যবেক্ষণ করবে এবং আমার সাহস কতটা তা সে জরিপ করবে।

## ৫

এমপোলির জমিদারিতে ভাই-বোন, মা-দিদিমা প্রভৃতির সাহচর্যে আমার শৈশব কেটেছিল। প্রথম কয়েক পাতা আমি সেই সুখী শৈশবের কথা লিখে ভরিয়ে ফেললাম। আমি যেমন কেন আমি তেমন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশেষত এই স্মৃতির কথাই আমার মনে এল কেন তা আমার জানা নেই, তবে সেই হারিয়ে যাওয়া জীবনের বিগত সুখের জন্য তৃষ্ণাই সম্ভবত আমাকে প্ররোচিত করে থাকবে। এছাড়া, রাগের বশে বলা কথার জবাবে হোজা আমাকে এমন চেপে ধরেছিল যে পাঠকের কাছে উপভোগ্য খুঁটিনাটিসহ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে এমন লেখার কথাই আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে প্রাথমিকভাবে হোজা আমার লেখা পছন্দ করেনি, তার বক্তব্য ছিল যে যে কেউই এমন লিখতে পারে। তার সাহসের ঘাটতি নিয়ে আমার অভিযোগ ছিল, কিন্তু সে অভিযোগ নিশ্চয় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস নিয়ে নয়, ফলত আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড়িয়ে এই জাতীয় কথা মানুষের মনে আসতে পারে কি না তা নিয়েও তার সন্দেহ ছিল। একবার আল্পসে বাবা ও ভাইদের সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎই এক ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। তার দিকে বহুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার প্রস্তরীভূত হয়ে যাওয়ার কথা লিখেছিলাম। আবার একবার আমাদের চোখের সামনেই আমাদের অতি প্রিয় কোচোয়ান তার নিজেরই ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে গিয়েছিল। তাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখে আমার মনে জাগ্রত অনুভূতিমালার কথাও লিখেছিলাম। উভয় অভিজ্ঞতার কথা পড়েই হোজার প্রতিক্রিয়া ছিল একই : এসব যে কেউ লিখতে পারে।

এর উত্তরে আমি বললাম যে সেখানকার লোকেরা এর থেকে বেশি আর কিছু করে না, আমার রাগ হয়েছিল বলে আগে সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছিলাম এবং আমার কাছ থেকে হোজার আর কিছু আশা করা উচিত হবে না। কিন্তু সে আমার কথায় কান দিল না। ঘরবন্দী হয়ে থাকার ভয়ে আমার মনে ভেসে ওঠা যাবতীয় দৃশ্যকল্প আমি লিখে যেতে লাগলাম। এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিন্তু মনোরম স্মৃতির ঝাঁপি কখনো হৃদয়কে যন্ত্রণা দিত আবার কখনো মনকে উৎফুল্ল করে তুলত, কিন্তু এভাবেই আমি দুমাস কাটিয়ে দিলাম। দাসে পরিণত হওয়ার পূর্বেকার যাবতীয় ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতা আমি কল্পনায় পুনর্জাগ্রত করার চেষ্টা করতাম এবং সেই চেষ্টা যে আমি উপভোগ করছিলাম তাও আমি অবশেষে উপলব্ধি করলাম, আমাকে লেখার জন্য হোজাকে

আর পীড়াপিড়ি করতে হত না, হোজা তৃপ্ত না হলেই আমি আরেকটি স্মৃতির আশ্রয় নিতাম, লেখার জন্য আগে থেকেই ঠিক করে রাখা অন্য কোনো একটি গল্পের ঝাঁপি খুলে বসতাম।

অনেক পরে আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে আমার লেখা হোজাও বেশ উপভোগ করছে তখন তাকেও লেখার কাজে টেনে আনার জন্য আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আমি আমার শৈশবের কিছু অভিজ্ঞতার কথা তাকে শোনাতে লাগলাম। আমি ও আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটি একই সময়ে একই কথা ভাবার অভ্যাস রপ্ত করেছিলাম। সে হঠাৎই মারা যায়। তার মৃত্যুর পরে আমাকেও মৃত বলে গণ্য করা হতে পারে ও তার সঙ্গে আমাকেও জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়া হতে পারে ভেবে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রবল সেই আতঙ্কে এক অন্তহীন বিনিদ্র রাত আমি কেমনভাবে কাটিয়েছিলাম তা তাকে শোনালাম। কিন্তু ওই বর্ণনায় সে যে এতটা প্রভাবিত হবে তা আমি মোটেই আশা করিনি! এরপরও আমার দেখা আরও এক স্বপ্নের কথা হোজাকে সাহস করে বলেছিলাম আমার শরীর আমার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে আমার মতোই দেখতে একটি লোকের সঙ্গে যোগ দিল ও আবছায়ায় মুখঢাকা সেই লোকটির সাথে একযোগে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এই সময়েই হোজা বলতে লাগল যে সে সেই হাস্যকর পংক্তিটা এবার আরও জোরে শুনতে পাচ্ছে। আমি যখন দেখলাম যে আমার প্রত্যাশা মতোই স্বপ্নটি তাকে প্রভাবিত করেছে তখন তাকে আমি বোঝাতে লাগলাম যে এই জাতীয় কিছু তারও লেখা উচিত। লেখা যে তাকে শুধু অনন্ত অনুমানের হাত থেকে নিবৃত্ত করবে তাই নয়, নির্বোধদের থেকে সে প্রকৃতপক্ষে কোথায় কোথায় আলাদা তাও সে বুঝতে পারবে। প্রাসাদে মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো প্রগতি ঘটছিল না। প্রথমে সে আমাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যখন তাকে কিঞ্চিৎ চাপ দিলাম তখন চেষ্টা করে দেখবে এটুকু বলতেও সে অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল ও তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল। তার ভয় ছিল যে তার লেখা হাস্যকর বলে পরিগণিত হবে এবং মজার ছলে আমাকে জিজ্ঞেসও করে বসল আমরা যেমন একসাথে লিখতাম তেমনি আয়নায় নিজেদের দিকেও কি একযোগেই তাকাবো?

সে যখন একত্রে লিখতে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন আমি মোটেই ভাবতে পারিনি যে সে আদতে একসঙ্গে টেবিলে বসতে চায়। আমার ধারণা ছিল যে সে লিখতে শুরু করলে শ্রমবিমুখ দাসের অলস স্বাধীনতা আমি আবার ফিরে পাব। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। সে জানিয়ে দিল যে আমাদের দুজনকে টেবিলের দুই প্রান্তে পরস্পরের মুখোমুখি বসে লিখতে হবে। এসব বিপজ্জনক বিষয়ের মুখোমুখি হলে আমাদের মন নিষ্কৃতির আশায় ভেসে যেতে চাইবে এবং তখন কেবল এভাবেই আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি ও শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি। কিন্ত এগুলো ছিল নিছকই অজুহাত। আমি জানতাম যে সে একা হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে, চিন্তা করার সময় নিজের একাকীত্বের ভয় পাচ্ছে। যখন সে নিজের মুখের সামনে সাদা পাতা ধরে এমনভাবে বিড়বিড় করতে লাগল যাতে তা আমার কানে পৌঁছয় এবং তার লেখা শুরুর আগেই আমি তার লেখ্য বিষয়কে অনুমোদন করি তখন তার ভয়টা আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটি বাক্য লেখার

পরেই সরল নম্রতা ও শিশুসুলভ উৎসাহের সঙ্গে সে তা আমাকে দেখাতে লাগল। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, এসব কি লেখার যোগ্য? আমি যথারীতি আমার অনুমোদন দিতাম।

এভাবে দু'মাসের মধ্যে আমি তার জীবন সম্বন্ধে এতকিছু জেনে ফেললাম যা গত এগারো বছরেও জানতে পারিনি। তার পরিবার এডির্নে শহরে বাস করত, পরে কোনো এক সময়ে আমরা সুলতানের সঙ্গে সেই শহরে গিয়েছিলাম। তার আব্বা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। আব্বার কথা বলতে গেলে যে মুখটা তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠত সেটা আদৌ তার ছিল কি না তা নিয়ে সে নিজেই খুব একটা নিশ্চিত ছিল না। তার আম্মু ছিলেন খুব পরিশ্রমী, আব্বা মারা যাওয়ার পর তিনি আবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম স্বামীর ঔরসে তার দুই সন্তান ছিল, একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। পেশায় ধুনুরি দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা তিনি চারটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তার সন্তানদের মধ্যে হোজাই ছিল পড়াশুনায় সবচেয়ে উৎসাহী। শুধু তাই নয়, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, চালাক, কষ্টসহিষ্ণু ও শক্তিমানও ছিল সে। সততার দিক থেকেও নাকি সেই ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। বোন ছাড়া বাকি সকলের সম্বন্ধেই তার স্মৃতি ছিল ঘৃণাবিজড়িত। তবে লেখার পক্ষে এসব আদৌ যোগ্য কি না তা নিয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু আমি তাকে উৎসাহ দিতাম কারণ ততদিনে আমি সম্ভবত এটা অনুমান করে নিয়েছিলাম যে তার চালচলন ও জীবনকাহিনী আমি পরবর্তীকালে নিজের বলে পেশ করব। তার ভাষা ও ভাবনার গতিপ্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা আমি খুব পছন্দ করতাম ও আয়ত্ত করতে চাইতাম। যে জীবনকে ব্যক্তি নিজের বলে বেছে নিয়েছে তাকে তার যথেষ্ট পরিমাণে ভালবাসা উচিত যাতে জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তাকে সে নিজের জীবন বলে অভিহিত করতে পারে। আমিও তাইই করি। হোজা তার ভাইদের সবাইকেই নির্বোধ বলে মনে করত, তারা খালি অর্থের আশায় তার সন্ধান করত। কিন্তু সে নিজেকে পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। সেলিমিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে সে সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ সে আর কখনো করেনি, তেমনি নারী সম্পর্কেও সে কখনো কথা বলেনি। একদম শুরুতে সে লিখেছিল যে সে একবার বিয়ে প্রায় করেই ফেলেছিল, তারপর রাগের বশে সব ছিঁড়েও ফেলেছিল। সেই রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ওরকম ভয়ংকর রাত পরে আমি আরও অনেক কাটিয়েছি, কিন্তু সেটিই ছিল প্রথম। সে আমাকে অপমান করল, বলল যে সে সব মিথ্যে লিখেছিল এবং আবার নতুন করে শুরু করল। যেহেতু তার লেখার আবশ্যিক শর্ত ছিল আমাকেও তার মুখোমুখি বসে লিখে যেতে হবে তাই দু'দিন আমাকে না ঘুমিয়েই কাটাতে হল। আমি কী লিখছি তা আর সে লক্ষ্যই করল না। নিজের কল্পনাকে বিন্দুমাত্র প্রয়োগ না করে আমি আমার আগেকার লেখাই টেবিলের অপর প্রান্তে বসে নকল করতে লাগলাম ও আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কয়েকদিন পরে, প্রাচ্যদেশ থেকে আমদানি করা দামি, নিখুঁত কাগজের উপর 'আমি যেমন কেন আমি তেমন' এই শিরোনাম লিখে সে শুরু করল। কিন্তু, প্রতি সকালে, ওই শিরোনামের অধীনে 'তারা' কেন এত নিকৃষ্ট ও বোকা তার কারণ ছাড়া

সে আর কিছুই লিখত না। তথাপি আমি জানতে পেরেছিলাম যে তার মায়ের মৃত্যুর পরে তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছিল, উত্তরাধিকার থেকে যেটুকু অর্থ সে বাঁচাতে পেরেছিল তা নিয়েই সে ইস্তাম্বুলে এসে হাজির হয়েছিল। সেখানে কিছুদিনের জন্য সে এক দরবেশের আস্তানায় ঘাঁটি গেড়েছিল, কিন্তু সেই আস্তানার লোকেদের নীচ ও মিথ্যাবাদী বলে চিনতে পারার পরে সে ওই আশ্রয় ছেড়ে দেয়। তাদের সঙ্গ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল, ওই আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারা তার এক বিশাল সাফল্য বলে আমি বিবেচনা করতাম। সেখানে তার অভিজ্ঞতার কথা আমি আরও বেশি করে জানতে চাইলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছার কথা বলতেই সে রেগে গেল, বলল যে আমি কেবল ইতর কথা শুনতে চাই যাতে সেসব তার বিরুদ্ধে কোনোদিন কাজে লাগাতে পারি। ইতিমধ্যে আমি এমনিতেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছিলাম এবং তার ফলে সে সন্দেহ করতে লাগল যে আমি এসব খুঁটিনাটিও জানতে চাইছি—এক্ষণে অশ্লীল বলে বিবেচিত একটি যৌনগন্ধী বাক্য সে ব্যবহার করল। তারপর সে দীর্ঘক্ষণ তার বোন সেমরার কথা বলল, সে কত পবিত্র আর তার স্বামী কত খল ছিল, বোনের সাথে বহু বছর দেখা না হওয়ায় তার কত আক্ষেপ ছিল, কিন্তু আমি উৎসাহ দেখাতেই তার সন্দেহপ্রবণতা আবার জেগে উঠল এবং সে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। তার যা কিছু টাকাপয়সা ছিল তার পুরোটাই সে বইয়ের পিছনে ব্যয় করেছিল, দীর্ঘদিন সে পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোনো কাজই করেনি, পরে বিভিন্ন স্থানে মুন্‌শি হিসেবে কাজ করেছিল—কিন্তু মানুষ এত নির্লজ্জ—তারপর হঠাৎই এরজিনজানে সদ্য মৃত সাদিক পাশার কথা তার মনে পড়ল। পাশার সঙ্গে হোজার তখন সদ্য- আলাপ হয়েছে এবং বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসার কারণে প্রথম পরিচয়েই সে তার চোখে পড়ে যায়, তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজটিও তিনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তিনিও ছিলেন আরেক নির্বোধ। এক মাস দীর্ঘ ছিল সেই লেখার দমক : তারপর একরাতে প্রবল লজ্জায় ওই একমাসের যাবতীয় লেখা সে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। এই কারণে তার এলোমেলো লেখা ও নিজের অভিজ্ঞতাকে কল্পনার সাহায্যে আবার যখন সাজাতে গেলাম, তখন আর আমি বিস্ময়সৃষ্টিকারী খুঁটিনাটির তোড়ে ভেসে যাওয়ার ভয় পাইনি। এরপরও উদ্দীপনার অন্তিম বিস্ফোরণের ঝাপটার চোটে সে 'আমার সুপরিচিত নির্বোধরা' শিরোনামের অধীনে বেশ কয়েক পাতা লিখে ফেলল। কিন্তু তারপরেই সে রাগে ফেটে পড়ল : এই লেখা তাকে কোথাওই পৌঁছতে সাহায্য করেনি, সে নতুন কিছুই শেখেনি, এবং সে যেমন কেন সে তেমন তা সে জানতে পারেনি। আমিই তাকে প্রতারিত করেছি, আমিই তাকে সেসব ভাবিয়েছি যা সে আর মনে করতে চাইত না। তাই সে আমাকে শাস্তি দেবে।

এই শাস্তিদানের ধারণা নিয়ে তার এত মাতামাতি কেন তা আমারও জানা নেই, তবে তা আমাদের একত্র বসবাসের প্রারম্ভিক দিনগুলোর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিল। কখনো কখনো তো আমার এমনও মনে হত যে আমার ভীরু বশ্যতাস্বীকার হয়ত তাকে অধিকতর সাহসী করে তুলেছিল, তথাপি শাস্তির কথা বলার মুহূর্তেই আমিও তার সাথে টক্কর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। হোজা যখন অতীত সম্পর্কে লেখালেখি নিয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল তখন সে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করল।

তারপর সে আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হল এবং বলল যে আমাদের ভাবনাগুলোকেই কেবল লিখে রাখা প্রয়োজন মানুষ যেমন আরশিতে নিজের চেহারা দেখতে পায় তেমনি সে নিজের ভাবনার মধ্যে নিজ সত্তাকে খুঁজে পায়। উপমার সামঞ্জস্য আমাকেও উৎসাহিত করে তুলল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে এসে বসলাম। কিঞ্চিৎ বিদ্রূপমিশ্রিত শোনালেও আমি পাতার উপর লিখলাম 'আমি যেমন কেন আমি তেমন।' আমার ব্যক্তিত্ব অঙ্কনের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবে আমার লাজুক স্বভাবের এক স্মৃতির কথা আমি লিখতে শুরু করলাম। তারপর অন্যদের শঠতা সম্পর্কে হোজা কী লিখছে তা যখন পড়লাম তখন আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেল যা সেই সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছিল। বলেও ফেললাম সেকথা যে নিজের ত্রুটি সম্বন্ধেও হোজার লেখা উচিত। আমার লেখা পড়ার পরে সে জোর দিয়ে বলতে লাগল যে সে ভীতু নয়, কিন্তু আমি পাল্টা যুক্তি দিয়ে বললাম যে অন্য সকলের মতো তারও কিছু নেতিবাচক দিক আছে এবং সেসবের গভীরে প্রবেশ করলে সে নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পাবে। আমি তাইই করেছি, আর তার মধ্যে আমি এই ইচ্ছার উপস্থিতিও টের পেয়েছিলাম যে সে আমার মতোই হতে চায়। একথা বলতে প্রথমে সে রেগে গেল, কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল এবং নিজেকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার অভিপ্রায়ে বলল যে খারাপ হল অন্যরা, যদিও সবাই যে খারাপ নয় তাও নিশ্চিত। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ মানুষই অসম্পূর্ণ ও নেতিবাচক তাই এই দুনিয়ার সবকিছুই খারাপ। এতে আমি দ্বিমত পোষণ করে বললাম যে তার মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যা শুধু শয়তানিরই নয়, জঘন্য ইতরতার পরিচায়কও বটে এবং সেগুলো তার চিহ্নিত করা উচিত। আমি স্পর্ধিতভাবে এও জানিয়ে দিলাম যে সে আমার থেকেও খারাপ।

এভাবেই সেই অবিশ্বাস্য ও ভীতিপ্রদ অশুভ দিনগুলোর সূত্রপাত ঘটেছিল। সে আমাকে চেয়ারের সাথে বেঁধে টেবিলে বসিয়ে দিত এবং আমার মুখোমুখি বসে তার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে লেখার নির্দেশ দিত। কিন্তু তার ইচ্ছাটা যে কী তা সে নিজেই জানত না। তার মাথায় ছিল কেবল এই উপমাটি ব্যক্তি যেমন আরশিতে নিজের বহিরঙ্গের চেহারা দেখতে পায় তেমনি নিজের ভাবনাচিন্তার মধ্যে আপন অন্তর্লোককেও তার দেখতে পাওয়া উচিত। তার ধারণা ছিল যে এই গূঢ়বিদ্যা আমার আয়ত্তাধীন, কিন্তু তার কাছ থেকে আমি তা গোপন করছি। আমাকে দিয়ে সেই গুপ্তবিদ্যা লিখিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে হোজা আমার মুখোমুখি বসে অপেক্ষায় থাকত আর আমি তখন নিজের ত্রুটির অতিরঞ্জিত গল্প লিখে পাতা ভরাতাম। নিজের শৈশবের ছোটখাটো চুরি, ঈর্ষাকাতর মিথ্যে, ভাইবোনদের থেকে নিজেকে প্রিয়তর করে তোলার জন্য খাটানো নানারকম ফন্দিফিকির বা যৌবনের বিভিন্ন যৌন হঠকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে লিখে যেতাম, লেখা এগোনোর সাথে সাথে সত্যও ক্রমশ অতিরঞ্জিত হয়ে উঠতে থাকত। গল্পগুলো পড়ার জন্য হোজার লোভাতুর কৌতূহল ও পাঠান্তে তার অদ্ভুত আনন্দলাভ আমাকে চমৎকৃত করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্রোধ বর্ধিত হল এবং আমার প্রতি তার ইতিমধ্যেই-সীমা-ছাড়ানো নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠল, এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে নিজের অতীত বলে যে অতীতকে সে গ্রহণ করবে বলে ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছিল সেই

অতীতের পাপ সে সহ্য করতে পারেনি। সে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে মারতে শুরু করত। আমার মাত্রাছাড়া লেখাগুলোর যে কোনো একটা পড়ার পরেই সে চিৎকার করে বলে উঠত, 'ব্যাটা বদমাস!' এবং তার হাত যে তীব্রতার সাথে আমার পিঠের উপর এসে পড়ত তাতে সেই আঘাতকে নিছক রসিকতাসঞ্জাত বলা যেত না। এক দু'বার তো এমনও হয়েছে যে নিজেকে সামলাতে না পেরে সে আমার মুখে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহারের পিছনে প্রাসাদ থেকে তার ডাক আসা কমে যাওয়াটা একটা কারণ হতে পারে, অথবা আমাদের দু'জনকে ছাড়া নিজের মনোযোগকে সরানোর মতো আর কিছু সে পাবে না বলে হয়ত তার ধারণা হয়েছিল, আবার নিছক হতাশাও এর জন্য দায়ী হতে পারে। কিন্তু যত সে আরো বেশি করে আমার পাপের কথা পড়ত এবং তার ছেঁদো, বালখিল্য শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিত ততই নিরাপত্তার এক অদ্ভুত বোধ আমাকে ঘিরে ধরত  সেই প্রথম আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আমি তাকে মুঠোয় ভরে ফেলেছি।

একবার আমাকে খুব বিশ্রীভাবে আঘাত করার পর আমি তার মধ্যে আমার প্রতি করুণার সঞ্চার লক্ষ করলাম। কিন্তু সেই আবেগও ছিল বিদ্বেষপূর্ণ আর তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল নিম্নমানের মানুষের জন্য বরাদ্দ বিরাগ। অবশেষে আমার প্রতি তার ঘৃণাশূন্য দৃষ্টি থেকেও এই সত্যটি আমার কাছে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 'আর লেখার দরকার নেই,' সে জানিয়ে দিল, কিন্তু তারপর নিজেকে শুধরে নিয়ে সে আবার বলল, 'আমি চাই না যে তুমি আর লেখ' কারণ সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে কেবল আমাকে নিজের ত্রুটি নিয়েই লিখে যেতে দেখেছে। প্রতি গতাসু দিনের সাথে আরও ভারী হয়ে চেপে বসা বিষাদের তলায় আমরা তলিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই সে বলল যে এই বাড়ি ছেড়ে আমাদের বেরোতেই হবে এবং কোথাও থেকে ঘুরে আসতে হবে। জায়গাটা সম্ভবত গেব্‌জে হতে পারে। সে আবারও একবার জ্যোতির্বিদ্যার দিকে ঝুঁকছিল এবং পিঁপড়েদের ব্যবহার নিয়ে অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য একটি নিবন্ধ লেখার কথা ভাবছিল। আমার প্রতি তার যাবতীয় শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে দেখে আমি এসময় সচকিত হয়ে উঠেছিলাম, তার উৎসাহ ধরে রাখার চেষ্টায় আমি তাই আবার এমন একটি গল্প উদ্ভাবন করলাম যাতে আমার শয়তানি সম্পূর্ণ নগ্নরূপে প্রকাশ পায়। হোজা আয়েষ করে গল্পটি পড়ল এবং একটুও রেগে গেল না। আমার ধারণা জন্মালো যে সে সম্ভবত আমার পাপমতির তীব্রতা দেখে খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, অথবা এমনও হতে পারে যে ওরূপ হীনতার পরিচয় পাওয়ার পর সে আর আমাকে অনুকরণ করতে চাইছিল না এবং শেষ পর্যন্ত নিজসত্তাকে বজায় রাখতেই সচেষ্ট ছিল। সে অতি অবশ্যই বুঝত যে এসবের মাধ্যমে আসলে একটা খেলা চলছে। সেদিন তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার আচরণ ছিল প্রাসাদের মোসাহেবের মতো যে জানে যে তাকে প্রকৃত পুরুষ বলে গণ্য করা হয় না। আমি আরও বেশি করে তার কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলাম  সে আর কী হারাবে যদি গেবজে রওনা হওয়ার আগে সে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখে? সে যেমন তেমন সে কী করে হল তা বোঝার জন্য যদি সে একবার নিজের ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে লিখে ফেলে? সে যা লিখবে তা সত্যি হওয়ার প্রয়োজন নেই, এমনকি কারোর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ারও দায় নেই। এই কাজটা করলে তবেই সে আমাকে ও আমার

মতো মানুষদের বুঝতে পারবে এবং সেই জ্ঞান কোনোদিন তার কাছে উপযোগী বলেও প্রতিভাত হতে পারে! অবশেষে, নিজের কৌতূহল ও আমার ঘ্যানঘ্যানানি দমন করতে না পেরে সে বলল যে সে পরের দিন চেষ্টা করবে। তবে একথা জানাতেও সে ভুলল না যে আমার নির্বোধ চাতুরিতে ভুলে নয়, নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই সে কাজটি করবে।

পরের দিনটি ছিল আমার দাসজীবনের সবচেয়ে উপভোগ্য দিন। সেদিন সে আমাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখেনি, কিন্তু আমি তার মুখোমুখি বসেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার অন্য এক মানুষ হয়ে ওঠার দৃশ্যটি আমি উপভোগ করতে পারি। নিজের কাজের প্রতি তার বিশ্বাসের প্রাথমিক তীব্রতা এত বেশি ছিল যে সে প্রথমে পাতার উপরে 'আমি যেমন কেন আমি তেমন' এই বোকা বোকা শিরোনামটি পর্যন্ত লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। মনোহারী মিথ্যা বলার সময় দুষ্টু শিশু যেমন আত্মবিশ্বাসী থাকে সেও তেমনি ছিল, এক ঝলক দেখেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সে তখনো তার নিজের নিরাপদ দুনিয়ার ঘেরাটোপের মধ্যেই আছে। কিন্তু নিরাপত্তার সেই অতিরঞ্জিত বোধ বা আমার উপস্থিতির কারণে পরিগৃহীত অনুশোচনার মিথ্যা প্রদর্শন কোনোটিই বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। অল্প সময়ের মধ্যেই তার ছলনাময় উপেক্ষা দুশ্চিন্তার রূপ নিল, খেলাটা সত্যিকারের হয়ে উঠল, মিছামিছি হলেও এই আত্ম-অভিযুক্তিকরণের প্রচেষ্টা তাকে হতবুদ্ধি ও ভীত করে তুলল। সে যা লিখেছিল তা তৎক্ষণাৎ আমাকে না দেখিয়েই কেটে দিল। কিন্তু বিষয়টা সম্বন্ধে তার যে কৌতূহলও জেগে উঠেছিল তা পরিষ্কার হয়ে গেল কারণ সে তা নিয়েই মেতে রইল, আর আমার বিশ্বাস যে এই কারণে সে আমার সামনে লজ্জাও বোধ করছিল। তবে নিজের প্রাথমিক তাড়না দ্বারা চালিত হয়ে সে যদি সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে উঠে পড়ত, তাহলে হয়ত তাকে নিজের মানসিক শান্তি হারাতে হত না।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় আমি ধীরে ধীরে তার আত্ম উদ্‌ঘাটন লক্ষ্য করলাম আত্মসমালোচনামূলক কিছু একটা লিখে, আমাকে না দেখিয়েই সে তা ছিঁড়ে ফেলছিল এবং যতবার এমন ঘটছিল ততবারই তার নিজের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরও একটু করে খোওয়া যাচ্ছিল। তখন যা খোওয়া গেছে তাকে পুনরুদ্ধারের বাসনায় সে আবার নতুন করে শুরু করছিল। তার স্বীকারোক্তিগুলো আমাকে দেখানোর কথা ছিল, কিন্তু যা পড়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম রাত পর্যন্ত তার একটি অক্ষরও আমার পড়া হয়ে উঠল না কারণ সে তার সমস্ত লেখা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং তখন তার শক্তিও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে লেখাকে ঘৃণ্য অবিশ্বাসীর কাজ বলে দেগে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, কিন্তু তখন তার আত্মবিশ্বাস এমন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল যে আমি বেশ উদ্ধতভাবেই তাকে জবাব দিয়েছিলাম যে কোনোরকম আক্ষেপ ছাড়াই যে পাষণ্ড হওয়া সম্ভব এই ধারণায় সে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সে উঠে পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, কেউ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে এই ব্যাপারটা সম্ভবত সে আর সহ্য করতে পারছিল না। অনেক রাতে যখন সে ফিরে এল তখন তার শরীরে লেগে থাকা সুগন্ধী থেকে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার সন্দেহটিই সঠিক, সে বারবণিতাদের কাছে গিয়েছিল।

লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হোজাকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে পরের দিন দুপুরে আমি তাকে বললাম যে এসব নিরীহ খেলার দ্বারা সে নিশ্চয় প্রভাবিত হবে না। শুধু সময় কাটানো তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এর মাধ্যমে আমরা তো কিছু শিখতেও চাই। আর তাছাড়া এর মাধ্যমে যাদেরকে সে নির্বোধ বলে মনে করে তারা নির্বোধ কেন সেই সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তো তার হবেই। একে অপরকে যথার্থ চিনতে পারার সম্ভাবনাটাই কি যথেষ্ট রোমাঞ্চকর নয়? দুঃস্বপ্ন যেমন মানুষকে বিবশ করে দেয় তেমনই কারোর হৃদয়ের কোণে লুকানো ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির জ্ঞানও মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে।

প্রাসাদের কোনো বামনের অতিরঞ্জিত প্রশংসাকে সে যতটা গুরুত্ব দিত আমার বক্তব্যকে সে তার থেকে বেশি গুরুত্ব দিল না। তবে আমার কথায় না হলেও, দিবালোকের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে সে আবার টেবিলে এসে বসল। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতে সে যখন টেবিল ছেড়ে উঠল তখন তার আত্মবিশ্বাস পূর্বসন্ধ্যার থেকেও কমে গিয়েছিল। সেই রাতেও যখন সে বারবণিতাদের কাছে যাওয়ার জন্য রওনা দিল তখন আমি তার প্রতি করুণা অনুভব করলাম।

এভাবে প্রতিদিন সকালে সে এই বিশ্বাস নিয়ে টেবিলে এসে বসত যে সেদিন তার লেখায় প্রকাশিতব্য নিজের হীনতাকে সে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হবে এবং তার আগের দিনে খোওয়া যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাতেই নিজের অবশিষ্ট আত্মবিশ্বাসের আরও একটুখানি টেবিলে ফেলে রেখে সে উঠে যেত। এখন নিজেকেও যেহেতু সে নিন্দার্হ বলে মনে করত তাই আর আমাকে সে ঘৃণার চোখে দেখত না। একত্রে বসবাসের শুরুর দিনগুলোতে আমাদের উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সাম্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে এক ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল। এতদিনে অবশেষে আমার মনে হল যে সেই সাম্য যথার্থই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে আমি খুব খুশি হলাম। আমার সম্বন্ধে সাবধানী হওয়ার কারণে সে জানিয়ে দিল যে টেবিলে তার সঙ্গে আমার বসে থাকার আর দরকার নেই। এটিকেও একটি শুভ লক্ষণই বলা চলে, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে আমার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার লাগামছাড়া হয়ে উঠল। আমি প্রতিশোধ নিতে চাইলাম, আমি আক্রমণ করতে চাইলাম, তার মতোই আমিও নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। আমি অনুভব করলাম যে হোজার মনে যদি তার নিজের প্রতি সংশয় আরও একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এবং আমার থেকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা স্বীকারোক্তিগুলোর কয়েকটি পড়ে নিয়ে যদি তাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করে যেতে পারি তবে এই বাড়িতে দাস ও পাপী হিসেবে সেই প্রতিষ্ঠিত হবে, আমি নই। ইতিমধ্যেই অবশ্য এর লক্ষণগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল : আমি তাকে নিয়ে মস্করা করছি কিনা সে ব্যাপারে সে মাঝে মাঝেই নিশ্চিত হতে চাইত, নিজেকে আর বিশ্বাস করতে না পারায় সে আমার অনুমোদন চাইত, এমনকি তার পোষাক ঠিক আছে কি না, কাউকে যে উত্তরটা সে দিল সেটা ভালো হল কি না, তার হাতের লেখা আমি পছন্দ করছি কি না, আমি কী ভাবছি ইত্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যাপারে সে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি আমার মতামত জানতে চাইত। খেলাটা শেষ হয়ে যাক তা আমি কখনোই চাইতাম না। তাই সে যাতে সম্পূর্ণ হতাশ না হয়ে পড়ে তার জন্য আমি মাঝেমাঝেই আত্মসমালোচনা করে তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করতাম। আমার প্রতি তার দৃষ্টিপাতে 'তুমি একটা শয়তান' কথাটি

পরিষ্কার লেখা থাকত, কিন্তু আর সে আমাকে আঘাত করত না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তার নিজেরও প্রহার প্রাপ্য বলে সে ভাবতে শুরু করেছিল।

তার মনে এই স্বীকারোক্তিগুলো তীব্র আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল বলে তাদের সম্বন্ধে আমার অসীম কৌতূহল ছিল। মনে মনে হলেও আমি তাকে নিকৃষ্ট মানের বলেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম আর তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে বোধহয় কিছু সাধারণ, তাৎপর্যহীন পাপাচারণের কথায় সেসব স্বীকারোক্তি পূর্ণ থাকবে। এখন যখন আমি আমার অতীতকে বাস্তবতার আলোয় দেখার চেষ্টা করি এবং তার স্বীকারোক্তিগুলোর একটি বাক্যও না পড়া সত্ত্বেও তাদের দু-একটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কল্পনা করার চেষ্টা করি তখন আমি হোজা কৃত এমন কোনো পাপের কথা ভেবেই পাই না যা আমার গল্পের ধারাবাহিকতা এবং আমার কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারত। তবে আমার মনে হয় আমি যে পরিস্থিতিতে রয়েছি তাতে নিজেকে আবার বিশ্বাস করা যেতেই পারে, একথা আমি অবশ্যই বলব যে হোজা না বুঝলেও তাকে দিয়ে আমি একটা আবিষ্কার করিয়ে নিতে পেরেছিলাম এবং পুরোপুরি নির্ণায়ক ও খোলামেলাভাবে না হলেও আমি তার কাছে তার ও তার মতো মানুষদের দুর্বলতাগুলো উন্মোচিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি সম্ভবত ভেবেছিলাম যে সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন আমি হোজাকে ও অন্যদেরকেও তাদের সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা কী তা মুখের উপর বলে দিতে পারব এবং তারা কত বড় বজ্জাত তা প্রমাণ করে দিয়ে আমি তাদের ধ্বংস করে দিতে পারব। আমার বিশ্বাস যারা আমার গল্প পড়ছেন তারা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে হোজা যেমন আমার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিল তেমনি আমিও তার কাছ থেকে শিখেছিলাম! হয়ত আমার ভাবনা এখন এই খাতে বইছে কারণ বয়স হয়ে গেলে আমরা সকলেই আমাদের পাঠ্যগল্পসহ সবকিছুর মধ্যেই সাদৃশ্য খুঁজে বেড়াই। বছরের পর বছর ধরে একটা ক্ষোভ আমার মধ্যে ফুটছিল, হোজার আত্মঅবমাননা সম্পূর্ণ হলে আমি তার কাছে স্বীয় উৎকর্ষ প্রমাণ করতে না পারলেও অন্তত আমার স্বাধীনতা মেনে নিতে তাকে বাধ্য করতে পারব এবং তারপর উপহাসের ভঙ্গিতে তার কাছে আমার মুক্তি দাবি করব। আমি তখন স্বপ্ন দেখছিলাম যে কোনোরকম দ্বিরুক্তি ছাড়াই সে আমাকে মুক্ত করে দেবে আর দেশে ফেরার পরে আমি ভাবতে বসব যে তুর্কীরাজ্যে আমার অভিযান সম্পর্কে আমি কী লিখব। কত সহজেই না আমি সেদিন যাবতীয় পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম! এক সকালে হোজার আনা খবরে হঠাৎই সবকিছু পাল্টে গেল।

শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে! এমনভাবে হোজা কথাটা বলল যেন ইস্তাম্বুলের নয়, বহু দূরবর্তী কোনো শহরের সংবাদ সে পরিবেশন করছে। আমি প্রথমে বিশ্বাসই করিনি, খবরটা তার কানে কীভাবে পৌঁছল তা আমি জানতে চাইলাম, আমি সব কিছুই বিস্তারিত জানতে চাইছিলাম। আপাত কোনো কারণ ছাড়াই আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল, সম্ভবত কোনো রোগের প্রকোপেই এমনটি ঘটে। আমি অসুস্থতার লক্ষণগুলো সম্বন্ধে জানতে চাইলাম, হয়ত রোগটা আদৌ প্লেগ নয়, হোজা হেসে বলল যে আমার চিন্তা করার দরকার নেই, রোগ যদি ধরে তবে আমি নিঃসন্দেহেই তা বুঝতে পারব এবং তিনদিনের জ্বরের মধ্যেই যা বোঝার বুঝে নিতে হবে। কারোর কানের পেছনে ফুলে যাচ্ছিল, কারোর বাহুমূল বা পেট ফুলে উঠছিল,

বাগী রোগ দেখা দিচ্ছিল এবং তারপর জ্বর আসছিল। কখনো কখনো ফোঁড়া ফেটে যাচ্ছিল, কারোর কারোর ফুসফুস থেকে রক্ত উঠছিল, ক্ষয়রোগীর মতো প্রবল কাশতে কাশতেও অনেকে মারা যাচ্ছিল। হোজা আরও জানাল যে প্রত্যেক জেলাতেই নাকি দলে দলে লোক মারা পড়ছে। চিন্তিত হয়ে আমি আমাদের প্রতিবেশী এলাকার কথা জানতে চাইলাম। সেকি, আমার কি কানে যায়নি? যে রাজমিস্ত্রিটি নিজের জমিতে প্রতিবেশীদের মুরগি ঢুকে পড়ত বলে তাদের সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করত সে তো মাত্র সপ্তাহখানেক আগেই জ্বরের ঘোরে আর্তনাদ করতে করতে মারা গেছে। তবে সে যে প্লেগের প্রকোপে মরেছে তা এখন সবাই বুঝতে পারছে।

কিন্তু বাইরে রাস্তায় সবকিছু এত স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল, আমাদের জানলার পাশ দিয়ে মানুষ এত শান্তভাবে যাতায়াত করছিল যে বাস্তবটা আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। তবে এখানে প্লেগ সত্যিই হাজির হয়ে থাকলে সতর্কতাবাণী প্রচারের জন্য কাউকে না কাউকে আমার একান্ত প্রয়োজন। পরের দিন সকালে হোজা বিদ্যালয়ে চলে যেতেই আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ইস্তান্বুলে অতিবাহিত গত এগারো বছরে যত ইতালীয় ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের সবাইকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। তাদের মধ্যে একজন, বর্তমানে সে পরিচিত মুস্তাফা রেইস নামে, ইতিমধ্যেই জাহাজঘাটার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। আরেকজন, ওসমান এফেন্দি, তুমুল কড়া নাড়া সত্ত্বেও দরজাই খুলতে চাইছিল না। প্রথমে সে তার চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালো যে সে বাড়িতে নেই, তারপর একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যে চেঁচাতে লাগল। রোগের সত্যাসত্য নিয়ে আমি এখনো প্রশ্ন করছি কী করে, রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত কফিনের যাতায়াত কি আমার চোখে পড়ছে না? সে বলল যে আমি ভয় পেয়ে গেছি, সে আমার মুখে ভয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছে এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসী থেকে গেছি বলেই নাকি আজ আমি ভীত! সে আমাকে তিরস্কার করে বলল যে এখানে সুখী হতে গেলে মানুষকে মুসলমান হতেই হবে। বাড়ির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে করমর্দন সে এড়িয়ে গেল, বস্তুতপক্ষে সে আমাকে স্পর্শই করল না। নমাজের সময় হয়ে এসেছিল, মসজিদের প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া মানুষের ভীড় দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিপর্যস্ত মানুষের মতো আমিও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার অতীত হারিয়ে ফেলেছি, আমার স্মৃতির ভাণ্ডার যেন শূন্য হয়ে গেছে, আমি যেন চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়েছি। অবশেষে আমাদের এলাকার রাস্তাতেই একদল লোককে যখন শব বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম তখন নিজের স্নায়ুর উপর আমার আর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণই রইল না।

হোজা বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসেছিল। আমার অবস্থা দেখে সে খুশি বলে মনে হল। আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার আতঙ্ক তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে আমার অস্বস্তি বেড়ে গেল। আমি চাইতাম নিজের নির্ভীকতা নিয়ে তার মিথ্যা গর্ব চুপসে যাক। নিজের বিরক্তি ও ক্ষোভের উপর রাশ টানার চেষ্টায় আমি আমার যাবতীয় চিকিৎসা ও সাহিত্যসংক্রান্ত জ্ঞানের ঝাঁপি উপুড় করে বসলাম : হিপ্পোক্রেটস, থুসিডাইডস ও বোকাচিওর রচনা থেকে প্লেগের যত দৃশ্যাবলীর কথা আমার মনে পড়ল সব বর্ণনা করলাম, রোগটিকে যে সংক্রামক বলে বিশ্বাস করা হয় তাও বললাম। কিন্তু তাতে মনে হোজার কেবল ঘৃণার পরিমাণই বাড়ল—প্লেগকে সে ভয়

পায় না, রোগ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, কোনো মানুষের নিয়তিতে যদি মৃত্যু থাকে তবে সে মরবে, ফলে আমি যেমন ভীরু কাপুরুষের মতো নিজেকে ঘরবন্দী রাখা, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা ইস্তাম্বুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলছি তা নিতান্তই অর্থহীন। ভাগ্যে লেখা যদি থাকে তবে তা ঘটবেই, মৃত্যু আমাদেরকে খুঁজে নেবেই। আমি ভীত কেন? দিনের পর দিন ধরে আমি নিজের যেসব পাপের কথা লিখেছি সেসবের কারণে? তার মুখে হাসি ফুটে উঠল আর তার দৃষ্টিতে ছিল নিজের যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তার ঝিলিক।

হোজা যা বলল তা সে সত্যিই বিশ্বাস করত কি না তা আমার জীবন থেকে তাকে হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত আমি কখনোই আবিষ্কার করতে পারিনি। হোজার বেপরোয়া ভাব দেখে আমি মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর টেবিলে বসে আমাদের আলোচনা বা ভয়ংকর খেলাগুলোর কথা যখন মনে পড়ল তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল। নিজেদের পাপাচার সম্পর্কে উভয়ের যাবতীয় লেখাগুলোকেই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথোপকথনের বিষয়বস্তু করে তুলতে চাইছিল। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম কারণ সে আত্মম্ভরিতার সঙ্গে একই কথা বারংবার আওড়ে যাচ্ছিল। যদি মৃত্যু নিয়ে আমার এতই ভয় থাকত তবে যে সাহসের সঙ্গে আমি নিজের শয়তানির কথা লিখেছি সেই সাহস আমি সঞ্চয় করে উঠতে পারতাম না। নিজের যাবতীয় পাপাচারের কথা লেখায় উগড়ে দিতে গিয়ে আমি যে সাহস দেখিয়েছি তা হল বস্তুতপক্ষে আমার নির্লজ্জতার ফল! অথচ লেখার সময়ে সে কিন্তু যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কারণ নিজের ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিত। কিন্তু এখন সে শান্ত বোধ করছে, প্লেগের মুখে দাঁড়িয়েও নিজের মনে অনুভূত গভীর আত্মবিশ্বাস তার নিজের পবিত্রতা সম্বন্ধে তার হৃদয়কে নিঃসংশয় করে তুলেছে।

হোজার ব্যাখ্যা আমি নির্বোধের মতো বিশ্বাস করলাম কিন্তু ওই ন্যাক্কারজনক ব্যাখ্যার প্রতি বিরক্তিতে আমি তার সঙ্গে তর্কও জুড়ে দিলাম। তার আত্মবিশ্বাসের কারণ যে তার পরিচ্ছন্ন বিবেক নয়, বরঞ্চ মৃত্যুর নৈকট্য সম্বন্ধে তার অজ্ঞতা তাও আমি ভালোমানুষের মতো তাকে জানিয়ে দিলাম। আমরা কীভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি তা তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম প্লেগে আক্রান্ত কাউকে আমাদের স্পর্শ করা চলবে না, মৃতদেহগুলোকে চুন-ছড়ানো কবরে দাফন করতে হবে, মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে এবং ওই জনাকীর্ণ বিদ্যালয়ে হোজার কোনোমতেই যাওয়া চলবে না।

আমার শেষ পরামর্শটি হোজার মনে সম্ভবত প্লেগের থেকেও অধিকতর ভয়ংকর এমন সব ধারণার জন্ম দিল। পরের দিন দুপুরে বাড়িতে ফিরে সে জানাল যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশুকে সে এক এক করে স্পর্শ করেছে এবং তারপর সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আমাকে পিছিয়ে যেতে দেখে, তাকে স্পর্শ করতে আমি ভয় পাচ্ছি দেখে সে আমার আরও কাছে এগিয়ে এল এবং আনন্দের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম, কিন্তু স্বপ্নাবিষ্ট মানুষ যেমন চেঁচিয়ে উঠতে পারে না তেমনই আমিও পারলাম না। আর হোজা! সে উপহাসের সুরে বলল যে সে আমাকে সাহসিকতা শেখাবে, সেই সুর বুঝতে আমার বহু সময় লেগেছিল।

৬

দ্রুত প্লেগ ছড়াচ্ছিল, কিন্তু হোজা যাকে সাহসিকতা বলেছিল তা আমি কোনোমতেই শিখে উঠতে পারলাম না। আবার প্রথমদিককার মতো অতটা সতর্কও আমি আর ছিলাম না। চার দেওয়ালের মধ্যে আটক কোনো বৃদ্ধার মতো দিনের পর দিন জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে আমি আর দিন গুজরান করতে পারছিলাম না। কদাচিৎ আমিও মাতালের মতো ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম, বাজারে খরিদারিতে মশগুল দোকানে দোকানে কাজে ব্যস্ত ব্যবসায়ী এবং নিকটাত্মীয়দের দাফন করে এসে কফির দোকানে জড়ো হওয়া পুরুষদের মধ্যে প্লেগের সঙ্গে সহবাস করার চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যেত। আমিও তাই করতে পারতাম, কিন্তু তাতেও হোজা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিত না।

প্রতি রাতে হোজা আমাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াত, ওই হাত দিয়ে নাকি সে সারাদিন ধরে অগুনতি লোককে ছুঁয়ে এসেছে, আমি নিথর হয়ে থাকতাম। প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার গায়ের উপর যদি হঠাৎ বিছের উপস্থিতি টের পান তবে আপনি কেমন মূর্তির মতো প্রস্তরীভূত হয়ে যাবেন তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন—ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই ছিল। তার আঙুলগুলো ঠিক আমার আঙুলের মতো ছিল না। আমার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে হোজা জিজ্ঞেস করত, 'ভয় লাগছে?' আমি একটুও নড়তাম না, 'তুমি ভয় পাচ্ছ। কিন্তু ভয় পাচ্ছ কেন?' কখনো কখনো ইচ্ছা হত তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই, প্রয়োজন হলে মারামারিও করি, কিন্তু তাতে যে তার রাগ আরও বেড়ে যাবে তাও জানতাম। 'আমি বলছি কেন তুমি ভীত। তুমি দোষী, তাই তুমি ভয় পাচ্ছ। তুমি ভয় পাচ্ছ, কারণ তুমি পাপে নিমজ্জিত। তুমি ভয় পাচ্ছ কারণ আমি তোমাকে যতটা বিশ্বাস করি তুমি আমাকে তার থেকে বেশি বিশ্বাস কর।'

হোজাই চাইত যে আমরা টেবিলে মুখোমুখি বসে একসাথে লিখি। এখন সময় এসেছিল আমরা যেমন তেমন আমরা কেন তা নিয়ে লেখার। কিন্তু এবারও তার লেখায় 'অন্যরা' যেমন তেমন তারা কেন ছাড়া আর কিছুই ফুটে উঠল না। এই প্রথমবার সে অত্যন্ত গর্বভরে তার লেখা আমাকে দেখাল। কিন্তু আমি যখন বুঝতে পারলাম যে তার লেখা পড়ে আমি ভীষণ মুগ্ধ হব বলে সে প্রত্যাশা করছে তখন আর নিজের বিতৃষ্ণা আমি লুকিয়ে রাখতে পারলাম না এবং বলেও ফেললাম যে তার লেখায় আলোচ্য নির্বোধদের থেকে সে নিজে কিছু আলাদা নয় এবং সে আমার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

আমি তখন বুঝে নিলাম যে এই ভবিষ্যদ্বাণীই আমার সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হতে পারে। আমি তার বিগত দশ বছরের পরিশ্রমের কথা—মহাবিশ্বের বিভিন্ন চর্চায় অতিবাহিত বছরগুলো, নিজের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি স্বীকার করে আকাশ সম্বন্ধে তার যাবতীয় পর্যবেক্ষণ বা বইয়ের পাতা থেকে চোখ না-সরানো দিনগুলো প্রভৃতির কথা তাকে মনে করিয়ে দিলাম। এবার আমি আর তাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি তাকে বললাম যে প্লেগকে এড়িয়ে বেঁচে থাকা যখন সম্ভব তখন অকারণে মরে যাওয়াটা ভীষণই বোকামো হবে। এসব বলে আমি যে কেবল তার সংশয় বাড়িয়ে দিলাম তাই নয়, নিজের শান্তির পরিমাণও এর ফলে বেড়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার লেখা পড়তে পড়তে সে যেন ক্ষোভের সাথে আমার প্রতি তার হৃত শ্রদ্ধাকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করছে। সেই সব দিনগুলোতে নিজের দুর্ভাগ্য ভোলার জন্য আমার দেখা যাবতীয় সুখস্বপ্ন লিখে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলতাম। সেসব লেখায় কেবল রাতে দেখা স্বপ্নই নয়, দুপুরের ঘুমের সময়ে দেখা স্বপ্নও ঠাঁই পেত। সেইসব স্বপ্নে ঘটনাবলী ও তার অর্থের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ছিল না। সবকিছু ভোলার চেষ্টায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বপ্নগুলো লিপিবদ্ধ করতে বসে যেতাম। লিখনশৈলীকে কাব্যিক করে তোলার জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। আমি স্বপ্নে দেখতাম যে আমাদের বাড়ির পাশের জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষরা এমন সব দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে যা আমরা বহুবছর ধরে ভেদ করতে চেয়েছি, সাহস করে সেই জঙ্গলের অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে তাদের বন্ধু হয়ে ওঠাও সম্ভব। সেই স্বপ্নে আমাদের ছায়াগুলো সূর্যাস্তের সাথে সাথে মিলিয়ে যায় না, বরঞ্চ তাদের নিজস্ব জীবনীশক্তিতে ভর করে তারা এমন অনেক হাজার টুকিটাকি বিষয় আয়ত্ত করতে চায় যা আমাদেরই আয়ত্ত করা উচিত ছিল, অথচ আমরা তখন আমাদের পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ বিছানায় শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছি। আমার স্বপ্নে মূর্ত সুন্দর, ত্রিমাত্রিক মানুষেরা তাদের কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের মধ্যে মিশে যেত; আমার মা, বাবা ও আমি নিজেদের কাজ করার জন্য পিছনের বাগানে স্টীলের যন্ত্রপাতি স্থাপন করতাম...

এই স্বপ্নগুলো যে আদতে তাকে এক সর্বনাশা বিজ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্নতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত শয়তানী ফন্দি সে সম্বন্ধে হোজা যথেষ্টই সচেতন ছিল। সে ভালোই বুঝতে পারত যে প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সাথেই তার আত্মবিশ্বাসে আরও একটু করে চিড় ধরছে, কিন্তু তবু আমাকে সে প্রশ্ন করা থামাল না   এসব বোকা বোকা স্বপ্নের অর্থ কী, আমি কি সত্যি সত্যিই এসব স্বপ্ন দেখি? বহু বছর পরে সুলতানের সঙ্গে আমরা যুগলে যা করেছিলাম তার প্রথম অনুশীলনটি এভাবে আমি হোজার উপরই সেরে নিয়েছিলাম, আমাদের স্বপ্নের উপর নির্ভর করে উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলাম। একথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানের প্রতি মুগ্ধতা একবার পেয়ে বসলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া প্লেগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার মতোই দুঃসাধ্য। হোজা যে এই নেশায় মজেছে তা বোঝা খুব একটা কঠিন ছিল না, কিন্তু তবু তার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল। সে আমার কথা শুনত এবং খোলাখুলিই তা নিয়ে মস্করা করত, কিন্তু আত্মশ্লাঘাকে যেহেতু সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার স্তরে নামিয়ে এনেছিল তাই তার ওই অভ্যেস আমার খুব একটা বিরক্তি উৎপাদন করত

না। এছাড়া, আমি এও লক্ষ্য করেছিলাম যে আমার উত্তর তার কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল। প্লেগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হোজা নিজেকে স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিল, কিন্তু তাতে যখন ধীরে ধীরে বিক্ষোভের আঁচ লাগল তখন তার ফলশ্রুতিতে আমার নিজের মৃত্যুভয় না কমলেও আমি অন্তত এটুকু অনুভব করলাম যে আতঙ্কের অনুভূতির ক্ষেত্রে আমি আর একা নই। তার নৈশ যন্ত্রণার মূল্য আমাকে চোকাতে হয়েছিল একথা ঠিক, কিন্তু আমি এও অনুভব করলাম যে আমার লড়াই বৃথা যায়নি হোজা আমার দিকে হাত বাড়াতেই আমি তাকে আবার বললাম যে সে আমার আগেই মারা যাবে এবং তাকে মনে করিয়ে দিলাম যে কেবল অজ্ঞরাই ভীত নয়, তার লেখা অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, এবং সেদিন সে আমার যে স্বপ্নগুলোর বিবরণ পড়েছিল সেগুলো সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যাই হোক, আমার কথায় নয়, অন্য একটি ঘটনার ফলশ্রুতিতে ব্যাপারটি চূড়ান্ত আকার ধারণ করল। তার বিদ্যালয়ের কোনো এক ছাত্রের আব্বা একদিন বাড়িতে এসে হাজির হল। ছোট্ট মানুষটিকে নিরীহ, গোবেচারা প্রকৃতির বলেই মনে হল, আমাদের পাড়াতেই সে বাস করে বলে জানাল। গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকা নিদ্রাতুর পোষা বেড়ালের মতো আমিও ঘরের কোণে কুঁকড়ে বসে থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের আনসান কথোপকথন শুনতে লাগলাম। এতক্ষণ ধরে যা বলতে না পেরে আমাদের অতিথির প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল তা সে হঠাৎই এরপর গলগল করে বলে ফেলল তার আব্বার দিকের এক তুতো বোন গত গ্রীষ্মে বিধবা হয়েছে, ছাদ ছাওয়ার সময় তার স্বামী ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এখন তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী পাত্রের সংখ্যা অনেক, কিন্তু আমাদের অতিথি হোজার কথা ভেবে রেখেছে কারণ হোজা বিবাহের কথা বিবেচনা করছে বলে সে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। হোজার প্রতিক্রিয়া ছিল আমার প্রত্যাশার থেকেও অধিকতর নির্মম সে বলল যে সে বিবাহ করতে চায় না, আর চাইলেও কোনো বিধবাকে সে বিবাহ করত না। এতে আমাদের অতিথি আমাদের মনে করিয়ে দিল যে নবী মুহাম্মদের (সঃ) কিন্তু খাদিজার বৈধব্য নিয়ে কোনো আপত্তি তো ছিলই না, এমনকি তিনি তাকে তাঁর প্রথম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, হোজা বলল যে সে ওই বিধবার সম্বন্ধে শুনেছে এবং সে পবিত্র খাদিজার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। একথা শুনে আমাদের অদ্ভুতুড়ে, গর্বিত প্রতিবেশীটি হোজাকে বোঝাতে চাইল যে সে নিজেও খুব একটা অমূল্য কিছু নয় এবং একথা জানাতেও ভুলল না যে প্রতিবেশীরা কিন্তু বলছে যে তার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে যদিও সে তা মোটেই বিশ্বাস করেনি। হোজার নক্ষত্রাবলোকন, নানান লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করা বা অদ্ভুত সব ঘড়ি বানানো এসব কেউই ভাল চোখে দেখছে না। কোনো জিনিস কিনতে আগ্রহী বণিক যে প্রকার বিদ্বেষের সাথে উক্ত জিনিসের সমালোচনা করে সেইরূপ বিদ্বেষ সহকারে আমাদের অতিথিটি এও বলল যে প্রতিবেশীরা নাকি বলছে যে সে বাবু হয়ে বসার পরিবর্তে অবিশ্বাসীর মতো টেবিলে বসে খাদ্যগ্রহণ করে, থলির পর থলি মুদ্রা দিয়ে বই কিনে তা ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখে ও নবীর নামাঙ্কিত বই পায়ে দলে চলাফেরা করে, আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকেও নিজের ভিতরের শয়তানকে তাড়াতে না পেরে দিনের আলোতেও সে খাটে শুয়ে শুয়ে নিজের ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে থাকে, নারীর পরিবর্তে কেবল বাচ্চা

ছেলেদের মধ্যেই সে আনন্দ খুঁজে পায়, আমি হলাম তার যমজ ভাই, সে রমজান মাসে উপবাস করে না এবং তার পাপের ফল হিসেবেই প্লেগের আবির্ভাব ঘটেছে।

অতিথিটিকে বিদায় করার পর হোজা ফেটে পড়ল। অন্যদের মতো ওই একই মনোভাব পোষণ করত বলে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করত বা লাভ করার ভান করত কিন্তু সেই মনোভাবের যে এখন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। এবার তাকে অন্তিম আঘাত দেবার অভিপ্রায়ে আমি তাকে বললাম যে যারা প্লেগকে ভয় পায় না তারা এই লোকটির মতোই নির্বোধ। সে আশঙ্কিত বোধ করল, কিন্তু এও জোর দিয়ে বলল যে সে প্লেগকে ভয় পায় না। আমার মনে হল যে কারণ যাই হোক না কেন, কথাটা সে মন থেকেই বলেছে। সে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল, হাত দুটো নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। 'নির্বোধদের' সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশে তার বরাবরের ব্যবহৃত পঙক্তিটি অনতিঅতীতে ব্যবহার না করলেও এখন আবার তা সে বারবার বলতে লাগল। রাত নামার পর সে লণ্ঠন জ্বালাল, টেবিলের মাঝখানে লণ্ঠনটিকে রেখে সে ঘোষণা করল যে আমাদের এখন সেখানে বসতে হবে। লিখতেই হবে।

শীতের অনন্ত রাত্রিতে দুই আইবুড়ো পুরুষ সময় কাটানোর জন্য যেমন নিজেদের ভাগ্য নিয়ে গল্প করে তেমনি আমরাও টেবিলে পরস্পরের মুখোমুখি বসে শূন্য পাতায় কিছু না কিছু লিখে যেতে লাগলাম। ব্যাপারটি কি যে অসম্ভব ছিল! হোজা তার স্বপ্ন হিসেবে যা লিখেছিল পরদিন সকালবেলা সেটি পড়ার পরে নিজের থেকে তাকে আরও বেশি হাস্যকর বলে মনে হল। আমার অনুকরণে সে একটি স্বপ্নকে লিপিবদ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু বর্ণনার প্রতিটি শব্দ থেকেই এটি স্পষ্ট ছিল যে সেটি কখনোই স্বপ্ন হিসেবে দেখা হয়নি, তা ছিল নিছকই এক কল্পনা  আমরা ছিলাম দুই ভাই! নিজের জন্য বড় ভাইয়ের ভূমিকাই যথাযথ বলে সে মনে করেছে আর আমি বাধ্য ছাত্রের মতো তার বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা শোনায় মগ্ন রয়েছি। সকালে প্রাতরাশ সারার সময়ে আমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রতিবেশীদের কানাঘুষা বিষয়ে সে আমার মত জানতে চাইল। প্রশ্নটি আমাকে খুশি করলেও আমার গর্ববোধকে তৃপ্ত করতে পারল না; আমি কিছুই বললাম না। দু'দিন বাদে মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে জানাল যে সেদিনের লেখা স্বপ্নটি এবার সে সত্যিই দেখেছে। হয়তো তাই-ই, কিন্তু কী কারণে জানি না আমি তাতে পাত্তা দিলাম না। পরের রাতে সে স্বীকার করে নিল যে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

ঘরে বন্দী হয়ে থাকার কষ্ট আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, তাই গোধূলির সময়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এক উদ্যানে শিশুরা গাছে চড়ছিল আর মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের রঙ-বেরঙের পাদুকাসম্ভার, ঝরনার ধারে গল্পে মশগুল সারিবদ্ধ মহিলারা আমাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেও আর চুপ করে গেল না। বাজার ছিল ক্রেতার ভীড়ে পরিপূর্ণ, এক জায়গায় মারামারি লেগে গিয়েছিল, কেউ কেউ তাদেরকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও অনেকেই সেই দৃশ্য উপভোগ করছিল। আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে মহামারী তবে বোধহয় তার খেলা সাঙ্গ করেছে, কিন্তু বেয়াজিত মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে যখন একের পর এক শবাধার বেরোতে লাগল তখন আমি আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং দ্রুত বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে

ঢুকতেই হোজা আমাকে চিৎকার করে ডাকল, 'এদিকে এসে এটা একবার দেখতো!' তার জামার বোতাম খোলা, নাভির নীচে লালচে রঙের একটা ছোট্ট ফোলা মতো জায়গার দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, 'চারিদিকে এত পোকা।' আমি কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, একটা ছোট্ট লাল দাগ, সামান্য স্ফীত, পোকা কামড়ানোর মতোই দেখতে লাগছে বটে। কিন্তু এটা সে আমাকে দেখাচ্ছে কেন? আরও কাছে যেতে আমার ভয় লাগছিল। 'পোকার কামড়,' হোজা বলল, 'তাই মনে হচ্ছে না?' স্ফীত জায়গাটা সে তার আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল। 'নাকি বড় মাছি জাতীয় কোনো কিছুর কামড়?' আমি চুপ করে রইলাম, ওরকম কোনো মাছির কামড় আমি কখনো দেখিনি তা আর আমি তাকে বললাম না।

কোনো একটা অজুহাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি বাগানেই কাটিয়ে দিলাম। এই বাড়িতে যে আর কোনোমতেই থাকা চলবে না তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু যাওয়ার মতো কোনো জায়গার কথা আমার মাথায় আসছিল না। ফোলা জায়গাটা দেখে সত্যি পোকার কামড় বলেই মনে হচ্ছে, প্লেগের আক্রমণে গ্রন্থি ফুলে গিয়ে যেমন পরিস্ফুট ও বিরাট আকার ধারণ করে এটা তেমন নয়, কিন্তু একটু পরেই আবার আমার মাথায় অন্য ভাবনা খেলে গেল প্রস্ফুটিত ফুলে ফুলে ভরা উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলেই হয়ত আমার মনে হল যে ওই লাল হয়ে ওঠা জায়গাটা দুদিনের মধ্যে আরও ফুলে উঠবে, ফুলের মতো নিজেকে ছড়িয়ে দেবে এবং ফেটে যাবে আর তারপর প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে হোজা মারা যাবে। আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে জায়গাটা বদহজমের কারণেও ফুলে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু না, পোকার কামড়ের মতোই দেখতে লাগছে, ঠিক কোন্ পোকাটি কামড়েছে তাও এক্ষুনি সনাক্ত করে ফেলতে পারব বলে আমার মনে হল, ক্রান্তীয় জলবায়ুতে যেসব বিশাল বিশাল নিশাচর উড্ডুক্কু পোকাগুলোকে দেখা যায় এটি নিশ্চয় তাদেরই কোনো একটি হবে, কিন্তু সেই অশরীরীসদৃশ পোকাটির নাম আমার জিভের ডগায় কিছুতেই আর এল না।

রাতে খেতে বসে হোজা খোশমেজাজে থাকার ভান করল। সে মজা করতে লাগল, আমাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেল, কিন্তু কাজটা বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারল না। রাতের খাওয়া আমরা চুপচাপই সারলাম। বাতাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিথর ও নীরব রাত্রি আরও গভীর হতে হোজা বলল, 'আমার অস্বস্তি লাগছে। ভাবনাচিন্তাও কেমন যেন ভারী হয়ে উঠছে। চল, টেবিলে বসে লেখা যাক।' সেই মুহূর্তে একমাত্র এই উপায়েই সে তার মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত। কিন্তু লিখতে সে পারল না। আমি তৃপ্ত চিত্তে লিখে চললেও সে অলসভাবে বসে আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। 'তুমি কী লিখছ?' আমি তাকে পড়ে শোনালাম যে যন্ত্রবিদ্যা নিয়ে একবছর পড়াশুনার পরে ছুটিতে এক ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় আমি কত অধীর হয়ে উঠেছিলাম। তবে আমার বিদ্যালয় ও আমার বন্ধুদের আমি ভালোবাসতাম, ছোট্ট এক নদীর পাড়ে একাকী বসে বিদ্যালয় থেকে আনা একটা বই পড়তে পড়তে আমি তাদের অভাব কি পরিমাণে অনুভব করছিলাম তাও আমি তাকে পড়ে শোনালাম। সামান্য নীরবতার পরে কোনো গোপন কথা প্রকাশ করার ভঙ্গীতে হোজা হঠাৎ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেখানে লোকে কি সবসময়ই এরকম সুখে বাস করে?' আমি ভেবেছিলাম এই

প্রশ্ন করার জন্য হয়তো তক্ষুনি তার অনুতাপ হবে, কিন্তু সে শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েই রইল। আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'আমি সুখী ছিলাম!' তার মুখে ঈর্ষার ছায়া খেলে গেল, কিন্তু তা ভয় জাগানোর মতো ছিল না। দ্বিধার সঙ্গে থেমে থেমে সে তার কাহিনী শোনাতে লাগল।

এডির্নে শহরে ছিল হোজার বাস। হোজা যখন বারো বছরের বালক তখন এমন একটা সময় কেটেছিল যখন সে ও তার বোন তার আম্মুর সাথে নিত্য বেয়াজিত্ মসজিদের হাসপাতালে যেত। সেখানে তখন হোজার নানা পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিল। তার ভাই তখন এত ছোট যে সে হাঁটতেও পারত না। তাই তাকে প্রতিবেশীদের কাছে রেখে প্রতিদিন সকালবেলা তার আম্মু তাকে ও তার বোনকে এবং একপাত্র মিষ্টান্নদ্রব্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। পপলার গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে সেই যাত্রাটি সংক্ষিপ্ত হলেও আনন্দদায়ক ছিল। তার নানা তাদের গল্প বলত। গল্পগুলো হোজার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রিয় ছিল হাসপাতালটি। সেখানকার বিশাল বিশাল ঘর, বারান্দা ও আঙিনায় সে দৌড়ে বেড়াত। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত এক বিশাল গম্বুজে একদিন সে শুনতে পেল যে মানসিক রোগীদের জন্য বাজনা বাজানো হচ্ছে। এছাড়াও ছিল প্রবহমান জলধারার শব্দ। কয়েকটি ঘরে তো অদ্ভুত দর্শন সব চকচকে রঙিন বোতল সাজানো থাকত। আরেকবার তো সে হারিয়েও গেছিল, কাঁদতে শুরু করার পরে হাসপাতালের লোকজন তাকে নিয়ে হাসপাতালের প্রতিটি ঘরে ঘুরেছিল যতক্ষণ না তার নানা, আবদুল্লা এফেন্দির ঘর পাওয়া যায়। তার আম্মু কদাচিৎ কেঁদে ফেলত, কখনো বা মেয়ের সাথে সেও বৃদ্ধের গল্প মন দিয়ে শুনতে বসে যেত। তারপর তারা নানার ফেরত দেওয়া শূন্য পাত্র নিয়ে হাসপতাল থেকে বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু বাড়িতে পৌছানোর আগে আম্মু তাদেরকে হালুয়া কিনে দিত ও ফিসফিস করে বলত, 'কেউ দেখার আগে চল্ খেয়ে নি।' নদীর ধারে পপলার গাছের ছায়ায় ঘেরা এক গোপন স্থানে তারা গিয়ে হাজির হত, সেখানে কেউ তাদের দেখতে পেত না আর তারা পাড়ে বসে জলের উপরে পা দোলাতে দোলাতে হালুয়া খেত।

হোজার কথা শেষ হতেই নীরবতা নেমে এল। সেই নীরবতার প্রকোপে আমাদের অস্বস্তি বেড়ে গেল, আবার সৌভ্রাতৃত্বের এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতিও জেগে উঠল যা আমাদেরকে পরস্পরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এল। হোজা দীর্ঘক্ষণ ধরে উৎকণ্ঠার পরিবেশটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল। অনেক পরে আশপাশের কোনো একটি বাড়ির ভারী দরজায় যখন বেমক্কা দমাদ্দম ঘা পড়তে লাগল তখন সে বলল যে সেই হাসপাতালের রুগী ও তাদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত রঙীন বোতল, মাপদণ্ড প্রভৃতি দেখেই বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছিল। নানা মারা যাওয়ার পরে তারা আর সেখানে যায়নি, তবে হোজা সর্বদাই স্বপ্ন দেখত যে বড় হওয়ার পরে সে একা সেখানে আবার ফেরত যাবে। কিন্তু এডির্নের মধ্য দিয়ে প্রবহমান তুঞ্জা নদী কোনো এক বছর ন্যূনতম আগাম সতর্কতা ছাড়াই বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। রুগীদের সরিয়ে নেওয়া হল এবং ঘরগুলো নোংরা, থকথকে, পঙ্কিলজলে ভরে গেল। অবশেষে জল নামল বটে, কিন্তু সেই সুন্দর হাসপাতালটি বছরের পর বছর ধরে দুর্গন্ধযুক্ত কাদায় চাপা পড়ে রইল। সেই অভিশপ্ত থকথকে কাদাকে আর পরিষ্কার করা গেল না।

হোজা আবার চুপ করে যেতেই আমাদের ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তটি যেন হারিয়ে গেল। সে টেবিল থেকে উঠে পড়ল, ঘরের মধ্যে তার ছায়ার নড়াচড়া আমি আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তারপর টেবিলের মাঝখান থেকে লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে সে আমার পিছন গিয়ে দাঁড়ালো, ফলত হোজা বা তার ছায়া কাউকেই আমি আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার পিছন ফিরে দেখার ইচ্ছা হল কিন্তু ফিরলাম না, যেন কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। এক মুহূর্ত পরেই জামাকাপড় খোলার খসখসানি শুনে আমি সন্দিগ্ধচিত্তে পিছন ফিরলাম। আয়নার সামনে হোজা দাঁড়িয়েছিল, কোমরের উপর থেকে তার শরীর নিরাবরণ, লণ্ঠনের আলোয় সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের বুক ও পেট পরীক্ষা করছিল। 'হা ঈশ্বর,' সে বলল, 'এটা কী জাতীয় ব্রণ?' আমি চুপ করে রইলাম। 'এদিকে এসে এটা একবার দেখ তো,' আমি নড়লাম না। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এদিকে এস, আমি বলছি!' শাস্তির সম্ভাবনায় আশঙ্কিত ছাত্রের মতো ভয়ে ভয়ে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তার নগ্ন শরীরের এত কাছে এর আগে আমি আর কখনো আসিনি, তার নগ্নতা আমার ভাল লাগল না। প্রথমে আমি এটাই ভাবতে চাইছিলাম যে এই অপছন্দের কারণেই আমি তার দিকে অগ্রসর হতে পারছি না, কিন্তু আমি জানতাম যে আমি ব্রণটাকে ভয় পাচ্ছিলাম। হোজাও তা ভালই বুঝেছিল। তবু নিজের ভয়কে লুকোনোর চেষ্টায় আমি মাথাটাকে কাছে নিয়ে গেলাম ও বিড়বিড় করতে লাগলাম, ফোলা জায়গাটাকে চিকিৎসকের মতো ভান করে দেখতে লাগলাম। 'তুমি ভয় পাচ্ছ, তাই না?' অবশেষে হোজা বলল। আমি যে ভীত নই তা প্রমাণ করার চেষ্টায় মাথাটাকে আরও কাছে নিয়ে গেলাম। 'তোমার আশঙ্কা যে এই ফোলাটা প্লেগজনিতই,' আমি তার কথা না শোনার ভান করলাম। আমি তাকে এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এটা কোনো পোকার কামড়েরই ফল, সম্ভবত সেই একই পোকা যা একদা আমাকেও কোথায় যেন কামড়েছিল, কিন্তু পোকাটার নাম এবারও আমার মনে এল না। 'হাত দাও, দাও না!' হোজা বলল, 'স্পর্শ না করলে তুমি বুঝবে কী করে? ছুঁয়ে দেখো!' আমি যে হাত দেব না তা বুঝতে পারার পরে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফোলা জায়গাটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করার পরে আঙুলগুলো সে আমার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল। প্রবল বিতৃষ্ণায় আমাকে পিছিয়ে যেতে দেখে সে জোরে হেসে উঠল, একটা পোকার সামান্য কামড়কে ভয় পাওয়ায় সে আমাকে নিয়ে মজা করতে লাগল, কিন্তু সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। সম্পূর্ণ অন্য কোনো বিষয়ে যেন কথা বলছে এরকমভাবে সে হঠাৎই বলে উঠল, 'আমি মরতে ভয় পাই।' সেই স্বীকারোক্তিতে লজ্জার চেয়ে ক্রোধই ছিল বেশি, এমন ক্রোধ যা প্রতারিত মানুষের মনে জন্ম নেয়। 'এরকম কোনো ব্রণ তোমার হয়নি? তুমি নিশ্চিত? জামাটা এক্ষুনি খোল দেখি।' তার পীড়াপিড়ীতে বাধ্য হয়ে স্নানে অনিচ্ছুক শিশুর মতো আমি জামাটা খুলে ফেললাম। ঘরটা গরম হয়েছিল, জানালাটাও বন্ধ ছিল, তবু কোথা থেকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকছিল। আর সেই শীতলতাতেই আমার গা শিরশির করছিল কিনা তাও আমি ঠিক বলতে পারব না। না জানি আমায় কেমন দেখাবে এই সঙ্কোচে আমি আরশির থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমার শরীরের দিকে হোজা মাথাটা এগিয়ে নিয়ে আসায় আমি এবার আরশিতে তার মুখের তেরছা প্রতিফলন দেখতে পেলাম, তার বিশাল মাথাটা

সে আমার শরীরের আরও কাছে নিয়ে এল। সবাই বলে যে তার বিশাল মাথার সঙ্গে আমার মাথার সাদৃশ্য আছে। হঠাৎ আমার মনে হল যে সে বুঝি আমার মনোবলকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এসব করছে, অথচ উল্টোদিকে আমি কিন্তু এরকম কোনো চেষ্টাই কখনো করিনি। এতগুলো বছর ধরে তার শিক্ষক হিসেবেই আমি গর্ববোধ করে এসেছি। অবিশ্বাস্য হলেও এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল যে লণ্ঠনের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত দর্শন ওই দাড়িওয়ালা মাথাটা বোধহয় আমার রক্ত চুষে খেতে চাইছে! তবে এর থেকে শৈশবকালে শোনা ভয়ের গল্পগুলোই বোধহয় আমাকে বেশি প্রভাবিত করত। এসব যখন ভাবছি তখন হঠাৎই আমার পেটের উপর হোজার আঙুলের স্পর্শ পেলাম। আমার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছা হল কিছু একটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করি। 'তোমার কিছু নেই,' হোজা বলল। সে আমার পিছনে গেল এবং আমার বাহুমূল, গলা ও কানের পিছন দিক পরীক্ষা করে দেখল। 'এখানেও কিছু নেই, পোকাটা তোমাকে কামড়ায়নি বলেই মনে হয়।'

কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে এসে হোজা আমার পাশে দাঁড়াল। তার আচরণ দেখে মনে হল সে যেন আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু যে আমার গোপনতম কথাটিও জানে। দুদিক থেকেই গ্রীবার পিছনে আঙুলের চাপ দিয়ে সে আমাকে নিজের দিকে টানল, 'এস, একসাথে আরশির সামনে দাঁড়ানো যাক।' আমি আরশিতে চোখ রাখলাম এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে কি ভীষণ মিল তা লণ্ঠনের আলোয় আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম। আমার মনে পড়ল সাদিক পাশার ঘরের বাইরে অপেক্ষা করাকালীন তাকে প্রথম দেখে আমি কীরকম হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি এমন একজনকে দেখেছিলাম যে আসলে আমিই, আর এখন আমার মনে হয় যে সেও হল আমার মতোই কেউ। আমরা দু'জনে একই ব্যক্তি! এই উপলব্ধি এক অবশ্যম্ভাবী সত্য হিসেবেই আমার কাছে প্রতিভাত হল। আমার মনে হল যে আমি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি, সামান্যতম নড়াচড়ারও যেন কোনো সুযোগ নেই, তাই নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে, এই আমি যে আমিই তা একবার যাচাই করে নেওয়ার তাগিদে আমি একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করলাম। আমি দ্রুত চুলের মধ্যে হাত বোলালাম, কিন্তু সে আমার ভঙ্গীমা এত নিখুঁতভাবে অনুকরণ করল যে আরশির প্রতিফলনে আমাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের মধ্যে কোনো চ্যুতি ধরা পড়ল না। সে আমার বাকি অঙ্গভঙ্গীকেও অনুকরণ করল, আমার মতো করে মাথা দোলাল, এমনকি আমার মুখে ফুটে ওঠা আতঙ্ককেও সে অনুকরণ করল। আরশিতে সেই আতঙ্কের প্রতিফলন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না আবার আতঙ্কে প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ায় তার থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও আমার ছিল না। কোনো শিশু তার বন্ধুর কথা ও নড়াচড়াকে নকল করে যেমন আনন্দিত হয় হোজাও তেমনি আনন্দিত হয়ে উঠল। সে চীৎকার করে জানিয়ে দিল যে আমরা মারাও যাব একসাথে। আমি ভাবলাম, একি নির্বোধের মতো কথা। কিন্তু ভয় আমারও লাগছিল। তার সঙ্গে কাটানো সকল রাত্রির মধ্যে সেই রাত্রিই ছিল ভয়ংকরতম।

তারপরই সে দাবী করল যে সে নিজেও প্লেগ নিয়ে বরাবরই আতঙ্কিত ছিল। তার প্রতিটি কাজেরই উদ্দেশ্য ছিল নাকি আমাকে পরীক্ষা করা, যেমন সাদিক পাশার জল্লাদরা আমাকে মারার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে আমাকে পরীক্ষা করছিল,

আবার লোকে যখন আমাদেরকে একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত তখনও সে নাকি আমাকে যাচাই করত। এক মুহূর্ত আগেই সে আমার নড়াচড়াকে নকল করছিল, এবার সে এও জানিয়ে দিল যে সে আমার মনেরও দখল নিয়ে নিয়েছে! এখন আমার যে কোনোপ্রকার ভাবনার কথাই সে জানে এবং আমি যা জানি তাই নিয়েই সে বর্তমানে ভাবছে! সে আমার কাছে জানতে চাইল যে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কী ভাবছি; তখন তার কথা ছাড়া আমার মাথায় আর কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি বললাম যে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার উত্তরে সে কান দিল না, সে নিজেই বকে যেতে লাগল। কোনো কিছু আবিষ্কারের জন্য নয়, তার কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল আমাকে ভয় পাওয়ানো, নিজের আতঙ্ককে ভুলে থাকা এবং সেই আতঙ্কের অংশভাগ আমার উপরেও চাপিয়ে দেওয়া। আমি অনুভব করলাম যে নিঃসঙ্গতা তার উপর যতই ভারী হয়ে চেপে বসছে ততই সে আরও বেশি করে আমার ক্ষতি করতে চাইছে। আমার ও তার নিজের মুখের উপর আঙুল বোলাতে বোলাতে আমাদের অপার্থিব সাদৃশ্য থেকে উদ্ভূত আতঙ্কের সাহায্যে সে আমাকে সম্মোহিত করতে চাইছিল। এই কাজ করতে গিয়ে সে নিজেই আমার থেকে অধিকতর উত্তেজিত ও অস্থির হয়ে উঠছিল আর আমার ততই মনে হচ্ছিল যে সে অশুভ কিছু একটা করতে চাইছে। আমি নিজের মনকে বোঝাচ্ছিলাম যে আমার গ্রীবা চেপে ধরে আমাকে আরশির সামনে সে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কারণ তার মন অশুভ কাজটা করতে সায় দিচ্ছে না। তবে কাজটা যে তার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব বা করতে গেলে সে অসহায় বোধ করবে এমনটাও কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল না। হোজাই ঠিক, সে যা বলেছিল আমিও তো তাই বলতে চেয়েছিলাম, তার করা কাজগুলো আমিও করতে চেয়েছিলাম। আমার তাকে দেখে হিংসা হচ্ছিল কারণ সে যা করতে পারছে আমি তা করতে পারছি না। প্লেগ ও আরশির প্রতি আতঙ্কটাকেও সে কাজে লাগাতে পারছে।

আমার আতঙ্ক ছিল যথেষ্ট তীব্র আর এই বিশ্বাসও আমার জন্মেছিল যে নিজের সম্বন্ধে অধুনা-অজ্ঞাত কিছু ব্যাপার আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম। তথাপি এই অনুভূতিটা আমি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না যে এটি আদতে একটি খেলা মাত্র। আমার গ্রীবার উপর চেপে বসা তার আঙুলগুলো শিথিল হয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি আরশির সামনে থেকে সরে এলাম না। 'এখন আমি তোমার মতো,' সে বলল। 'তোমার ভয় আমার জানা। আমি তুমি হয়ে গেছি।' আমি বুঝতে পারলাম সে কী বলতে চাইছে, কিন্তু নিজেকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম যে এই ঘোষণা নিরর্থক ও শিশুসুলভ, যদিও তার অংশবিশেষের সত্যতা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। সে দাবী করল যে সে এখন আমার মতো করেই দুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছে। 'তারা,' সে আবার বলতে শুরু করল, অবশেষে এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে যে কেমনভাবে 'তারা' ভাবে 'তারা' কী অনুভব করে। লণ্ঠনের শিখায় টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য বস্তুর উপর এক অদ্ভুত আলোআঁধারির সৃষ্টি হয়েছিল। আরশির সীমানা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি সেই আলোছায়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং তার সঙ্গে তার কথাও চলতে লাগল। সে বলল যে সে এখন এমন অনেক কিছু বলতে পারে যা সে আগে পারত না কারণ আগে সে তাদেরকে দেখতে পেত না, কিন্তু আমার মনে হল যে তার বক্তব্যে ভুল আছে শব্দগুলো তো সেই একই

আছে, বস্তুগুলোরও কোনো রকমফের ঘটেনি। একমাত্র নতুন জিনিস হল তার ভয়, না তাও নয়; নতুন হল ভয় সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার রূপ। তবে আমার এও মনে হল, যদিও এরূপ মনে হওয়ার কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না, যে আরশির সামনে দাঁড়ালে এটা সে নিজের উপর চাপিয়ে নেয়, এটা তার একটা নতুন ফন্দি। অনিচ্ছাসহকারে এই খেলাকে দূরে সরিয়ে রেখে তার মন আবার সেই লাল রঙের ব্রুণে ফিরে এল, সে জিজ্ঞেস করল, এটা কি পোকার কামড় না প্লেগ?

আমি যেখানে থেমেছিলাম ঠিক সেখান থেকেই শুরু করতে সে কতটা ব্যগ্র তাই নিয়ে সে আরও কিছুক্ষণ বলে গেল। আমরা তখনও আরশির সামনে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে আমার জায়গা নিতে উদ্যত ছিল আর আমি তার, এবং এই ভূমিকা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ছিল নিজেদের জামাকাপড় পরস্পরের সঙ্গে বদলে ফেলা, তার দাড়িটি কেটে ফেলা ও আমার দাড়ি বাড়ানো। রূপ বদলের এই ভাবনাটাই আরশিতে প্রতিফলিত আমাদের সাদৃশ্যকে আরও ভয়ংকর করে তুলল। ভূমিকা বদলের পরে আমি তাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করব এই কথা তার মুখে শুনে আমার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। আমার বদলে সে আমার দেশে ফিরে গিয়ে কী কী করবে খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাই সে বলতে লাগল। আমি এটা অনুভব করে আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম যে আমার শৈশব ও যৌবন সম্পর্কে আমার বলা ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিও সে মনে রেখেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এক অদ্ভুত কল্পনার জগত তৈরি করে নিয়েছে। নিজের জীবনের উপর আর আমার নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তার হাতে পড়ে আমার জীবন অন্যত্র ধাবিত হচ্ছিল এবং আমি অনুভব করলাম যে আমার সঙ্গে যা ঘটছে তা স্বপ্নের মতো বাইরে থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখে যাওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমি হিসেবে আমার দেশে তার গমন ও সেখানে তার যাপনীয় জীবনযাপন এই উভয় ভাবনার মধ্যেই এত বিচিত্র ছেলেমানুষী ছিল যে তা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না, কিন্তু একই সঙ্গে তার কল্পনায় যুক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থিতি দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে এমনটাও হতে পারত, এভাবেও আমার জীবনটা যাপন করা যেতে পারত। তারপর হঠাৎই আমার উপলব্ধি হল যে হোজার জীবন সম্বন্ধে এই প্রথম এক গভীরতর সত্য আমি আঁচ করতে পেরেছি, কিন্তু সেটা যে কী তা তৎক্ষণাৎ বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এত বছরের তীব্র আকুতির পুরনো জগতে ফিরে গিয়ে আমি কী কী করব তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে আমি শুনতে লাগলাম এবং শুনতে শুনতে প্লেগের ভয়টা বেমালুম ভুলে গেলাম।

কিন্তু প্লেগের ভয় থেকে মুক্তি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। হোজা এবার জানতে চাইল যে তার জায়গা নেওয়ার পর আমি কী করব। আমি তখন মনকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমাদের দুজনকে একইরকম দেখতে নয় এবং হোজার শরীরের ওই অংশটা কোনো পোকার কামড়েই ফুলে গিয়ে থাকবে। অদ্ভুত ভঙ্গীমায় স্থির হয়ে এসব ভাবতে ভাবতে আমার স্নায়ু এতই বিবশ হয়ে পড়েছিল যে আমার মাথায় কিছুই এল না। সে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় আমার মনে পড়ল যে আমি একদা দেশে ফেরার পর স্মৃতিকথা লেখার কথা ভেবেছিলাম। আমি তাকে বললাম

যে আমি তার অভিযানগুলো নিয়ে কোনোদিন হয়তো একটি সুন্দর কাহিনী লিখতে পারি, কিন্তু সে বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল। সে আমাকে যতটা ভালো চিনত আমি তাকে ততটা ভালো চিনতাম না—প্রকৃতপক্ষে মোটেই চিনতাম না! আমাকে আরশির সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে এবার সে একা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো : সে আমার জায়গা নেওয়ার পরে আমার কী হবে তা সে-ই ঠিক করে দেবে। সে বলল যে শরীরের ওই জায়গাটা প্লেগের ফলেই ফুলেছে, আমি শীঘ্রই মারা যাব, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে কি ভয়ংকর কষ্ট সহ্য করতে হবে তা বর্ণনা করল, অনাগতর প্রতি অজ্ঞানতা হেতু আমি আতঙ্কের জন্য প্রস্তুত থাকব না অথচ সেই আতঙ্ক মৃত্যুর থেকেও ভয়ানক হবে। রোগের যন্ত্রণায় আমি কীভাবে বিদ্ধ হব তা বলতে বলতে হোজা আরশি থেকে সরে দাঁড়ালো। আমি আবার যখন তার দিকে তাকালাম তখন সে মেঝেতে পাতা নিজের এলোমেলো বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, এবং আমার যন্ত্রণার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। তার হাতটা পেটের উপর রাখা, আমার মনে হল যে নিজের বর্ণিত যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করার জন্যই যেন সে পেটের উপর হাত দিয়ে রেখেছে। ঠিক এই সময় সে আমাকে ডাকল, আমি কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে হাজির হলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য আমার আক্ষেপ হল কারণ সে আবার আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, আমার এবার মনে হতে লাগল যে ওই ফোলাটা কোনো পোকার কামড়েরই ফলশ্রুতি, কিন্তু তবুও আমার ভয় গেল না।

এভাবেই গোটা রাত্রিটা কাটল, রোগ ও রোগজনিত আতঙ্ক আমার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা সে চালিয়ে গেল এবং বার বার বলতে লাগল যে আমি হলাম সে ও সে হল আমি। আমার মনে হল যে সে নিজের থেকে বেরিয়ে এসে দূর থেকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে উপভোগ করে বলেই এরূপ আচরণ করছে। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার জন্য মানুষ যেমন অনেক সময় ছটফট করে আমিও তেমনি নিজেকে বারবার বোঝাতে লাগলাম যে এ হল একটা খেলা, কারণ 'খেলা' শব্দটা সে নিজেই ব্যবহার করেছিল। তবে সে প্রচণ্ড ঘামছিল, উষ্ণ ঘরে বসে হানিকারক, শ্বাসরোধী চিন্তার চেয়ে শারীরিক অসুস্থতাই বোধহয় তার অত্যধিক ঘামের জন্য বেশি দায়ী ছিল।

সূর্যোদয়ের পরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে কথা বলতেই থাকল! নক্ষত্র ও মৃত্যু, তার মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী, সুলতানের মূর্খামি, তার অন্য ব্যক্তি হতে চাওয়ার ইচ্ছা, সর্বোপরি, তার নিজস্ব প্রিয় নির্বোধদের, 'আমাদের' ও 'তাদের' প্রতি তার অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি। আমি আর সেসব শুনতে পারছিলাম না, তাই বাগানে বেরিয়ে গেলাম। বহু পুরনো কোনো একটি বইতে পড়া অমরত্বের ধারণাটা, কি জানি কেন, আমার মাথায় ঘুরছিল, বাইরে লেবুগাছের ডাল থেকে ডালে চড়ুইয়ের ওড়াওড়ি ও তাদের কিচিরমিচির ছাড়া আর কোনো প্রাণের স্পন্দন ছিল না। সেই স্তব্ধতা কি প্রচণ্ড বিস্ময়কর! ইস্তাম্বুলের সেইসব বাড়ির কথা মনে এল যেখানে মুমূর্ষ প্লেগ রোগীরা মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। হোজার রোগটা যদি প্লেগই হয় তবে তার না মরা পর্যন্ত, অন্ততপক্ষে ওই লালচে ফোলাটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত

ব্যাপারটা এভাবেই চলতে থাকবে। এতক্ষণে আমি এটা বুঝে নিয়েছিলাম যে এই বাড়িতে আর বেশিদিন আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। ঘরের ভিতরে ফিরে যাওয়ার পরও পালিয়ে যাওয়ার বা আত্মগোপন করে থাকার মতো কোনো জায়গার কথা আমার মাথায় এল না। আমি কেবল হোজা এবং প্লেগের থেকে অনেক দূরের কোনো জায়গার কথা ভাবছিলাম। ব্যাগের মধ্যে অল্প কিছু জামাকাপড় ভরে নিতে নিতে আমি শুধু একটা ব্যাপারেই নিশ্চিত হলাম যে সেই জায়গাটা যথেষ্ট কাছেই হতে হবে যাতে আমি ধরা পড়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারি।

## ৭

হোজার পকেট থেকে সুযোগ পেলেই অল্পস্বল্প পয়সা সরাতাম, সঙ্গে ছিল এদিক-ওদিক থেকে টুকটাক উপার্জন। ফলে আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করে ফেলেছিলাম। একটা দেরাজে বেশ কিছু বই ছিল যাদের দিকে হোজা আর ফিরেও তাকাত না। তাদের মাঝে একটি মোজার মধ্যে সেই অর্থ আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আমি সেই অর্থ নিয়ে নিলাম এবং তারপর কৌতূহলের বশে হোজার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হোজা ঘুমোচ্ছিল আর তার সারা শরীর ঘামে জবজব করছিল। লণ্ঠনের আলোয় আরশিটির ক্ষুদ্রায়তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের মোহময় সাদৃশ্যকে প্রতিফলনের মাধ্যমে এই ছোট্ট আরশিটিই আমাকে রাতভর আতঙ্কিত করে রেখেছিল, অথচ ওই সাদৃশ্যকে আমি কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি! আমি কোনোকিছু স্পর্শ না করে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গায়ে মৃদু বাতাসের স্পর্শ লাগছিল। আমার একটু হাত ধোওয়ার ইচ্ছা হল। আমি জানতাম আমি কোথায় যাবো, নিজেকে বেশ তৃপ্ত বলে মনে হচ্ছিল। ভোরের নীরবতায় ঝরনার জলে হাত ধুয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে পাথর থেকে সমুদ্রের দিকে নেমে যেতে যেতে আমি সময়টাকে উপভোগ করছিলাম। দূর থেকে সোনালি শিঙা চোখে পড়ছিল।

হেয়বেলি দ্বীপের কথা এক নবীন সন্ন্যাসীর কাছে আমি প্রথম শুনেছিলাম। হেয়বেলি থেকেই ইস্তাম্বুলে আগত সেই সন্ন্যাসীটির সঙ্গে গালাতার ইউরোপীয় অংশে আমার দেখা হয়েছিল। দ্বীপের সৌন্দর্য সম্পর্কে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আমার উপরে নিশ্চয় প্রভাব বিস্তার করে থাকবে, কারণ এলাকা ত্যাগের সময়ই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমি হেয়বেলিতেই যাব।

ওই দ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব মাঝিমাল্লা ও জেলেরাই অবিশ্বাস্য অঙ্ক দাবি করল। তারা নিশ্চয় আমাকে পলাতক বলে বুঝতে পেরেছে এবং হোজার পাঠানো লোকেদের কাছে আমার কথা বলে দেবে এই ভেবে আমি একটু দমে গেলাম। পরে আমি ভাবলাম যে তারা প্লেগের আতঙ্কের জন্য ঘৃণ্য খ্রীস্টানদের দায়ী করে ও তাদের নিশ্চয় এভাবেই ভয় দেখায়। বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম না, তাই দ্বিতীয় যে মাঝিটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম তার সাথেই আমি দরদস্তুর ঠিক করে ফেললাম। লোকটি খুব একটা শক্তিশালী ছিল না, তার উপর দাঁড় টানার চেয়ে প্লেগ এবং যে পাপের শাস্তিস্বরূপ প্লেগ প্রেরিত হয়েছে সেই পাপ নিয়ে কথা বলতেই সে

বেশি আগ্রহী ছিল। ওই দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে যে প্লেগের হাত থেকে বাঁচা যাবে না তাও সে বেশ জোর গলায় জানিয়ে দিল। তার কথা শুনে বোঝা গেল যে সে আমার মতোই ভীত। যাত্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগল।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে তবেই আমি দ্বীপবাসের দিনগুলোকে সুখকর বলে ভাবতে পেরেছিলাম। সেই দ্বীপে এক গ্রীসদেশীয় জেলের বাড়িতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম, তবে আমি তার দৃষ্টির অন্তরালে থাকারই চেষ্টা করতাম কারণ সেখানে নিজেকে আমার কোনোমতেই নিরাপদ বলে মনে হত না। কখনো কখনো আমার মনে হত যে হোজা বুঝি মারাই গেছে, আবার কখনো কখনো ভাবতাম যে সে নিশ্চয় আমার সন্ধানে লোক পাঠাবে। আরও অনেক খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীই প্লেগের কবল থেকে বাঁচার জন্য সেই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু আমি চাইতাম না যে এমনকি তারাও আমায় লক্ষ্য করুক।

প্রতিদিন সকালে আমি জেলেটির সঙ্গে দরিয়ায় ভেসে পড়তাম আর সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসতাম। ওই সময় বেশ কিছুদিন আমি গলদা চিংড়ি ও কাঁকড়া ধরার কাজ করেছিলাম। মাছ ধরার পক্ষে আবহাওয়া খুব খারাপ থাকলে দ্বীপের মধ্যেই এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াতাম, আবার কখনো কখনো মঠের বাগানে গিয়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জের তলায় শান্তির ঘুম দিতাম। সেখানে এক ডুমুরগাছের ডালপালায় ভর করে একটি লতাবিতান বিস্তার লাভ করেছিল। আবহাওয়া ভালো থাকলে তার ছায়ায় বসে হাজিয়া সোফিয়া পর্যন্ত দেখা যেত। আমি তার ছায়ায় বসে ইস্তাম্বুলের দিকে দৃষ্টি মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকতাম। সেরকমই এক স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম যে আমি নৌকা বেয়ে দ্বীপের দিকে আসছি আর নৌকার চারপাশে অসংখ্য ডলফিনের সঙ্গে হোজাও সাঁতার কাটছে আর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়ে তাদের কাছে আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছে। আরেকবার স্বপ্নে আমি আমার মাকে ডলফিনদের সঙ্গে দেখেছিলাম, আমার বিলম্বের জন্য তারা আমায় তিরস্কার করছিল। এরপর মুখের উপর রোদ এসে পড়ত আর ঘামে ভিজে গিয়ে আমি জেগে যেতাম। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই আমি আবার ওই স্বপ্নের দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাইতাম, কিন্তু তা আর হত না। আমি তখন আবার নানান ভাবনায় ডুবে যেতে চাইতাম, আমি কল্পনা করতাম যে হোজা মারা গেছে, তার মৃতদেহ আমার ছেড়ে আসা শূন্য ঘরের ভিতরে পড়ে রয়েছে, তার অন্ত্যেষ্টিতে কেউ হাজির হয়নি। আমি যেন এমনকি তার অন্তিমক্রিয়ার সময়কার নীরবতাকেও অনুভব করতে পারতাম। এছাড়াও আমার মনে আসত তার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, আনন্দ বা বিরক্তি ও রাগবশত করা একাধিক উদ্ভাবনের কথা, সুলতান ও তার পশুদের কথা। এসব দিবাস্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য এইসময় গলদা চিংড়ি ও কাঁকড়াগুলো নৃত্য শুরু করত আর আমি তাদের মাজা ভেঙ্গে দিতাম।

আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে আজ হোক বা কাল আমি নিজের দেশে ফিরে যেতে পারব। তার জন্য কেবল উন্মুক্ত দ্বীপের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হত, কিন্তু হোজাকে ভোলা তার চেয়েও বেশী জরুরী ছিল কারণ আমি নিজের অজান্তেই বিগত ঘটনাবলী ও স্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত ও প্ররোচিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সঙ্গে এত সাদৃশ্য যে মানুষটির তাকে পরিত্যাগ করে চলে আসার

জন্য আমি তখন নিজেকে কেবল দোষারোপ করতে বাকি রেখেছিলাম। এখনকার মতো তখনো আমি আকুল হয়ে তার সঙ্গ প্রত্যাশা করছিলাম, তার ও আমার সাদৃশ্য স্মৃতিতে যতটা ধরা ছিল বাস্তবেও কি ততটাই ছিল নাকি আমি নিজেকে বোকা বানাচ্ছিলাম? যদিও আমি তাকে প্রায়শই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতাম তবু তখন মনে হল যে গত এগারো বছরে আমি তার মুখের দিকে যেন ভালো করে তাকাইনি। আমার এমনকি এমনও ইচ্ছা হল যে ইস্তাম্বুল গিয়ে তার মৃতদেহটিকে শেষবারের মতো দেখে আসি। অ মি বুঝতে পারলাম যে স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে আগে নিজেকে একথা বোঝাতে হবে যে আমাদের উভয়ের এই অস্বাভাবিক সাদৃশ্য আসলে এক ভয়ংকর দৃষ্টি ও স্মৃতিভ্রম যা ভুলে যাওয়াই ভালো এবং সেই বিস্মরণের সঙ্গে আমাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে।

সৌভাগ্যবশত তার সঙ্গে আমাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হল না। হঠাৎই একদিন হোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। জেলেটির পিছনের উঠোনে আমি লম্বা হয়ে শুয়েছিলাম আর বন্ধ চোখে রোদ এসে পড়ছিল, এই সময় আমি ছায়ার উপস্থিতি টের পেলাম। মুখে হাসি নিয়ে হোজা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সে হাসিতে জয়ীর গর্ব নয়, ভালোবাসার স্পর্শ ছিল। আমার নিজেকে হঠাৎ খুব নিরাপদ বলে মনে হল, সেই নিরাপত্তার বোধ এতই তীব্র ছিল যে তা আমাকে সচকিত করে তুলল। আমি বোধহয় মনে মনে এই পরিণতিরই অপেক্ষা করছিলাম কারণ তৎক্ষণাৎ আমার মনে অনুগত কিন্তু অলস দাসের অপরাধবোধ জেগে উঠল। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে আমার মনে হোজার প্রতি ঘৃণা জেগে উঠবে কি, আমি কঠোর আত্মসমালোচনায় নিজেকে বিদ্ধ করতে লাগলাম! জেলেটির পাওনাগণ্ডাও হোজাই মিটিয়ে দিল। দুজন লোককে সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, ফলে দুই দাঁড়ের সাহায্যে আমরা দ্রুত ফিরে আসতে পারলাম। রাত নামার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম, তবে বাড়িতে বাড়ির ঘরোয়া গন্ধটা ছিল না আর আরশিটাকেও দেওয়াল থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল।

পরদিন সকালে হোজা আমার মুখোমুখি হল  আমার অপরাধ বড় সাংঘাতিক। কেবল পালিয়ে যাওয়াই নয়, পোকার কামড়কে প্লেগজনিত ফোলা ভেবে তাকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সে ছটফট করছে, কিন্তু এখন শাস্তিদানের উপযুক্ত সময় নয়। সে খোলাসা করে জানালো যে অবশেষে গত সপ্তাহে তাকে ডেকে সুলতান জানতে চেয়েছেন যে এই প্লেগের আক্রমণ শেষ হতে হতে আরও কত মানুষের প্রাণ যাবে এবং তার নিজের জীবনের কোনো আশঙ্কা আছে কি না। প্রবল রোমাঞ্চিত হোজা কোনোমতে পাশ-কাটানো জবাব দিয়ে এসেছে কারণ সেদিন সে প্রস্তুত ছিল না, তবে নক্ষত্র গণনার সাহায্যে ওইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করার জন্য সে সময় চেয়ে নিয়ে এসেছে। আনন্দে অধীর হয়ে সে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরেছিল, কিন্তু সুলতানের আগ্রহকে নিজের সুবিধার্থে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিল না। তাই সে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে বলে ঠিক করেছিল।

আমি যে ওই দ্বীপে রয়েছি তা হোজা অনেক আগেই জানতে পেরে গিয়েছিল। ঠান্ডা লেগে কাবু হয়ে পড়ায় আমি যাওয়ার তিন দিন পর থেকে সে আমার খোঁজ শুরু

করে, জেলেদের কাছে আমার সন্ধান পেতে তার দেরি হয়নি এবং তারপরে একটু হাত উপুড় করতেই সেই বাচাল মাঝিটি তাকে জানিয়ে দেয় যে সে আমাকে হেয়বেলিতে ছেড়ে এসেছে। হোজা জানত যে ওই দ্বীপ থেকে আর কোথাও আমি যেতে পারব না, তাই তখনই আমার পিছু নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। সুলতানের সঙ্গে আগামী সাক্ষাৎটিকে তার জীবনের এক মহার্ঘ সুযোগ বলে যখন সে বর্ণনা করল তখন আমি তার সাথে একমত হলাম। সে নির্দ্বিধায় একথাও জানিয়ে দিল যে আমার জ্ঞান তার প্রয়োজনে লাগবে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম। হোজার প্রত্যয়ী আচরণ দেখে ভালই বোঝা যাচ্ছিল যে সে নিজের চাহিদা সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে আগে অল্পই দেখেছি, তাই এখন তা দেখে আমার আনন্দ হল। আমরা জানতাম যে পরের দিন আবার তার ডাক পড়বে, তাই ঠিক করে নিলাম যে বেশি তথ্য দেওয়া উচিত হবে না এবং যা ঘটবে বলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় কেবল তাই উল্লেখ করা হবে। হোজার বোধের তীক্ষ্ণতাকে আমি বরাবরই তারিফ করে এসেছ, তার ফলেই হোজা বলতে পারল, 'ভবিষ্যদ্বাণী হল একপ্রকার ভাঁড়ামি, কিন্তু নির্বোধদের প্রভাবিত করার কাজে তা ভালই ব্যবহার করা যেতে পারে।' আমি তাকে বোঝাচ্ছিলাম যে প্লেগের মতো বিপর্যয়কে কেবল সতর্কতামূলক স্বাস্থ্যবিধির মাধ্যমেই ঠেকানো সম্ভব, সে আমার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হল বলেই মনে হল। বিপর্যয় ঈশ্বরের ইচ্ছা—এই মতকে সে আমার মতো অস্বীকার করল না বটে, কিন্তু তার মতেরও বিশেষ জোর ছিল না আর তাই সে মেনে নিল যে এমনকি আমাদের মতো মরণশীলরাও ঈশ্বরের গর্বে আঘাত না করেই নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে। খলিফা ওমর কি এবু উবেয়দের বাহিনীকে প্লেগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে সিরিয়া থেকে মদিনায় ডেকে আনেননি? হোজা সুলতানকে এই পরামর্শ দেবে বলে ঠিক হল যে তিনি যেন নিজের সুরক্ষার জন্যই অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলেন। সুলতানকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে সুরক্ষা নিতে প্ররোচিত করার কথা আমরা যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু তাতে বিপদ ছিল। মৃত্যুর অতিরঞ্জিত, কাব্যিক বর্ণনার সাহায্যে সুলতানকে ভয় দেখালেই শুধু হবে না, এটাও মাথায় রাখতে হবে যে হোজার কথা যদি সুলতানকে প্রভাবিত করলেও তার আতঙ্ক ভাগ করে নেওয়ার জন্য ও সেই আতঙ্ক জয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য তার চারপাশে নির্বোধদের ভিড় মজুত থাকবে। পরবর্তীকালে এসব নীতিহীন নির্বোধগুলো হোজার বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনতে পারে। তাই সুলতানকে বলার জন্য আমার সাহিত্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমরা একটি গল্প বানালাম।

প্লেগের সমাপ্তিলগ্ন নির্ধারণ করাই হোজার কাছে সবচেয়ে সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে মৃত্যুর দৈনন্দিন সংখ্যা নিয়েই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। হোজাকে আমার মত জানালাম, কিন্তু সে আমার কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিল বলে মনে হল না, তবে পরিসংখ্যান জানার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপনে রেখে সেই ব্যাপারে সুলতানের সাহায্য চাইতে সে রাজি হল। আমি সংখ্যাতত্ত্বে বিশেষ বিশ্বাসী নই, কিন্তু আমরা নিরুপায়, আমাদের হাত বাঁধা।

পরদিন সকালে হোজা প্রাসাদে গেল আর আমি প্লেগাক্রান্ত শহরের পথে বেরিয়ে পড়লাম। প্লেগ সম্পর্কে ভয় আমার আগের মতোই ছিল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় চলমানতা এবং এই দুনিয়া থেকে স্বল্প হলেও কিছু একটা আদায় করে নেওয়ার সর্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষা দেখে আমার মাথা যেন ঘুরে গেল। গ্রীষ্মের সেই দিনটিতে শীতল, ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। মৃত ও মুমূর্ষুদের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলতে চলতে আমি অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে আবার কত বছর বাদ আমি জীবনের প্রতি এত তীব্র পরিমাণে ভালবাসা অনুভব করছি। আমি মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম, শবাধারগুলোর সংখ্যা একটি কাগজের টুকরোয় লিখে নিলাম এবং আশপাশের এলাকায় হাঁটতে হাঁটতে চারপাশের দৃশ্য ও মৃতের সংখ্যার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিলাম। তবে চারপাশের বাড়িঘর, মানুষজন, ভীড়, হর্ষোৎফুল্লতা, দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে থেকে কোনো অর্থ খুঁজে বার করা সহজ ছিল না, অন্যদিকে অদ্ভুত শোনালেও এটাই ঘটনা ছিল যে আমার চোখ পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাসকারী মানুষের জীবনের আনন্দ, অসহায়তা, উদাসীনতা প্রভৃতির অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

দুপুরের দিকে সোনালী শিঙার অপর পারে গালাতার ইউরোপীয় অংশে গিয়ে পৌঁছলাম। মানুষের ভীড় ও মৃতদেহের সারি দেখে নেশাগ্রস্তের মতো লাগছিল। কুণ্ঠিতভাবে ধূমপান করতে করতে আমি জাহাজঘাটার আনাচেকানাচে, ছোটখাটো কফির দোকান থেকে শুরু করে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পুরো ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার চেষ্টায় নিতান্তই সাধারণ, ছোট্ট একটি দোকানে আমি খেয়েও নিলাম। কোনো একটি সিদ্ধান্তে যাতে পৌঁছতে পারি তাই আমি নিজের মনে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি তথ্যও গেঁথে নিচ্ছিলাম। গোধূলি পার করে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরে আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং হোজার কাছ থেকে প্রাসাদের খবর শুনলাম।

সেখানে সবকিছু ঠিকঠাকই এগিয়েছে। আমাদের উদ্ভাবিত গল্পটি সুলতানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্লেগ শয়তানের মতো মনুষ্যরূপ ধারণ করে তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে চাইছে, এই বক্তব্যটি তিনি ভালই গ্রহণ করেছেন। তিনি ঠিক করে নিয়েছেন যে প্রাসাদে আগন্তুকদের আর প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের উপর কঠোর নজরদারি জারি করা হবে। প্লেগের সমাপ্তি কখন ও কীভাবে ঘটবে তা হোজাকে জিজ্ঞেস করাতে সে এমন কথার জটাজাল সৃষ্টি করেছিল যে সুলতান আতঙ্কিত হয়ে বলে বসলেন যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে মৃত্যুদূত আজরায়েল মাতালের মতো শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার চোখে যে চোখ রাখছে তার দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছে ও টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হোজা দ্রুত তাকে শুধরে দিল, আজরায়েল নয়, লোভ দেখিয়ে মানুষকে মৃত্যুর পথে চালিত করে শয়তান; আর সে মোটেই মাতাল নয়, বরং অসম্ভব ধূর্ত। আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক হোজা একথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিল যে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা নিতান্তই জরুরী এবং প্লেগ কখন এই শহরকে নীরবে পরিত্যাগ করে যাবে তা বোঝার জন্য তার গতিপ্রকৃতির উপর নজর রাখা প্রয়োজন। সুলতানের পারিষদদের মধ্যে কেউ কেউ বলল বটে যে প্লেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আদতে ঈশ্বরবিরোধিতারই নামান্তর, কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। পরে তিনি তার

জীবজন্তুদের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন; প্লেগ নামক শয়াতানটি কি তার বাজপাখী, সিংহ বা বাঁনরদেরও ক্ষতি করতে পারে? হোজা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যে শয়তান মানুষের কাছে যেমন মানুষের বেশে এসেছে জীবজন্তুদের কাছে তেমনি সে আসে ইঁদুরের বেশে। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে প্লেগের আঁচ পড়েনি এমন কোনো বহু দূরবর্তী শহর থেকে পাঁচশো বিড়াল আনা হোক এবং হোজাকে তার চাহিদা মতো লোক সরবরাহ করা হোক।

আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করার জন্য বারোজন লোক দেওয়া হল। আমরা তিলেকমাত্র বিলম্ব না করে তাদেরকে ইস্তাম্বুলের চার কোণে ছড়িয়ে দিলাম এবং মৃতের সংখ্যা ও অন্য যা কিছু নজরে পড়বে তা সবই আমাদের জানাতে নির্দেশ দিলাম। আমি বই দেখে দেখে ইস্তাম্বুলের একটি চলনসই মানচিত্র এঁকেছিলাম। রাতে সেটিকে টেবিলের উপর বিছিয়ে তাতে যখন প্লেগকবলিত স্থানগুলো চিহ্নিত করছিলাম তখন আমাদের মনে আতঙ্ক ও আনন্দ উভয়ের উপস্থিতিই টের পেলাম। সুলতানের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করার কথা ছিল তার খসড়াও একই সঙ্গে তৈরী হতে লাগল।

প্রথমে আমরা খুব একটা আশাবাদী ছিলাম না। প্লেগ যেন ঠিক ধূর্ত শয়তানের মতো নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের মতো শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। একদিন আকসারায় অঞ্চলে চল্লিশটি প্রাণ কেড়ে নিল, তো পরের দিন ফাতিতে আঘাত হানল, আবার হঠাৎই অপর পারে তোফেন বা জিহাঙ্গিরে গিয়ে হাজির হল। পরের দিন এসব অঞ্চলের খতিয়ান নিতে গিয়ে দেখা গেল যে প্লেগ তাদেরকে প্রায় স্পর্শই করেনি, কিন্তু তারপর জেয়রেকের মধ্যে দিয়ে এসে সোনালী শিঙার সন্নিকটস্থ আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে কুড়িটা প্রাণ কেড়ে নিল। মৃতের সংখ্যা থেকে আমরা কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না, একদিন পাঁচশো প্রাণ গেল তো পরের দিন একশো। প্লেগ কোন্ কোন্ জায়গা থেকে শিকার সংগ্রহ করছে তা জানার চেয়ে কোথায় প্রথম সংক্রমণ ছড়িয়েছিল তা চিহ্নিত করাই যে বেশি জরুরী এটা বুঝতে বুঝতেই অনেক সময় কেটে গেল। সুলতানের কাছ থেকে হোজার ক্রমাগত ডাক আসছিল। সতর্ক ভাবনাচিন্তার পরে আমরা ঠিক করলাম যে হোজার পক্ষে একথা বলাই উচিত হবে যে জনাকীর্ণ বাজার এলাকাতেই প্লেগ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে লোকে পরস্পরকে ঠকাচ্ছে ও কফির দোকানে পরস্পরের বড় বেশি কাছাকাছি বসে গল্প করছে আর সেই কারণে প্লেগও ছড়িয়ে পড়তে পারছে। হোজা প্রাসাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল, ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

হোজা সুলতানকে সব জানিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কী করব?' হোজা বাজার ও শহরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো বলপূর্বক কমানোর পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের অনুচররা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। তাহলে শহরের গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী করে, বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে জীবনও স্তব্ধ হয়ে যাবে, নররূপী প্লেগের ঘুরে বেড়ানোর কথা যারাই শুনবে তারাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, আখেরাতের দিন আসন্ন বলে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে ও তারা খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করবে, প্লেগ নামক শয়তান যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে কেউই বন্দী হয়ে থাকতে চাইবে না, তারা বিদ্রোহ শুরু করে দেবে। 'তারা ঠিকই করবে,' হোজা বলেছিল। ঠিক সেই

মুহূর্তে কোনো এক নির্বোধ এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে সামলানোর মতো যথেষ্ট রক্ষী পাওয়া যাবে কি না তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রত্যেককে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তার ক্ষমতা নিয়ে যেই সন্দেহ প্রকাশ করবে তাকেই তিনি শাস্তি দেবেন। ক্ষিপ্ত অবস্থাতেই তিনি হোজার সুপারিশগুলোকে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন, তবে তার আগে তার বিশ্বাসভাজন ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে ভুললেন না। রাজগণক সিটকি এফেন্দির দাঁত তো হোজার কথা উঠলেই বেশি ধারালো হয়ে ওঠে, তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে প্লেগ কবে ইস্তাম্বুলকে পরিত্যাগ করবে সে সম্বন্ধে হোজা কিন্তু তখনও কিছুই বলেনি। সুলতান তার ক্ষেত্রে যদি দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করেন এই আশঙ্কায় হোজা বলল যে পরের বার আসার সময় সে একটি দিনপঞ্জী নিয়ে আসবে।

টেবিলের উপর পেতে রাখা মানচিত্রটি আমরা নানা চিহ্ন ও সঙ্কেতে ভরে ফেলেছিলাম, কিন্তু তবুও শহরের স্থান থেকে স্থানান্তরে প্লেগের চলনের পিছনে আমরা কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। ইতিমধ্যে সুলতান প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞাগুলোকে বলবৎ করে দিয়েছেন। রক্ষীরা তিন দিন ধরে বাজারের প্রবেশপথে, রাস্তায়, জাহাজঘাটায় প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে, পথিকদের পথ আটকে জেরা চালাচ্ছে : 'আপনি কে? কোথায় যাবেন? কোত্থেকে আসছেন?' এবং তারপর ভীরু, সন্ত্রস্ত পথিকদের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে যাতে তারা প্লেগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে। বড়বাজার ও উনকাপিতে মানুষের গতিবিধি কিছু কমেছে এই খবর যতদিনে এল ততদিনে আমরা গত মাসের মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মৃত্যুর হিসেব ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে দেওয়ালে টাঙানো থাকত। হোজার মত ছিল যে প্লেগের গতিবিধির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য আমরা বৃথাই অপেক্ষা করছি এবং নিজেদের মাথা বাঁচাতে চাইলে সুলতানকে শান্ত করবার কোনো একটা উপায় আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

এই সময় নাগাদই অনুমতিপত্র বিলি করার ব্যবস্থা চালু হল। রক্ষী বাহিনীর প্রধান শহরের গ্রাসাচ্ছাদন ও বাণিজ্যকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের অনুমতিপত্র বিলি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মৃত্যুর সংখ্যায় প্লেগের বিস্তারের একটা ধরণ প্রথমবারের মতো আমার নজরে এল। ঠিক এই সময়ে আমরা জানতে পারলাম যে আগাম অনুমতিপত্র বিলির মাধ্যমে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছেন এবং অর্থপ্রদানে অনিচ্ছুক ছোট ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। হোজা একদিন বলছিল যে মহামান্য কোপরুলু ছোট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাচ্ছেন, এই সময় আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে প্লেগের বিস্তারের ধরণটা তার কাছে পেশ করলাম এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম যে দূরবর্তী শহরতলী ও গরীব অঞ্চলগুলো থেকে প্লেগ ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

আমার কথা তার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না, তবে দিনপঞ্জী তৈরির কাজটা সে আমার উপর ছেড়ে দিল। সে বলল যে সে সুলতানকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন অর্থহীন একটা গল্প লিখেছে যে কেউই তার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না। এর কয়েকদিন পরে সে আবার জানতে চাইল যে নীতিশিক্ষাবিবর্জিত বা অর্থশূন্য এমন কোনো গল্প সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা যাতে কেবল

পড়া বা শোনার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। 'সঙ্গীতের মতো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার প্রশ্নে হোজা বিস্মিত বোধ করল। আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম যে আদর্শ গল্পটির শুরু রূপকথার মতো নিষ্পাপ হবে, মধ্যভাগ দুঃস্বপ্নের মতো ভীতিপ্রদ হবে এবং সমাপ্তি বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনীর ন্যায় দুঃখজনক হবে। প্রাসাদে যাওয়ার আগের রাতে আমরা খোশমেজাজে গল্প করতে করতে দ্রুত কাজ সারছিলাম। হোজার তখনো গল্প লেখা শেষ হয়নি, অথচ পাশের ঘরে আমাদের বাঁহাতি হস্তলিপিবিশারদ বন্ধুটি সুন্দর হস্তাক্ষরে গল্পটির সূচনাংশ লিখতে শুরু করে দিয়েছিল। আমার কাছে মজুত সামান্য নথিপত্রের সাহায্যে প্রস্তুত কিছু সমীকরণের উপর ভিত্তি করে আমি ভোরের দিকে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে প্লেগ তার অন্তিম শিকার বাজার থেকেই সংগ্রহ করবে এবং কুড়ি দিনের মধ্যেই সে শহর ত্যাগ করে যাবে। আমি কেমন করে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম তা হোজা জানতে চাইল না, কেবল বলল যে পরিত্রাণের দিন এখন বহু দূরে। এর সঙ্গে সে আমাকে নির্দেশ দিল যে আমি যেন কুড়ি দিনের সময়কালকে দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিয়ে এনে অবশিষ্ট সময়কে নানান অলঙ্করণের আড়ালে লুকিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা সফল হবে কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি তার কথামতোই কাজ করলাম। হোজা তৎক্ষণাৎ কয়েকটি তারিখের জন্য সংখ্যার ইঙ্গিতবাহী রোমান অক্ষরের সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা করে ফেলল এবং সেগুলো হস্তলিপিবিশারদটির হাতে ধরিয়ে দিল। পদগুলোর অলঙ্করণের জন্য সে আমাকে কতকগুলো ছবিও এঁকে দিতে বলল। দুপুরের দিকে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি নীল চকচকে কাগজে মুড়ে বিরক্ত, অবসন্ন ও ভয়ার্ত মুখে সে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সে বলে গেল যে দিনপঞ্জীর চেয়ে সারস, ডানাওয়ালা ষাঁড়, লাল পিঁপড়ে বা কথা-বলা বাঁনর প্রভৃতির প্রতিই তার অধিকতর বিশ্বাস রয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা যখন সে ফিরে এল তখন তাকে চনমনে দেখাল। পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে সে নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সুলতানকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় করে তুলল এবং এই গোটা সময়টাই সে প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগ করছিল। শুরুতে সে বলেছিল, 'সবকিছুই ঘটতে পারে,' প্রথমদিন সে মোটেই আশাবাদী ছিল না। সুকণ্ঠের অধিকারী এক তরুণ হোজার গল্পটা যখন পাঠ করছিল তখন সুলতানের চারপাশে জড়ো হওয়া ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ সেই গল্প শুনে হাসতেও আরম্ভ করেছিল। হোজাকে ছোট করা ও সুলতানের নেকনজর থেকে তাকে সরানোই যে তাদের হাসির উদ্দেশ্য ছিল তা বলা বাহুল্য, কিন্তু সুলতান সবাইকে চুপ করার জন্য ধমক লাগালেন। তিনি হোজার কাছে কেবল জানতে চাইলেন যে সে কীসের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছল যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্লেগ কমে যাবে। হোজা সুলতানকে জানিয়ে দিল যে গল্পেই সবকিছুর উত্তর রয়েছে, কিন্তু সুলতান কেন, কেউই সেই উত্তরের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর সে সুলতানকে খুশী করার উদ্দেশ্যে ত্রাবজোন থেকে জাহাজে করে আনা নানারঙের বিড়ালগুলোর প্রতি ভালবাসা দেখাতে শুরু করল। বিড়ালগুলো তখন ভিতরের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে প্রাসাদের সব ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে হোজা পৌছানোর আগেই প্রাসাদ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজগণক সিটকি এফেন্দিসহ এক দল চাইছিল যে শহরের উপর থেকে যাবতীয়

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোক, আর অন্যদলটি হোজার পক্ষ নিয়ে বলছিল, 'শহর যেন দমবন্ধ করে থাকে, শহরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ানো প্লেগ নামক শয়তানটিকে সে যেন নিশ্বাসের সঙ্গেও গ্রহণ না করে।' দিনের পর দিন মৃত্যুসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকায় আমি আশাবাদী হয়ে উঠছিলাম, কিন্তু হোজার উদ্বেগ তখনো কমেনি। কানাঘুষায় শোনা যেতে লাগল যে প্রথম দলটি নাকি কোপরুলুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য কিন্তু প্লেগের হাত থেকে পরিত্রাণ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে মুক্তি।

প্রথম সপ্তাহের শেষে মৃত্যুসংখ্যা স্পষ্টতই হ্রাস পেল। কিন্তু আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মহামারী বিদায় নেবে এমন কথা আমার গণনা বলছিল না। আমার দিনপঞ্জী পাল্টে দেওয়ার জন্য আমি হোজার প্রতি বিরক্ত বোধ করছিলাম, কিন্তু এবার সে আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। সে আমাকে উত্তেজিত স্বরে জানাল যে মহামাত্যকে নিয়ে কানাঘুষা থেমে গেছে। সর্বোপরি, হোজার সমর্থকেরা এই খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে কোপরুলু তাদের সঙ্গেই আছে। সুলতান নিজে কিন্তু এসব চক্রান্তের মাঝে পড়ে প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং বিড়ালদের কাছেই মানসিক শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হতে হতে শহরের নাভিশ্বাস উঠে গেল, তবে তার জন্য প্লেগের চেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই বেশি দায়ী ছিল। প্রতিদিনই মৃত্যুর সংখ্যা কমতে লাগল, কিন্তু কেবল আমরা ও আমাদের মতো যারা মৃত্যুর সংখ্যার হিসেব রাখছিল তারাই তা বুঝতে পারছিল। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। শক্তিশালী, প্রাণচঞ্চল ইস্তাম্বুল যেন পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হল। এখবর আমি হোজার মুখ থেকেই শুনতে পেলাম কারণ আমি মহল্লা ছেড়ে কখনোই বেরোতাম না। বন্ধ দরজা জানলার পিছনে বন্দী হয়ে থাকা মানুষেরা প্লেগ ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তির জন্য কতটা মরীয়া হয়ে উঠতে পারে তা যে কেউই অনুভব করতে পারে। প্রাসাদেও ছিল এই উৎকণ্ঠার বাতাবরণ, মেঝের উপর কোনো পাত্র পড়ার শব্দ হলে বা কেউ জোরে কাশলেই বিজ্ঞের মতো ভান করতে থাকা লোকগুলোর যেন আতঙ্কে পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। অসহায় মানুষ যেমন ভালমন্দ যাই হোক না কেন কিছু একটা ঘটার আশায় থাকে তারাও তেমনি মৃগী রোগীর মতো ভঙ্গীতে ফিসফিসানিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল, 'দেখা যাক সুলতান আজ কী সিদ্ধান্ত নেন।' এই উৎকণ্ঠা হোজাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সে সুলতানকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে প্লেগ ধীরে ধীরে কমছে ও তার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সুলতানের উপরে তা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। অবশেষে তাকে আবার জীবজন্তুর কথায় ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল।

দু'দিন পরে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক গণনা থেকে হোজা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে এল যে মহামারী প্রকৃতই কমেছে। কিন্তু সেই শুক্রবার খুশী হওয়ার আরো অন্য কারণ ছিল। সেদিন হতাশাগ্রস্ত কয়েকজন বণিকের সঙ্গে রাস্তায় টহলদার রক্ষীদের লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিরোধীতায় একদল রক্ষী, কিছু লুটেরা, প্লেগ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাই তাতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত এই মত প্রচারে ব্যস্ত কিছু নির্বোধ ইমাম ও অলস মস্তিষ্কও ওই বণিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সেই বিক্ষোভকে দমন করা হল। তারপর শেখের রায় বেরোতেই

কুড়ি জনের গর্দান গেল। দণ্ডাদেশকে তৎক্ষণাৎ কার্যকর করার পিছনে ঘটনার গুরুত্বকে বাস্তবের চেয়ে অতিরঞ্জিত করে দেখানোই সম্ভবত একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এতে হোজা প্রকৃতই খুশী হয়েছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা হোজা তার জয় ঘোষণা করল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত ছিল—এই অভিযোগ প্রাসাদের কেউ আর করতে পারবে না। রক্ষীবাহিনীর আগাহ্‌কে যখন ডাকা হল তখন তিনি বিদ্রোহীদের কথা তুললেন আর তাতে সুলতান ক্ষেপেও গেলেন। যে দলটির শত্রুতা হোজার জীবনকে সাময়িকভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তারা তিতিরের ঝাঁকের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কানাঘুষায় তো এমনও শোনা গেল যে কোপরুলু যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বলে কথা রটেছিল তাদের বিরুদ্ধেই নাকি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই ব্যাপারেও সেই যে সুলতানকে প্রভাবিত করেছে তাও হোজা আনন্দের সঙ্গে জানিয়ে দিল। যারা বিদ্রোহ দমন করেছিল তারা সুলতানকে একথাও বোঝানোর চেষ্টা করল যে প্লেগের প্রকোপ কমে গেছে এবং তাদের বক্তব্য সঠিকই ছিল। সুলতান অভূতপূর্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে হোজার প্রশংসা করলেন এবং তাকে তার বাঁনরগুলো দেখাতে নিয়ে গেলেন। সুলতানের নির্দেশানুযায়ী বিশেষভাবে প্রস্তুত খাঁচায় করে বাঁনরগুলোকে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের শরীরের নোংরা ও আচরণের বেয়াদবী দেখে হোজার বিরক্ত লাগলেও তারা কাকাতুয়ার মতো কথা বলা শিখতে পারবে কিনা তা সুলতান তার কাছে জানতে চাইলেন। এরপর অনুচরদের দিকে ফিরে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন যে হোজা যেন ভবিষ্যতে আরও বেশী করে তার পাশে পাশে থাকে কারণ তার তৈরি করা দিনপঞ্জীটাই সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মাসখানেক পরের এক শুক্রবারে হোজাকে রাজগণক পদে নিযুক্ত করা হল। হোজা এমনকি রাজগণকের থেকেও বেশী কিছু হয়ে উঠল। সুলতান যখন শুক্রবারের নামাজ পড়তে হাজিয়া সোফিয়া মসজিদে গেলেন আর প্লেগের বিদায় উদ্‌যাপনের জন্য গোটা শহর তার সঙ্গে সেই প্রার্থনায় যোগ দিল তখন সেই যাত্রায় হোজা সুলতানের ঠিক পিছনেই ছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল, ঈশ্বর ও সুলতানকে ধন্যবাদজ্ঞাপনকারী সেই উল্লাসমুখর জনগণের ভীড়ে আমিও ছিলাম। সুলতান যখন আমাদের সামনে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন তখন উপস্থিত জনগণ সর্বশক্তিসহকারে চেঁচিয়ে উঠল, আনন্দে তারা উদ্বেল হয়ে উঠল, ধাক্কাধাক্কি ও গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেল, জনগণ ঢেউয়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল আর রক্ষীরা তাদের ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিতে লাগল। চারপাশের উদ্বেলিত মানুষের চাপে আমি একটা গাছের গায়ে একবার প্রায় চেপ্টেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তারপর কনুইয়ের গুঁতোয় ভীড়কে সরিয়ে কোনোরকমে আবার সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতেই হোজার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। আমার থেকে পাঁচ-ছয় কদম দূর দিয়ে সে সুখী ও তৃপ্ত মুখে হেঁটে যাচ্ছিল, কিন্তু সে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল যেন আমাকে দেখেইনি, সেই অবিশ্বাস্য হৈ-হট্টগোল ও চীৎকার চেঁচামেচির মধ্যে হোজা আমাকে দেখতে পায়নি বলেই আমি ভাবার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হল যে আমি যদি সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করতে পারতাম তবে হয়ত সে আমার উপস্থিতি টের পেত ও এই ভীড়ের মধ্যে থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারত এবং আমিও তাহলে জয় ও

ক্ষমতার রশিধরা সেই আনন্দমুখর শোভাযাত্রার অংশ হতে পারতাম! আমি যে ওই জয়ের ভাগীদার হতে চাইছিলাম বা আমার কাজের জন্য কোনো পুরস্কার আশা করছিলাম তা কিন্তু মোটেই নয়। আমার অনুভূতিটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমার মনে হচ্ছিল যে আমার হোজার পাশে থাকা উচিত, আমি তারই আত্মা দুঃস্বপ্নে যেমন আমি প্রায়শই দেখতাম সেরকমই যেন আমি আমার আত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বাইরে থেকে নিজেকে দেখছিলাম। যে মানুষটার ভিতরে আমি রয়েছি, আমাকে না চিনেই আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যাকে আমি এইমাত্র দেখলাম তার পরিচয়ও আমি জানতে চাই না, আমি শুধু দ্রুত তার সঙ্গে আবার একত্র হতে চাইছিলাম। কিন্তু এক বর্বর, নৃশংস সৈন্য তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে আমাকে আবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

## ৮

হোজা কেবল রাজগণকের পদেই উন্নীত হল না, প্লেগের প্রকোপ কমে যাওয়ার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সুলতানের সঙ্গে এক আশাতীত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতেও সমর্থ হল। ছোটখাটো বিদ্রোহটি ব্যর্থ হওয়ার পর মহামাত্য সুলতানের আম্মুকে বোঝাল যে তার পুত্রকে তার চারপাশে জমে থাকা নির্বোধদের কবল থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ী ও রক্ষীরাই মূলত তাকে ঘিরে থাকত আর তাদের নির্বুদ্ধিতাই সুলতানকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সুতরাং, ষড়যন্ত্রে যুক্ত বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল সেই প্রাক্তন রাজগণক সিটকি এফেন্দির গোষ্ঠীভুক্তরা যখন প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত হল অথবা তাদের পদ বদলে দেওয়া হল এবং তখন তাদের দায়িত্বগুলোও হোজার উপর ন্যস্ত হল।

ইতিমধ্যে সুলতান যখন যে প্রাসাদে থাকছিলেন সেখানেই হোজার নিত্য যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সুলতানও তার সাথে কথোপকথনের জন্য প্রতিদিন পৃথক সময় বরাদ্দ করে রাখছিলেন। প্রতিদিন সকালে সুলতান তার কাছ থেকে সর্বপ্রথমে আগের রাতে দেখা স্বপ্নের বিশ্লেষণ শুনতে চাইতেন আর রাতে বাড়ি ফিরে সে উচ্ছ্বসিতভাবে বিজয়ীর ভঙ্গীতে আমাকে সেই কাহিনীই শোনাতো। সকল কর্তব্যের মধ্যে সম্ভবত এটিই তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। কিন্তু একদিন সকালে সুলতান যখন বিষণ্নমুখে জানালেন যে আগের রাতে তিনি কোনো স্বপ্নই দেখেননি, হোজা তখন হঠাৎই অন্য কোনো ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার প্রস্তাব দিল। সুলতান আগ্রহভরে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিতেই সুলতানের রক্ষীরা গতরাতে ভাল কোনো স্বপ্ন দেখেছে এমন কাউকে সুলতানের সামনে হাজির করার জন্য চতুর্দিকে ছুটে গেল। এভাবে প্রতি সকালে স্বপ্নের বিশ্লেষণ এক অবশ্যপালনীয় অভ্যাসে পরিণত হল। বাকি সময়টা ফুলে ভরা এরগুভান ও প্রচুর শাখা সমন্বিত গাছের ছায়াঘেরা বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বা নৌকায় চড়ে বসফোরাসে ভাসতে ভাসতে সুলতানের প্রিয় জন্তুজানোয়ার এবং অতি অবশ্যই, আমাদের কল্পিত প্রাণীগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলত। তবে সে সুলতানের সঙ্গে অন্য আর কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝাঁপি খুলে বসত তাও সে উচ্ছ্বাসভরে আমাকে শোনাতো : বসফোরাস স্রোতের কারণ কী? পিঁপড়েদের সুশৃঙ্খল অভ্যাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কি অমূল্য জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে? ঈশ্বর ছাড়া আর কোথা থেকেই বা চুম্বক তার শক্তি আহরণ করতে পারে? নক্ষত্রদের আনাচেকানাচে কী তাৎপর্য লুকিয়ে আছে? অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন প্রথার মধ্যে

বিশ্বাসহীনতা ছাড়া জানার যোগ্য কিছু কি পাওয়া যেতে পারে? ভয় ও আতঙ্কে কোনো বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে এমন কোনো অস্ত্র কি কেউ আবিষ্কার করতে পারে? সুলতান কত মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনেছেন এ কথা খুব উৎসাহভরে শুনিয়ে দিয়ে হোজা দ্রুত গিয়ে টেবিলে বসত এবং দামী, মোটা কাগজে সেই অস্ত্রের নকশা আঁকতে শুরু করত; লম্বা নলযুক্ত কামান, গুলি বেরোবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সমন্বিত যুদ্ধাস্ত্র, শয়তানের মতো দেখতে ছায়ামানব ইত্যাদি। আমাকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে ছবিগুলোর মধ্যে পরিস্ফুট হিংস্রতা দেখিয়ে সে আমাকে বলত যে এগুলো শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

এসব স্বপ্ন আমি হোজার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইতাম। সম্ভবত এই কারণেই প্লেগ তখনো আমার মন জুড়ে ছিল কারণ সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে প্লেগই তো আমাদের সৌভ্রাতৃত্বের অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য করেছিল। প্লেগ নামক শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় গোটা ইস্তাম্বুল হাজিয়া সোফিয়ায় জড়ো হয়ে প্রার্থনা জানাতে ব্যস্ত থাকলেও রোগটি কিন্তু তখনো শহর থেকে পুরোপুরি হাত গোটায়নি। হোজা সকালে সুলতানের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে আমি মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে শহরের ইতিউতি ঘুরে বেড়াতাম, আশপাশের শ্যাওলা-পড়া লালটালির ছাদে ঢাকা ও ছোট ছোট মিনারওয়ালা দুর্দশাগ্রস্ত মসজিদগুলোতে কতগুলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তার হিসাব রাখতাম। আমি বুঝতে পারতাম না কেন, তবু আমি এই আশা করেই যেতাম যে রোগটি শহরটিকে ও আমাদের ছেড়ে যাবে না।

হোজা যখন সুলতানের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বলত, তার জয়ের কাহিনী শোনাতো, তখন আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে মহামারী কিন্তু এখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি এবং যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যেহেতু প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে তাই যে কোনোদিন আবার তা নতুন রূপে আবির্ভূত হতে পারে। সে রেগে গিয়ে আমাকে দাবড়ে চুপ করিয়ে দিল, তার বক্তব্য ছিল যে আমি তার জয়ের জন্য তার প্রতি ঈর্ষাবোধ করছি। আমি তার বক্তব্যের নির্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম : সে এখন রাজগণক, রোজ সকালে সুলতান তার কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বলেন, চারপাশের নির্বোধদের ভীড় থেকে দূরে জনান্তিকে সে সুলতানকে নিজের বক্তব্য শোনাতে পারে, এসবের জন্যই তো আমরা পনেরোটা বছর ধরে অপেক্ষা করেছি, এটা জয় তো বটেই, কিন্তু জয় যেন তার একার এমন সুর তার কথায় কেন? তাকে দেখে মনে হল যে সে যেন ভুলেই গেছে যে প্লেগের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও নিখুঁত বলেই গৃহীত হয়েছিল যে দিনপঞ্জী তাও আমি তৈরী করেছিলাম। আমার আরো বেশী করে বিরক্ত লাগল এই কারণে যে সে কেবল আমার দ্বীপে পালিয়ে যাওয়াটাই মনে রেখেছিল, কিন্তু কোন্ পরিস্থিতিতে সে আমাকে তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল তা আর মনে রাখেনি। হয়ত হোজাই ঠিক, হয়ত আমার অনুভূতিকে ঈর্ষা বলে অভিহিত করাই যায়, কিন্তু সে এটা বুঝল না যে অনুভূতিটা আদতে সৌভ্রাতৃত্বমূলক। আমি চেয়েছিলাম সে অনুভূতির স্বরূপটা বুঝুক, কিন্তু আমি যখন তাকে মনে করিয়ে দিতাম যে প্লেগপূর্ব দিনগুলোতে নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলোর একঘেয়েমি ভোলার জন্য আমরা টেবিলের দুই প্রান্তে একসাথে বসতাম, যখন তাকে মনে করিয়ে দিতাম যে কখনো

কখনো আমরা কেমনভাবে ভয় পেয়েছি কিন্তু সেই ভয় থেকে কত কিছু শিখেছিও এবং একথাও যখন স্বীকার করে নিলাম যে দ্বীপে একাকী থাকার সময়ে সেই রাতগুলোর কথা আমার খুব মনে পড়ত; তখন আমার সব কথাই সে এমন অবজ্ঞা ভরে শুনত যেন সে আমার প্রকাশিতব্য ভণ্ডামির নিরাসক্ত সাক্ষী মাত্র। সে আমাকে কোনো আশা দিল না, অতীতের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ যৌথজীবনে আমরা আবার ফিরতে পারব এমন কোনো সঙ্কেত সে দিল না।

বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমি লক্ষ করছিলাম যে সতর্কতামূলক বিধিব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও প্লেগ যেন শহর থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছিল। হোজা যাকে 'জয়' বলে অভিহিত করেছিল তার উপর প্লেগ যেন ছায়াপাত করতে চাইছিল না। মৃত্যুর কালোছায়া আমাদের উপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল বলে আমার নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগত। আমার ঐরূপ অনুভূতির জন্য মাঝে মাঝে নিজেরই বড় অবাক লাগত। কখনো কখনো আমার ইচ্ছা হত যে আমরা কথা বলি, না, সুলতানের স্বপ্ন বা তার কাছে বর্ণিত হোজার প্রকল্পগুলো নিয়ে নয়, আমাদের একত্রে কাটানো অতীত দিনগুলো নিয়ে। আমি দীর্ঘদিন ধরেই দেওয়াল থেকে নামিয়ে নেওয়া সেই ভয়ংকর আয়নার সামনে তার সাথে আবার একসাথে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলাম। এমনকি মৃত্যুভয়ও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু অনেকদিন ধরেই হোজা আমাকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখছিল, বা দেখার ভান করছিল, এবং আরও খারাপ ব্যাপার যেটা সেটা হল যে ওই ভানটুকু করারও যেন তার আর প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের পুরনো সুখের জীবনে হোজাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি মাঝে মাঝেই বলতাম যে আবার আমাদের টেবিলে বসার সময় হয়ে গেছে। তার সামনে নজীর স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি দু-একবার লেখার চেষ্টাও করেছিলাম। সেইসব লেখায় প্লেগের আতঙ্ক, ভয় থেকে উদ্ভূত মন্দ কিছু করার বাসনা, আমার পাপাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছিল। সেগুলো তাকে পড়ে শোনানোর চেষ্টা করলে সে সেসব শুনতও না। বিদ্রূপের সুরে সে বলত যে আমাদের লেখাগুলো যে অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয় তা সে তখনই বুঝেছিল। তার নিজের জয়ের অনুভূতির থেকেও আমার অসহায়তাই যেন ছিল তার বিদ্রূপের পিছনে মূল চালিকাশক্তি। সেই সময়ে সে নাকি কেবল একঘেয়েমি কাটাতে আর সে খেলার শেষ কোথায় তা দেখার জন্যই ওই খেলা খেলত। তাছাড়া, সে আমাকে বাজিয়ে দেখতেও চেয়েছিল। তবে কারণ যাই হোক না কেন, তাকে প্লেগাক্রান্ত ধরে নিয়ে আমি যেদিন পালিয়ে গেলাম সেদিনই আমি কী জাতীয় মানুষ তা সে বুঝে গিয়েছিল। আমি হলাম এক দুষ্টকর্মা! মানুষ দুই প্রকারের হয়, তার মতো ন্যায়পরায়ণ ও আমার মতো দোষী।

আমি তার এসব কথার কোনো উত্তর দিতাম না, এগুলোকে তার জয়ের, উত্তেজনার ফলশ্রুতি হিসেবেই আমি ধরে নিয়েছিলাম। আমার মস্তিষ্ক আগের মতোই তীক্ষ্ণ ছিল এবং ছোটখাটো বিষয়ে নিজেকে রেগে যেতে দেখে আমি উপলব্ধি করলাম যে রেগে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার হারিয়ে যায়নি, কিন্তু তার প্ররোচনার কী উত্তর দেব, তাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব বা কীভাবে ফাঁদে ফেলতে পারব তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তার থেকে দূরে গিয়ে হেয়বেলি দ্বীপে দিন

গুজরানের সময়েই আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে আমি নিজের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি। ভেনিসে ফিরে গেলেও কী বা আর পরিবর্তন ঘটবে? পনেরো বছর কেটে গেছে। আমার মন বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছে যে আমার মা মারা গেছে, আমার প্রেমিকাও আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, সে এখন সম্ভবত বিবাহিতা ও সংসারে মগ্ন। আমি আর তাদের কথা ভাবতে চাই না, আমার স্বপ্নে তাদের আগমণ ক্রমশই কমে গেছে, সর্বোপরি এখানে আসার পর প্রথম কয়েক বছরের স্বপ্নে যেমন নিজেকে ভেনিসে তাদের মাঝে দেখতে পেতাম এখন আর তেমন পাই না। তার বদলে এখনকার স্বপ্নে তাদেরকে আমাদের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে বসবাস করতে দেখি। আমি যদি ভেনিসে ফিরেও যাই তাহলেও সেখানে জীবনকে যে বিন্দুতে ছেড়ে এসেছিলাম সেই বিন্দু থেকে যে আর শুরু করতে পারব না তা আমি ভালই জানি, খুব বেশি হলে আমি সেখানে একটি অন্য জীবন নতুনভাবে শুরু করতে পারি মাত্র। আমার দাসত্বের সময়কাল এবং তুর্কীদের সম্বন্ধে আমার দু-একটি বই লেখার পরিকল্পনা ছিল, এছাড়া আগেকার জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে আমার আর কোনো উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না।

হোজা যে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত তার কারণ হিসেবে আমার কখনো কখনো মনে হত যে সে আঁচ করতে পেরে গেছে যে আমার কোনো দেশ বা লক্ষ্য নেই, সে জেনে গেছে যে আমি দুর্বল, সে পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেছে। সুলতানের কাছে পেশ করা গল্প, নিজের স্বপ্নের সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্রের ছবি ও দুর্ধর্ষতা এবং সুলতানের মনকে জয় করে নেওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে সে প্রতিদিনই এত মত্ত হয়ে থাকত যে সে সম্ভবত আমার ভাবনার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনই করতে পারেনি। তার এই সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন পরিতৃপ্তির ভাবকে আমি ঈর্ষার চোখে দেখতাম। আমি তাকে ভালবাসতাম, জয়ের অতিরঞ্জিত ভাবনা থেকে তার মনে উদ্ভূত মিথ্যা স্ফূর্তি, তার অন্তহীন পরিকল্পনাসমূহ, সুলতানকে শীঘ্রই মুঠোয় পুরে ফেলার ব্যাপারে তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এসবই আমি ভালবাসতাম। এই জাতীয় ভাবনা আমারও ছিল, কিন্তু আমি নিজের কাছেও তা স্বীকার করে উঠতে পারিনি। তবে তার নড়াচড়া ও দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখতে দেখতে কদাচিৎ আমার মনে হত যে আমি যেন নিজেকেই দেখছি। মানুষ কখনো কখনো কোনো শিশু বা যুবকের মধ্যে নিজ শৈশব বা যৌবনকে প্রত্যক্ষ করে এবং তাই সেই শিশু বা যুবককে ভালোবাসা ও কৌতূহলসহ লক্ষ্য করে। আমার ভয় ও কৌতূহলটা ছিল সেই ধরণের। সে একদা আমার গ্রীবা চেপে ধরে আমাকে বলেছিল 'আমি তুমি হয়ে গেছি,' সেই কথা আমার প্রায়শই মনে পড়ত, কিন্তু সেইসব দিনের কথা হোজাকে মনে করিয়ে দিতে গেলেই সে আমাকে থামিয়ে দিত আর তার বদলে সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্রের প্রতি সুলতানের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সুলতানকে সেদিন সে কী বলেছে বা স্বপ্নের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেদিন সকালে সে সুলতানের মনকে কেমনভাবে উত্তেজিত করে তুলেছে সেই সবই বলতে থাকত।

এসব সাফল্যগুলো তার বর্ণনায় এত মধুর শোনাত যে আমিও তাদের ঔজ্জ্বল্যে বিশ্বাস করতে চাইতাম। কখনো কখনো তো অসীম কল্পনাশক্তির ডানায় ভর করে আমি আনন্দের চোটে নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে ফেলতাম ও সেইসব সাফল্যকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে ফেলতাম। তখন আমি তাকে এবং নিজেকেও ভালবেসে ফেলতাম, আমাদেরকে ভালবেসে ফেলতাম, আকর্ষক রূপকথা শোনায় মগ্ন অবোধ

শিশুর মতো আমার মুখ হাঁ হয়ে যেত এবং তার কথায় ডুবে যেতাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে সেসব অনাগত সুন্দর দিন অর্জনের লক্ষ্যে আমরা একত্রে কাজ করব।

এভাবে সুলতানের স্বপ্ন বিশ্লেষণের কাজে হোজার সাথে আমিও যোগদান করলাম। সরকারের উপর অধিকতর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একুশ বছর বয়সী সুলতানকে ক্রমাগত প্ররোচিত করে যাবে বলে সে ঠিক করে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ সুলতানের স্বপ্নে নিয়মিতভাবে আবির্ভূত ছুটন্ত নিঃসঙ্গ ঘোড়াগুলোকে সে বিষণ্ন বলে ব্যাখ্যা করল কারণ তারা আরোহীশূন্য, শিকারের গলায় দাঁত-বসানো নিষ্ঠুর নেকড়েদের সে স্বনির্ভর বলে ব্যাখ্যা করল ও স্বনির্ভর হওয়ার কারণেই তারা সুখী বলে সে বিধান দিল, ঠিক তেমনি ক্রন্দনরতা বৃদ্ধা, অন্ধ সুন্দরী ও কালো বৃষ্টিতে পাতা ঝরে যাওয়া গাছেরা আসলে সুলতানকে সাহায্যের জন্য ডাকছে বলে হোজা তাকে বোঝাল, আবার পবিত্র মাকড়সা বা গর্বিত বাজকে সে স্বাধীনতার প্রতীক বলে অভিহিত করল। আমরা চাইতাম যে সুলতান সরকারের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পরে আমাদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখান, আর সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আমরা এমনকি তার দুঃস্বপ্নগুলোকেও কাজে লাগাতাম। শিকার অভিযানের সময় দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর রাত্রিগুলোতে যে কোনো শিকারপ্রেমীর মতোই সুলতানও নিজেকে শিকার হিসেবেই স্বপ্নে দেখতেন বা সিংহাসন হারানোর আশঙ্কায় নিজেকে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক শিশু হিসেবে দেখতেন। হোজা এর ব্যাখ্যা করে বলত যে তিনি চিরযুবক হিসেবেই সিংহাসনে আসীন থাকবেন, তবে তার জন্য সুযোগসন্ধানী শত্রুদের প্রতারণার হাত থেকে নিরাপদে থাকতে হবে এবং তার জন্য আবার তাদের অস্ত্রের থেকে উন্নততর অস্ত্র তৈরি করতে হবে। সুলতান আরও হরেকরকম স্বপ্ন দেখতেন তার নানা, সুলতান মুরাত নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য একটি গাধাকে তলোয়ারের এক কোপে এত নিখুঁতভাবে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন যে সেই দুটি অংশ দৌড়ে পরস্পরের থেকে দূরে চলে গেল, তার ধূর্ত নানী, কোসেম সুলতানা তার ও তার মার গলা টিপে ধরার জন্য কবর থেকে উঠে এসে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তার উপর লাফ দিচ্ছেন, রঙ্গশালায় শাখাপ্রশাখা-বিস্তারী বড় বড় গাছের বদলে ডুমুর গাছ গজিয়েছে আর তার থেকে ফলের বদলে রক্তাক্ত লাশ ঝুলছে, সুলতানের মতোই দেখতে দুষ্টু লোকেরা তাকে তাদের হাতের বস্তায় ভরে দমবন্ধ করে মারার জন্য তার পিছনে দৌড়াচ্ছে, বাতাসে নিভছে না এমন সব মোমবাতি পিঠের উপর বসিয়ে একদল কচ্ছপ উসুকদার নামক স্থানে সমুদ্রে প্রবেশ করছে ও সোজা প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে আসছে। আমরা এসব স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতাম। আমি আবার বিজ্ঞান ও সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্রের স্বার্থে ধৈর্য্য ও স্ফূর্তি সহকারে এসব স্বপ্নের শ্রেণীবিভাজন করে বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। একদল সভাসদ কানাঘুষা করতো যে সুলতানের মাথায় শিকার ও জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তিনি রাজকার্যে অবহেলা করছেন কিন্তু আমাদের মনে হত যে তারা অত্যন্ত ভুল ভাবছে। হোজার মতানুযায়ী আমরা সুলতানকে ক্রমশই আরও বেশী করে প্রভাবিত করছিলাম, কিন্তু আমরা সফল হব বলে আমার আর বিশ্বাস হত না। হোজা সুলতানের কাছ থেকে নতুন অস্ত্র, মানমন্দির বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি আদায় করত, তারপর স্বপ্নে মশগুল ও উদ্যমে ভরপুর হয়ে বেশ কয়েকদিন কেটে যেত, কিন্তু পরবর্তী বেশ কয়েক মাসে

এসব বিষয় নিয়ে সুলতানের সঙ্গে হয়ত তার আর কোনো কথাই হত না। প্লেগের আক্রমণের বছরখানেক পরে মহামাত্য কোপরুলু মারা যেতে হোজা নতুন আশার আলো দেখতে পেল—সুলতান হয়ত কোপরুলুর ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বকে ভয় পেতেন বলে হোজার পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে দ্বিধা করতেন। এবার যখন মহামাত্যই মারা গেছে ও তার স্থলাভিষিক্ত তার ছেলে যখন তার থেকে অনেক কম ক্ষমতাশালী তখন সুলতানের কাছ থেকে কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত এবার আশা করাই যেতে পারে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমাদের পরবর্তী তিন বছর কেটে গেল। নিজের স্বপ্ন ও শিকার অভিযান নিয়ে মেতে থাকা সুলতানের নিষ্ক্রিয়তায় আমি ততটা অবাক হইনি, যতটা অবাক আমি এত কিছুর পরও সুলতানের উপর হোজার ভরসা দেখে হলাম। এতগুলো বছর ধরে আমি তো এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম যেদিন হোজা আশা হারিয়ে আমার মতো হয়ে যাবে। যদিও সে 'জয়' নিয়ে আর আগের মতো কথা বলত না এবং প্লেগ পরবর্তী কয়েক মাসের মতো স্ফূর্তির ভাবও তার আর ছিল না, কিন্তু তবু নিজের এই স্বপ্নকে সে তখনো বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল যে সে তা 'রাজকীয় পরিকল্পনা' দ্বারা একদিন না একদিন সে সুলতানকে প্রভাবিত করবেই। তার অজুহাত সবসময় তৈরি থাকত : ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ইস্তাম্বুল প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ঠিক পরই যদি সুলতান তার রাজকীয় পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ লগ্নী করতেন তবে তার শত্রুরা তার ভাইকে সিংহাসনে বসানোর জন্য চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে যেত; সেই সময় সুলতানের কিছু করার ছিল না কারণ সেনাদল হুনদেশে অভিযানের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছিল; তার পরের বছর জার্মানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর কথা ছিল; আবার সোনালি শিঙার তীরে যে নির্মীয়মাণ ভালিদে মসজিদে সুলতান ও তার আম্মু, তুরহান সুলতানার সঙ্গে হোজা নিয়মিত যেত সেই মসজিদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছিল; এছাড়াও ছিল অগুনতি শিকার অভিযান। আমি আর শিকার অভিযানে অংশ নিতাম না, শিকার থেকে হোজার ফেরার অপেক্ষা করতে করতে আমি অলসভাবে তার বইয়ের পাতা ওল্টাতাম এবং তার নির্দেশ মোতাবেক সেই 'রাজকীয় পরিকল্পনা' বা 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা করতাম।

এসব প্রকল্প নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতেও আমার আর ভাল লাগত না, সেগুলো যদি কখনো বাস্তবায়িতও হয় তাহলেও তার ফল কী হবে তা নিয়ে আমার আর কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আমাদের ভাবনাচিন্তায় যে বিশেষ সারবত্তা ছিল না তা আমার মতো হোজাও জানত। এদিকে ঘড়ি, যন্ত্রপাতি ও নমুনাগুলো জং-ধরা অবস্থায় অবহেলায় কোণে পড়ে ছিল। একদিন আমরা 'বিজ্ঞান' নামক সেই দুর্বোধ্য জিনিসটার চর্চা শুরু করব এবং যতদিন পর্যন্ত তা শুরু না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা সব মুলতবী করে রেখেছিলাম। আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমন কোনো রাজকীয় পরিকল্পনা কিন্তু আমাদের হাতে ছিল না, ছিল কেবল ওইরকম এক পরিকল্পনার স্বপ্ন। ওই নীরস ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাকে কখনোই বিভ্রান্ত করতে পারেনি, কিন্তু তবু তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করার চেষ্টায় ও হোজার প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধকে অনুভব করতে চেয়ে আমি কখনো কখনো তার দৃষ্টি দিয়ে পাতাগুলোকে দেখার চেষ্টা করতাম

অথবা আমার মাথায় যখন অজস্র ভাবনা খেলা করত তখন আমি নিজেকে তার জায়গায় বসাবার চেষ্টা করতাম। সে যখন শিকার থেকে ফিরে আসবে তখন আমি এমন ভাব করব যেন তার বলে যাওয়া কোনো একটি বিষয়ে আমি মাথা খাটিয়ে এক নতুন সত্য আবিষ্কার করেছি এবং তার আলোয় আমরা সবকিছু পাল্টে ফেলতে পারি। আমি যখনই বলব, 'সমুদ্রের জলতলের ওঠানামা সমুদ্রে এসে মেশা নদীগুলোর জলের উষ্ণতার মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত' অথবা 'বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণার সাহায্যে প্লেগ ছড়ায়, এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বিদায় নেয়' বা 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে আর সূর্য ঘোরে চাঁদের চারদিকে,' তখনই শিকারাভিযানের ধুলোমাখা পোশাক ছাড়তে ছাড়তে হোজা একটাই জবাব দেবে 'আর এখানকার নির্বোধগুলো এটা বোঝেই না!' এই জবাব শুনে তার প্রতি ভালবাসায় আমার মুখে হাসি আসবে। তারপর সে রাগে ফেটে পড়বে এবং সেই রাগের বীভৎসতার আঁচ আমাকেও পোয়াতে হবে। সুলতান কেমনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একটা সন্ত্রস্ত শুয়োরকে তাড়া করে বেড়িয়েছেন বা শিকারী কুকুর দিয়ে তাড়া করিয়ে একটা খরগোশ ধরানোর পর তিনি কেমন নির্বোধের মতো চোখের জল ফেলেছেন তাই নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে যাবে। হোজাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এও মেনে নিতে হত যে শিকারাভিযানের সময়ে সুলতানকে সে যা বলবে তাই এক কান থেকে অন্য কানে পৌঁছে যাবে এবং বক্তব্যের অর্থ বোঝার জন্য তারা বারংবার একই প্রশ্ন করতে থাকবে। এতগুলো নির্বোধ একসাথে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল এ কি নিছকই সমাপতন নাকি তা অনিবার্য ছিল? তারা এত নির্বোধ কেন?

তারপর ধীরে ধীরে তার বোধোদয় ঘটল যে নির্বোধদের মনের চরিত্র বোঝার জন্য যাকে সে 'বিজ্ঞান' বলে তা নিয়ে তাকে আবার নতুন করে চর্চা শুরু করতে হবে। এই বোধোদয় আমাকে সেই প্রিয় অতীত দিনের কথা মনে করিয়ে দিল যখন আমরা পারস্পরিক সাদৃশ্যের প্রাবল্যহেতু একে অপরকে ঘৃণা করলেও এক টেবিলে বসতাম। তাই আমিও 'বিজ্ঞান' নিয়ে আবার নতুন করে চর্চা শুরু করার জন্য হোজার মতোই উৎসাহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টার পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে সবকিছু আর আগের মতো নেই।

প্রথমত, আমার যেহেতু জানা ছিল না যে তাকে কেমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অথবা কেনই বা আমি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তাই আমি তার উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারিনি। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে তার যন্ত্রণা ও পরাজয়কে আমি নিজের যন্ত্রণা ও পরাজয় বলেই ভাবতাম। একবার তো অতিরঞ্জিত উৎসাহ সহকারে আমি তাকে এখানকার মানুষদের ত্রুটিগুলো স্মরণ করিয়েও দিলাম এবং আমি নিজে তা বিশ্বাস না করলেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য এটা বুঝিয়ে ছাড়লাম যে তাদের মতোই তারও নিয়তি হল ব্যর্থতা। সে আমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বলল যে আমরা যদি উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে কাজ করতে পারি তবে ব্যর্থতা অনিবার্য নয়, উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি অস্ত্র প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে পারি তবে এখনও আমরা ইতিহাসের স্রোতধারার গতিমুখ বদলে দিতে পারি। হতাশায় ভারাক্রান্ত হলে সে তার পরিকল্পনার বদলে 'আমাদের' পরিকল্পনার কথা বলত। এবারও সেই কথা বলে সে আমাকে খুশী করলেও সে নিজে যে অবশ্যম্ভাবী

পরাজয়ের আশঙ্কায় ভুগছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। তাকে আমার এক অনাথ শিশু বলে মনে হল, আমি তার ক্রোধ ও দুঃখকে ভালবাসতাম, তার এই দুই আবেগ আমাকে আমার দাস জীবনের সূচনাপর্বকে মনে করিয়ে দিত এবং আমি তার মতো হতে চাইতাম। ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি চলতে থাকলেও তার দৃষ্টি থাকত বাইরে বৃষ্টিভেজা নোংরা ও কর্দমাক্ত রাস্তা অথবা দূরে সোনালি শিঙার তীরে তখনও প্রজ্বলিত কতিপয় কম্পমান শিখার দিকে, মনে হত সে যেন নিজের আশাকে গচ্ছিত রাখার জন্য কোনো নতুন সঙ্কেত খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরের মধ্যে তার যন্ত্রণাদীর্ণ পায়চারি দেখে মুহূর্তের জন্য আমার মনে হত যে হোজা নয়, তার পরিবর্তে আমার নিজের যৌবন যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। আমি বলতে অতীতে যে মানুষটাকে বোঝানো হত সে আমাকে কবেই ছেড়ে চলে গেছে এবং এখন যে আমি ঘরের কোণায় ঈর্ষাকাতর মন নিয়ে ঝিমোচ্ছি সে আসলে হোজার সঙ্গ কামনা করে, এই আমি আশা করে যে তার কাছ থেকে আমি আমার হৃত উদ্যম পুনরুদ্ধার করতে পারব।

উদ্যমের উদ্‌গীরণ কখনো ক্ষান্ত হয়নি, কিন্তু তবুও উদ্যমের প্রতি আমার অবশেষে ক্লান্তি এসে গেল। হোজা রাজগণক পদে উন্নীত হওয়ার পর গেবজেতে তার সম্পত্তির পরিমাণ ও আমাদের উপার্জন উভয়ই বৃদ্ধি পেল। মাঝেমধ্যে সুলতানের সঙ্গে কথোপকথনে সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু তার করার প্রয়োজন ছিল না। কদাচিৎ আমরা গেবজে যেতাম, সেখানকার জীর্ণ কল ও গ্রামে ঘুরে আসতাম, ভেড়ার পাল পাহারা দেওয়ার শিকারী কুকুরগুলোই সেখানে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানাত, উপার্জন কেমন হচ্ছে বুঝে নিতাম, হিসাবপত্র খুঁটিয়ে দেখতাম ও সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক আমাদের কতটা ফাঁকি দিচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করতাম। এছাড়া সুলতানের মনোরঞ্জনকারী নিবন্ধ রচনা আর কখনো কখনো হাসিঠাট্টায় ও অধিকাংশ সময়ে একঘেয়েমির চোটে গোঙাতে গোঙাতে কালহরণ করা– এই ছিল আমাদের কাজ। অলস দিনযাপনে হাঁপিয়ে উঠলে মাঝে মাঝে আমরা বিলাসবহুল সুরভিশোভিতা বারবণিতাদের শয্যাসঙ্গ করতাম, কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি না করলে সে নিজে বোধহয় সেই আয়োজনটাও করত না।

সুলতানের চারপাশে বিজ্ঞের ভান করা নির্বোধ, ভাঁড়, জালসাজদের ভিড় আবার জমে উঠেছিল এবং এর ফলে হোজা উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। জার্মান অভিযানের উদ্দেশ্যে বা ক্রেটান দুর্গ অভিমুখে পাশারা সেনাবাহিনীসহ রওনা দিলে শহরে তাদের অনুপস্থিতি সুলতানকে উৎসাহিত করে তুলেছিল। উপরন্তু তার মা'ও তাকে কোনো কথা শোনাতে পারতেন না। একদা প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত এসব নির্বোধ, ভাঁড় ও জালসাজদের হোজা তীব্র ঘৃণা করত। তাই এই ভণ্ডগুলোর থেকে নিজেকে পৃথক রাখার জন্য ও তাদের কাছে নিজের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করার জন্য সে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না বলে বদ্ধপরিকর ছিল, কিন্তু সুলতানের আদেশে সে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে বা তাদের বিতর্ক শুনতে বাধ্য হত। এসব জমায়েতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত যথা পশুদের আত্মা আছে কি নেই, যদি থেকে থাকে তবে কোন্ কোন্ পশুর আছে, তাদের মধ্যে কারা বেহেস্তে আর কারা দোজখে যাবে, ঝিনুককে পুরুষ না নারী কী বলা উচিত, প্রতিদিন সকালে নতুন নতুন সূর্য ওঠে নাকি অপরদিকে ডুবে যাওয়া সূর্যটাই এপারে আবার উঠে আসে তা শুনে বেরিয়ে এসে

হোজা ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো সন্দিহান হয়ে পড়ত। সে কেবল বলত যে আমরা যদি কোনো পদক্ষেপ না নিই তবে সুলতান শীঘ্রই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবেন।

যেহেতু হোজা 'আমাদের' পরিকল্পনা 'আমাদের' ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিল তাই আমি খুশি মনে তাকে সঙ্গ দিচ্ছিলাম। একবার তো সুলতানের মনে কী চলছে তা বোঝার চেষ্টায় বছরের পর বছর ধরে আমার আগলে রাখা নোটবইটা আমরা আবার ঘাঁটতে শুরু করলাম। সেই নোটবইয়ে আমাদের স্বপ্ন আর স্মৃতি মাখামাখি হয়েছিল। কোনো দেরাজের বিভিন্ন তাকে রাখা সব জিনিষপত্র গুনতি করার মতো করে আমরা সুলতানের মনে নানা সময়ে উদয় হওয়া বিষয়গুলোও মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। ফল যা দাঁড়ালো তা মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্র যা আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে বা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লুক্কায়িত অধুনা অসমাধিত রহস্য নিয়ে হোজা এখনো উৎসাহভরে কথা বলে যেত ঠিকই, কিন্তু ক্রমঅগ্রসরমাণ চূড়ান্ত পরাজয়কে সে অনুমানও করতে পারছে না এমন ভান সে আর করতে পারত না। মাসের পর মাস ধরে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা 'পরাজয়' বলতে কি এই বুঝেছিলাম যে সাম্রাজ্য একে একে তার সব অঞ্চল হারিয়ে ফেলবে? আমরা টেবিলের উপর মানচিত্র বিছিয়ে বিষাদাচ্ছন্ন মনে প্রথমে কোন্ অঞ্চল, তারপর কোন্ পাহাড় বা নদী বেদখল হয়ে যাবে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করব। নাকি পরাজয়ের অর্থ এটাই ছিল যে মানুষেরা পাল্টে যাবে এবং তারা লক্ষ্যও করবে না যে তাদের বিশ্বাস পাল্টে গেছে? আমরা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম যে এক সকালে উষ্ণ শয্যা ত্যাগের পরে দেখা যাবে যে ইস্তাম্বুলের প্রত্যেক মানুষই পরিবর্তিত হয়ে গেছে; তারা কীভাবে পোশাক পরতে হবে তা বুঝতে পারছে না, আজান-বারান্দার প্রয়োজনীয়তা কী তা তারা মনে করতে পারছে না। নাকি পরাজয় বলতে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাদের সোৎসাহে অনুকরণ করাকেই বোঝানো হয়েছিল? তারপর সে আমার ভেনিসের জীবনের কোনো একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করবে আর আমরা কল্পনা করার চেষ্টা করব যে এখানে আমাদের পরিচিতরা মাথায় বিদেশি টুপি ও নিম্নাঙ্গে প্যান্ট পরে কেমনভাবে আমার অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে।

শেষ অবলম্বণ হিসেবে এসব স্বপ্ন আমরা সুলতানের সামনে পেশ করব বলে ঠিক করলাম। আমাদের ভাবনা ছিল যে পরাজয়ের এসব কল্পচিত্রকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে জীবন্ত করে তুলে সুলতানের সামনে পেশ করা গেলে হয়ত তাকে কর্মোদ্যোগে সামিল হতে প্রণোদিত করা যেতে পারে। পরাজয় ও ব্যর্থতার এসব কল্পচিত্র আমাদের সময়ের হিসাব ভুলিয়ে দিয়েছিল; নিকষ, নিস্তব্ধ রাতের পর রাত আমরা এক বিষণ্ন, হতাশাজনক আনন্দকে সঙ্গী করে ওইসব কল্পচিত্রের সাহায্যে একটা গোটা বই রচনা করে ফেললাম মাথা ঝুঁকে পড়া ভিখিরির দল, কর্দমাক্ত পথ, অর্ধসমাপ্ত বাড়ি, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অদ্ভুতদর্শন সব রাস্তা, সবকিছু আগের মতো চেয়ে মানুষের আকুল প্রার্থনা অথচ নিজেদের প্রার্থনা তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না, বিলাপরত পিতা-মাতা, ক্ষণজীবী অসুখী মানুষ যারা পরভূমে অর্জিত কোনো কিছুই আমাদের দিয়ে যাওয়ার সুযোগও পায় না, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকা যন্ত্র, অতীত দিনের জন্য বিলাপরত

অশ্রুসিক্ত চোখ, হাড়-জিরজিরে কুকুর, শহরের মধ্যে এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো ভূমিহীন গ্রামবাসী, প্যান্ট পরিহিত নিরক্ষর মুসলমান এবং সব যুদ্ধেরই অনিবার্য পরিণতি পরাজয়। বইয়ের আরেক অংশে আমরা আমার ফিকে হয়ে আসা কিছু স্মৃতিও লিপিবদ্ধ করলাম। ভেনিসে বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে মা-বাবা-ভাই-বোনেদের সাহচর্যে আরদ্ধ কিছু সুখকর অভিজ্ঞতা। যারা আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করবে তারা এভাবে জীবনযাপন করে এবং তারা কিছু করে ওঠার আগেই আমাদের কিছু করা উচিত ও তাদেরকে অনুসরণ করা উচিত। পরিশেষে আমাদের বাঁহাতি হস্তলিপিবিশারদটি একটি সুন্দর ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখে বইটি শেষ করল। হোজার অতি পছন্দের লণ্ডভণ্ড দেরাজের রূপকালঙ্কারের সাহায্যে সেই কবিতায় যেন আমাদের মনের দুরূহ রহস্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন ধাঁধার উদ্দেশ্যে এক দরজা খুলে দেওয়া হল। আমার ও হোজার লেখা যাবতীয় বই ও নিবন্ধের মধ্যেই এক অন্তর্লীন বিষাদের সুর সর্বদা উপস্থিত থাকত। এই মহিমান্বিত ও শান্ত কবিতাটিতে সুচারুরূপে বোনা কুহেলির জালের মধ্যেও সেই সুর নিহিত ছিল।

হোজা বইটি জমা দেওয়ার একমাস পরে সুলতান আমাদের সেই অবিশ্বাস্য অস্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। তার আদেশ আমাদের হতবাক করে দিল, এই সাফল্যের পিছনে বইটির ভূমিকা কতটা তা আমরা কোনোভাবেই নির্ধারণ করে উঠতে পারলাম না।

## ৯

'এবার শত্রু-নিধনকারী অবিশ্বাস্য অস্ত্রটির কথা ভাবা যাক,' এই মন্তব্য করার সময়ে সুলতানের মনে কী ছিল? তিনি সম্ভবত হোজাকে পরীক্ষা করছিলেন, হয়তো তার এমন কোনো স্বপ্ন ছিল যা তিনি হোজার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সম্ভবত তার প্রভুত্বকামী মা ও তাকে হয়রান করা পাশাদের তিনি দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তাকে ঘিরে থাকা 'দার্শনিকদের'ও উপযোগিতা আছে, বা তিনি ভেবেছিলেন যে প্লেগের পরে হোজা হয়তো আবার একবার অলৌকিক কিছু করে দেখাতে পারবে, সম্ভবত পরাজয়ের যেসব চিত্র আমাদের বইতে অঙ্কিত হয়েছিল সেগুলো দ্বারা তিনি প্রকৃতই প্রভাবিত হয়েছিলেন, অথবা এমনও হতে পারে যে কতিপয় সামরিক ব্যর্থতা তার মনে এই আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল যে তার পরিবর্তে তার ভাইকে ক্ষমতায় দেখতে ইচ্ছুক যারা তারা তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। অস্ত্র প্রকল্পে অর্থসংস্থানের জন্য সুলতান অগুনতি গ্রাম, সরাইখানা ও জলপাইকুঞ্জকে আমাদের নামে বরাদ্দ করে দিলেন। এসব উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ উপার্জনের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত সকল সম্ভাবনাই আমরা খতিয়ে দেখেছিলাম। হোজা স্থির করে নিয়েছিল যে নিজেদের উৎপাদিত বিস্ময় ছাড়া অন্য আর কিছুর দ্বারাই আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না। বছরের পর বছর ধরে সে সুলতানকে যত গল্প বলেছে, যত নিবন্ধ বা বই আমরা লিখেছি সে সবই কি মিথ্যে? সুলতান যখন সেগুলোকে বিশ্বাস করেছেন তখন আমরা সেগুলোর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করব? বিষয় এছাড়া আরও ছিল, আমাদের মনের গহীন কোণে কী চলছে তা নিয়ে সুলতান কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন। হোজা উত্তেজিত স্বরে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল যে আমরা যার জন্য এত দিন ধরে অপেক্ষা করেছি এটাই কি সেই কাঙ্ক্ষিত জয় নয়।

হ্যাঁ, এই সেই জয়। এবার আমরা সহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করলাম। কাজের ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা যেহেতু তার তুলনায় আমার কম ছিল, তাই আমি খুশীই ছিলাম। পরবর্তী ছয় বছর সে অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত রইল আর এই গোটা সময়টা বিপদ সর্বদা আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলত। বারুদ নিয়ে কাজ করতে হত বলে যে আমরা বিপদের ভয় পেতাম তা নয়, আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল—এই কারণেই ছিল বিপদের ভয়। আমরা সাফল্য অর্জন করি কি ব্যর্থ হই

তা দেখার জন্য প্রত্যেকেই মুখিয়ে ছিল এবং আমাদের বিপদ আরও বেশি ছিল কারণ আমরাও এই একই ভয়ে ভীত ছিলাম।

প্রথম শীতকালটা টেবিলেই নষ্ট হল। উত্তেজনা ও উৎসাহ আমাদের প্রচুর ছিল, কিন্তু অস্ত্রটি কীভাবে আমাদের শত্রুদের গুঁড়িয়ে দেবে তা ভাবতে বসে দেখলাম যে অস্ত্রটি সম্বন্ধে এক অস্পষ্ট ও বিমূর্ত কল্পনা ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। অতঃপর আমরা ঠিক করলাম যে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে বারুদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবো। অতীতের সেই আতসবাজী প্রদর্শনীর প্রস্তুতিপর্বের মতোই আমাদের নির্দেশ মোতাবেক লোকেরা বিভিন্ন অনুপাতে নানান পদার্থ মিশিয়ে তারপর নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাতে আগুন দিতে লাগল। আমরা তখন খানিক দূরে দীর্ঘ সব গাছের শীতল ছায়ায় বসে থাকতাম। নানান মাত্রার বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রঙিন ধোঁয়ার উদ্‌গীরণ দেখতে ইস্তাম্বুলের চতুর্দিক থেকেই কৌতূহলীরা এসে ভীড় জমাতো। আমরা একটি মাঠে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিলাম। সেখানে আমাদের নকশা অনুযায়ী ঢালাই করা ছোট ও লম্বা নলের কামান বসিয়ে লক্ষ্যভেদের জন্য চাঁদমারি টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। সেই মাঠে ভিড়ের চোটে বেশ একটা মেলা মতো বসে গেছিল। গ্রীষ্মের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়েই সুলতান নিজে এসে হাজির হলেন।

আমরা সুলতানের জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করলাম। আকাশ বাতাস বিস্ফোরণের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। আমরা তাকে কার্তুজের খাপ ও বারুদের সুষম মিশ্রণে প্রস্তুত কামানের গোলা দেখালাম এবং অদ্যাবধি ভাবনার স্তরে থাকা নতুন বন্দুক ও লম্বা নলযুক্ত কামানের ছাঁচ ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের পরিকল্পনার কথা শোনালাম। সুলতান অস্ত্রের থেকে আমার প্রতিই বেশি উৎসাহ দেখালেন। হোজা প্রথমে আমাকে তার থেকে দূরে দূরেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পরে তিনি যখন দেখলেন যে হোজার মতো আমিও নির্দেশ দিচ্ছি এবং আমাদের লোকেরা হোজার মতো আমার দিকেও নির্দেশের আশায় তাকিয়ে রয়েছে তখন তিনি আমার প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

পনেরো বছর পরে দ্বিতীয়বারের জন্য যখন আমাকে সুলতান সমীপে পেশ করা হল তখন তিনি এমনভাবে আমাকে দেখতে লাগলেন যেন তিনি আমাকে আগে কোথাও দেখেছেন কিন্তু স্থান-কাল-উপলক্ষ্য স্মরণ করতে পারছেন না। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি বোধহয় চোখ বুঁজে কেবল স্বাদের সাহায্যে কোনো ফলকে চেনার চেষ্টা করছেন। আমি তার বসনপ্রান্তে চুম্বন করলাম। এখানে আমি কুড়ি বছর ধরে আছি অথচ এখনও মুসলমান হইনি একথা জানার পরও তিনি বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। তার মাথায় অন্যকিছু ঘুরছিল, 'কুড়ি বছর?' তিনি বললেন, 'কী আশ্চর্য!' তারপর তিনি হঠাৎই আমাকে সেই প্রশ্নটি করে বসলেন, 'তবে কি আপনিই ওকে এসব শেখাচ্ছেন?' উত্তরের আশায় তিনি আমাকে এই প্রশ্ন করেননি কারণ ইতিমধ্যেই বারুদ ও সৈন্ধব লবণের গন্ধে ভরপুর আমাদের জীর্ণ তাঁবু ছেড়ে তিনি তার সুন্দর সাদা ঘোড়ার দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন। হঠাৎই তিনি থেমে গেলেন। আমরা দুজনে তখন পাশাপাশিই দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের দিকে ফিরে তিনি হাসলেন। তার হাসি দেখে মনে হল যে তিনি কোনো নিখুঁত বাসন বা পাত্রে রাখা

মটরদানার মতো একইরকম দেখতে দুই যমজ ভাইয়ের মতো এমন এক অতুলনীয় বিস্ময় প্রত্যক্ষ করছেন যা ঈশ্বর কেবল মানবতার গর্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করে থাকেন।

সেই রাতে আমি সুলতানের কথা ভাবছিলাম, কিন্তু হোজা যেভাবে ভাবাতে চাইছিল সেভাবে নয়। সে সুলতানের প্রতি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করছিল, কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সুলতানের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা আমার মনে আসবে না। তার সহজ সাবলীলতা, মিষ্টতা, অত্যধিক প্রশ্রয়ে বিগড়ে যাওয়া শিশুর মতো যা মনে আসে তাই বলে ফেলার স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার তার মতো হওয়ার ইচ্ছা হল, নিদেনপক্ষে আমি তার বন্ধু হতে চাইলাম। হোজার ক্ষোভ উদ্‌গীরণের পরে আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম আর ভাবছিলাম যে সুলতানকে এমন একজন মানুষ বলে মনে হয় যার ধোঁকা প্রাপ্য নয়। আমি তাকে সবকিছু বলে দিতে চাইলাম। কিন্তু সবকিছু যে বলব, সেই সবকিছুটা আসলে কী?

আমার উৎসাহের প্রতিদান পেতে দেরী হল না। একদিন হোজা যখন রাগত ভঙ্গীতে বলল যে সুলতান সেদিন সকালে আমাকেও প্রত্যাশা করছেন তখন আমি হোজার সঙ্গে গেলাম। সমুদ্র থেকে গন্ধ উঠে এসে শরতের সেই সকালটা ভরে দিয়েছিল। লাল ঝরাপাতায় ঢাকা এক অসাধারণ অরণ্যের ভিতরে এক মহীরূহের ছায়াঘেরা লিলি ফুলে ভরা এক পুকুরের ধারে আমরা সেই সকালটা কাটালাম। সুলতান পুকুরের জলে ছটফটিয়ে বেড়ানো ব্যাঙদের সম্বন্ধে কথা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু হোজা তাকে প্রশ্রয় দিল না। সে কেবল রঙ ও কল্পনাবর্জিত কিছু বস্তাপচা কথা বলে গেল। তার রূঢ়তায় আমার প্রবল ধাক্কা লাগলেও সুলতান তা লক্ষ্যই করলেন না। তিনি আমার প্রতিই অধিক উৎসাহী ছিলেন।

সুতরাং ব্যাঙদের লাফ দেওয়ার কায়দা, সংবহন পদ্ধতি, মাছি ও পোকামাকড় প্রভৃতি খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলে গেলাম। তাদের শরীর থেকে সতর্কতার সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে বার করে আনতে পারলে তারপরেও তা কেমন দীর্ঘক্ষণ ধরে দপ্‌দপ্ করতে থাকে তাও আমি তাকে শোনালাম। ডিম থেকে একাধিক ধাপের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাবয়ব ব্যাঙ কেমনভাবে তৈরি হয় তা আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি কাগজ-কলম চেয়ে আনালাম। চুনী বসানো রূপার রেকাবে চেপে খাগের কলম এল। তাই দিয়ে আমি যখন ছবি আঁকতে লাগলাম তখন সুলতান মনোযোগসহকারে তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ব্যাঙ সম্পর্কে আমার জানা যাবতীয় গল্পও তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শুনলেন। গল্প বলতে বলতে যখন রাজকুমারীর ব্যাঙকে চুম্বন করার জায়গাটা এল তখন তো তার দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল এবং তার মুখটাকে দুঃখী দুঃখী দেখাল। কিন্তু তবু তাকে আমি হোজা-বর্ণিত নির্বোধ কিশোর বলে মনে করতে পারলাম না। আদতে তিনি ছিলেন এমন এক গুরুগম্ভীর প্রাপ্তবয়স্ক যে প্রতিটি দিনই বিজ্ঞান ও শিল্প দিয়ে শুরু করতে চায়। শান্ত, নিমগ্ন সেই আলাপের গোটা সময়টাই হোজা ভুরু কুঁচকে কাটাল। সবশেষে সুলতান নিজের হাতে ধরা ব্যাঙের ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার এই সন্দেহ সবসময়েই ছিল যে আপনিই ওর গল্পগুলো তৈরি করে দেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে তার সঙ্গে আপনি

ছবিগুলোও এঁকে দিতেন।' তারপর তিনি আমার কাছে গোঁফধারী ব্যাঙদের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

এভাবে সুলতানের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটল। তারপর হোজা যখনই প্রাসাদে যেত আমিও তার সঙ্গে যেতাম। প্রাথমিকভাবে হোজা কথা শুরু করলেও সুলতানের সঙ্গে আমিই মূলত বাক্যালাপ চালাতাম। সুলতানের সঙ্গে তার স্বপ্ন, উদ্যম ও উৎসাহ, আতঙ্ক, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি তাকে একজন সূক্ষ্ম রসিকতাবোধসম্পন্ন, বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই চিনেছিলাম।

বছরের পর বছর ধরে হোজার চিত্রিত সুলতানের সঙ্গে আমার চেনা মানুষটির মিল কতটুকু তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতাম। তার চতুর প্রশ্ন ও বিচক্ষণতা দেখে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারতাম যে হোজার কতটা আমি এবং আমার কতটা হোজা তা তিনি আমাদের বইগুলো হাতে পাওয়ার মুহূর্ত থেকেই আন্দাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হোজা সেই সময়ে কামান এবং দীর্ঘ নল ঢালাই করার চেষ্টায় এতই ব্যস্ত ছিল যে এসব অনুমানে উৎসাহী হওয়ার কোনো অবকাশ তার ছিল না। তাছাড়া এমনিতেও সে এসবকে নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে করত।

কাজ শুরু করার মাস ছয়েক পরে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন জানতে পেরে হোজা সচকিত হয়ে উঠল। তার অভিযোগ ছিল যে আমরা গোলন্দাজির ব্যাপারে অযথা নাক গলাচ্ছি এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের নামে গোলন্দাজি শিল্পের সুখ্যাতি নষ্ট করছি। সে দাবি জানালো যে হয় তাকেই তার পদ থেকে অপসারণ করা হোক নতুবা গোলন্দাজির সুখ্যাতি নষ্টকারী এসব উন্মত্ত নির্বোধদের ইস্তাম্বুল থেকে বিতাড়ন করা হোক।

গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সমঝোতায় ইচ্ছুক বলে মনে হলেও হোজা সে পথে হাঁটল না। একমাস বাদে সুলতান যখন আমাদেরকে এমনভাবে অস্ত্রটি তৈরি করতে বললেন যাতে কামানের প্রয়োজন না পড়ে তখনো কিন্তু হোজাকে খুব একটা চিন্তিত দেখালো না। আমরা দুজনেই ততদিনে বুঝে গিয়েছিলাম যে বহু বছর ধরে ব্যবহৃত পুরনো কামানের চেয়ে আমাদের বানানো নতুন বন্দুক ও লম্বা নলের কামান খুব একটা উন্নতমানের কিছু হয়নি।

সুতরাং হোজার মতানুযায়ী আমরা আবারও এক নতুন দশায় প্রবেশ করলাম যেখানে আবার নতুন করে সবকিছুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করতে হবে। কিন্তু যেহেতু হোজার ক্রোধ ও স্বপ্নের সঙ্গে এতদিনে আমি পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম তাই সুলতানের সান্নিধ্যে আসাই আমার কাছে একমাত্র নতুন ব্যাপার ছিল। সুলতানও আমাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। মনোযোগী ও যত্নবান বাবা যেমন মার্বেল নিয়ে যুদ্ধরত দুই ভাইকে 'এটা তোমার, আর এটি তোমার' বলে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দেন ঠিক তেমনই তিনিও আমাদের বাচনভঙ্গি ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে পৃথকীকৃত করেছিলেন। কখনো শিশুসুলভ আবার কখনো বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণগুলো আমাকে রীতিমতো ভাবাতে শুরু করেছিল। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে আমার ব্যক্তিত্ব আমার অজ্ঞাতসারেই আমার থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে হোজার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং হোজার ক্ষেত্রেও ঠিক উল্টোটিই ঘটেছে।

সুলতান সেই কাল্পনিক সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের থেকেও বেশী চিনে ফেলেছেন।

আমরা যখন সুলতানের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতাম বা নতুন অস্ত্রটি নিয়ে কথা বলতাম আর তখন তো আমাদের অস্ত্রসংক্রান্ত স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবারও ছিল না— সুলতান তখন মাঝে মাঝেই হঠাৎ থেমে যেতেন এবং আমাদের কোনো একজনের দিকে ফিরে বলতেন, 'না, এটা ওর ভাবনা, আপনার নয়।' আবার কখনো কখনো তিনি আমাদের অঙ্গভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য করার চেষ্টা করতেন, 'আপনি এখন ঠিক ওর মতো করে তাকাচ্ছেন। নিজের মতো হোন।' আমি বিস্ময়ে হেসে ফেললে তিনি বলে উঠতেন, 'সাবাশ, এটা আগের থেকে ভাল। আপনারা কি কখনো দুজনে একসাথে আয়নার সামনে দাঁড়াননি?' এরপর আবার তিনি এও জিজ্ঞাসা করতেন যে আমরা যখন আয়নার সামনে যুগলে দাঁড়াতাম তখন আমাদের মধ্যে কোন্‌জন নিজস্বতা বজায় রাখতে পারত। একবার তো তিনি আমাদের লেখা নিবন্ধ, পশুকথামালা বা দিনপঞ্জী প্রভৃতি সবকিছুই বার করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রথমবার পড়ার সময় থেকেই তিনি আন্দাজ করার চেষ্টা করতেন যে সেসব লেখার কোন্ অংশ আমাদের মধ্যে কে লিখেছে বা যে লিখেছে সে নিজের লেখার কোন্ অংশটি নিজেকে অন্যজনের জায়গায় বসিয়ে নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে। একবার আমরা তার সামনে উপস্থিত থাকাকালীনই তিনি এক ভাঁড়কে ডেকে পাঠালেন। ভাঁড়টির উপস্থিতি হোজাকে প্রকৃতই ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল, কিন্তু আমি চূড়ান্ত হতবুদ্ধি ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম! মুখাবয়ব বা আকৃতি কোনো দিক দিয়েই লোকটির সঙ্গে আমাদের কোনো মিল ছিল না, সে ছিল বেঁটে ও মোটা এবং তার পোশাকও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু সে কথা বলা শুরু করতেই আমি চমকে গেলাম– যেন সে নয়, হোজা কথা বলছে। হোজার মতোই সে সুলতানের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ল যেন কোনো গোপন কথা ফিসফিস করে বলতে চাইছে, সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে হোজার মতোই সে তার কণ্ঠকে খাদে নামিয়ে সুগম্ভীর ও অনুচ্ছল করে তুলল এবং তারপর অবিকল হোজার মতোই নিজের বক্তব্যে নিহিত আবেগের বন্যায় হঠাৎই ভেসে গেল, শ্রোতাকে বোঝানোর চেষ্টায় অবিরাম হাত নাড়তে লাগল ও উত্তেজনায় তার দমবন্ধ হয়ে এল। হোজার অনুকরণে কথা বললেও সে কিন্তু নক্ষত্র বা অস্ত্র প্রকল্প নিয়ে একটিও কথা বলল না, তার বদলে প্রাসাদের রান্নাঘর থেকে শিখে আসা বিভিন্ন পদ ও সেসবের প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মশলার বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগল। সুলতান হাসতে লাগলেন আর ভাঁড়টি ইস্তাম্বুল থেকে আলেপ্পোর রাস্তায় যত সরাইখানা আছে তাদের নামের তালিকা হোজার ভঙ্গী নকল করে বলে যেতে লাগল। হোজার মুখ ঝুলে গেল। তারপর সুলতান আমাকে নকল করে দেখানোর জন্য ভাঁড়টিকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেতেই বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গীতে লোকটি আমার দিকে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমি বিস্ময়ে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম : এ তো আমি! কিন্তু অবাক হওয়ার আরো বাকী ছিল। তারপর সুলতান যখন তাকে অর্ধেক হোজা ও অর্ধেক আমি এমন কাউকে নকল করতে বললেন তখন আমি বিলকুল হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকটির নড়াচড়া দেখে আমার মুখ থেকে প্রায় সুলতানের মতোই প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'এ তো আমি,

আর এ হল হোজা।' লোকটি একবার আমার দিকে আর একবার হোজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছিল আর পর্যায়ক্রমে আমাদের নকল করে যাচ্ছিল। অবশেষে সুলতান তাকে বহুবিধ প্রশংসায় ভরিয়ে বিদায় দিলেন এবং যা দেখলাম তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্য আমাদের উপদেশ দিলেন।

সুলতান কী বলতে চেয়েছিলেন? সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যখন হোজাকে বললাম যে বহু বছর ধরে সুলতানকে সে যেমনভাবে বর্ণনা করে এসেছে তিনি প্রকৃতপক্ষে তার থেকে বহুগুণে বুদ্ধিমান এবং হোজা তাকে চালিত করতে চাইলেও তিনি তার নিজের অগ্রগতির অভিমুখ নিজেই খুঁজে নিয়েছেন তখন হোজা আরও একবার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। আমার মনে হল যে তার উষ্মা যথার্থ : ভাঁড়টির অনুকরণ সহ্য করা যায় না। হোজা জানিয়ে দিল যে বাধ্য না হলে আর সে প্রাসাদে পা রাখবে না। এতগুলো বছর ধরে অপেক্ষা করার পর সুযোগ যখন তার হাতের মুঠোয় অবশেষে এসেই গেছে তখন ওইসব নির্বোধদের সঙ্গে সময় নষ্ট করে আত্ম-অবমাননার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। কিন্তু সুলতানের উৎসাহ সম্বন্ধে আমি অবগত ছিলাম ও ভাঁড়ামি করার বুদ্ধিটুকুও আমার ছিল, তাই ঠিক হল যে হোজার বদলে আমিই প্রাসাদে যাব। সুলতানকে হোজার অসুস্থতার কথা জানালাম, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, 'ও তবে অস্ত্রটি নিয়েই ব্যস্ত থাকুক।' পরবর্তী চার বছর ধরে হোজা অস্ত্রটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণ নিয়ে ব্যস্ত রইল আর তার বদলে আমি প্রাসাদে হাজিরা দিতে লাগলাম। অতীতের আমির মতো হোজা নিজের স্বপ্ন নিয়ে ঘরবন্দী হয়ে থাকল।

এই চার বছরে আমি শিখেছিলাম যে জীবন নিছক কালাতিপাতের জন্য নয়, সে উপভোগ্য। সুলতানের কাছ থেকে আমিও হোজার মতোই সমাদর পাচ্ছি তা দেখার পরই সবাই নানা অনুষ্ঠান ও উদ্‌যাপনে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে শুরু করল। প্রাসাদে অনুষ্ঠান তো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একদিন কোনো অমাত্যর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তো পরের দিন সুলতানের আরও একটি সন্তান জন্মাচ্ছে, আবার কোনো একদিন তার পুত্রদের সুন্নৎ উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে তো আরেকদিন হাঙ্গেরীয়দের কাছ থেকে কোনো দুর্গ পুনরুদ্ধার উদ্‌যাপিত হচ্ছে বা কোনো রাজপুত্রের বিদ্যালয়ে প্রথম পদার্পণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এই করতে করতেই রমজান ও অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠান শুরু হয়ে যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন ধরে চলা এসব উৎসবে মশলাদার মাংস, পোলাও বা চিনির তৈরি সিংহ, উটপাখি, মৎস্যকন্যা বা বাদাম খেয়ে খেয়ে আমি দ্রুত স্থূলকায় হয়ে উঠলাম। আমার সময়ের বেশীরভাগটাই নানান প্রদর্শনী দেখতে দেখতে কেটে যেত : তেল-চুকচুকে কুস্তিগীররা অজ্ঞান হয়ে না পড়া পর্যন্ত লড়াই চালাচ্ছে, মসজিদের দুই মিনারে বাঁধা দড়ির উপরে পিঠে বাঁধা লাঠি নিয়ে লোফালুফি করতে করতে লোক হাঁটছে, দাঁত দিয়ে ঘোড়ার নাল চিবিয়ে ফেলছে, নিজেদের শরীরে ছুরি বা শিক গেঁথে দিচ্ছে, জাদুকরেরা তাদের পোশাকের ভিতর থেকে সাপ, পায়রা বা বাঁনর বার করে আনছে, চোখের পলকে শূন্য থেকে কফির কাপ এনে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে বা আমাদের পকেট থেকে পয়সা গায়েব করে দিচ্ছে। এছাড়াও ছিল কারাগোজ ও হাজিওয়াতের ছায়ার কারসাজি, সেই কারসাজিতে অশ্লীলতার মিশেল

আমার ভারি পছন্দ ছিল। রাতে আতসবাজীর কোনো প্রদর্শনী না থাকলে আমি আমার সদ্য আলাপ হওয়া নতুন বন্ধুদের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রাসাদে গিয়ে হাজির হতাম। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মদ্যপান ও সঙ্গীত শ্রবণের পরে আলস্যঘন কুরঙ্গের ভঙ্গিমাসম্পন্ন সুন্দরী নর্তকী, জলের উপর হেঁটে বেড়ানো সুঠাম পুরুষ বা বলিষ্ঠ কণ্ঠধারী গায়কদের আনন্দমুখর ও উদ্দীপক গানের সঙ্গে কাচের পেয়ালায় টুংটাং আওয়াজ তুলে কালহরণ করতাম।

আমি প্রায়শই দূতদের প্রাসাদে যেতাম। তারা আমাকে নিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিল। সেখানে সুন্দর দেহসৌষ্ঠবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নাচ দেখার পর বা ভেনিস থেকে আগত কোনো অর্কেস্ট্রার ঢক্কানিনাদপূর্ণ বৃন্দবাদন শোনার শেষে আমি নিজের ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সূত্রে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো উপভোগ করতাম। দূতাবাসগুলোতে উপস্থিত ইউরোপীয়রা আমার ভয়ংকর সব অভিযান সম্বন্ধে জানতে চাইত, আমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে, কত কিছু সহ্য করতে হয়েছে তা ভেবে তারা অবাক হয়ে যেত। চার দেওয়ালের মধ্যে ঝিমোতে ঝিমোতে অর্থহীন সব বই লিখেই যে আমি সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছি তা আমি তাদের কাছে লুকিয়ে যেতাম, তার বদলে এই বিচিত্রসুন্দর দেশ সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব গল্প তৎক্ষণাৎ বানিয়ে তাদেরকে শুনিয়ে দিতাম। সুলতানের ক্ষেত্রেও আমার এভাবে গল্প বানাবার অভ্যাস ছিল। প্রাক-বিবাহ দর্শন দেওয়ার জন্য নিজ নিজ পিতাদের সঙ্গে হাজিরা দেওয়া যুবতীরা বা আমার সঙ্গে প্রণয়রঙ্গে ব্যস্ত দূতদের স্ত্রীরাই শুধু নয়, তাদের সাথে সাথে বিশিষ্ট দূত ও আধিকারিকরাও ধর্ম, হিংসা, প্রেম ও হারেম সম্পর্কিত আমার উদ্ভাবিত গল্পগুলো সপ্রশংস দৃষ্টিসহকারে শুনত। তারা পীড়াপীড়ি করলে আমি ফিসফিসিয়ে সাম্রাজ্য সম্পর্কিত দু-একটি গোপন কথা বা সুলতানের কয়েকটি অদ্ভুত অভ্যাসের কথাও শুনিয়ে দিতাম। এসব গোপন কথা সম্বন্ধে কেউই কিছু জানত না কারণ ওখানে দাঁড়িয়েই আমি সেগুলো উদ্ভাবন করতাম। এরপরেও যখন তারা আরও তথ্য জানতে চাইত তখন আমি নিজেকে ঘিরে একটা গোপনীয়তার বাতাবরণ তৈরী করে ফেলতাম। আমি এমন ভাব করতাম যেন আমি যা জানি তার সবকিছুই আমি বলতে পারব না, আমি নীরবতার আশ্রয় নিতাম। তার ফলে নির্বোধগুলোর কৌতূহল আরও বেড়ে যেত। কিন্তু আমি জানতাম যে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে যে আমি নিশ্চয়ই এমন কোনো বিপুল ও রহস্যময় প্রকল্প এবং অভূতপূর্ব অস্ত্রের নকশার সঙ্গে জড়িত যাতে বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি ও অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ উভয়ই প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যাবেলায় ফেরার সময়ে প্রাসাদে দেখা সুঠাম শরীরগুলো আমার চোখে ভাসতে থাকত এবং সেখানকার পরিবেশ থেকে আহৃত স্ফূর্তির বাষ্পে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। বাড়িতে ফিরে দেখতাম হোজা আমাদের কুড়ি বছরের পুরনো টেবিলটায় বসে আছে। অগুনতি অদ্ভুতুড়ে ছবি, অবোধ্য নমুনা, মরীয়া আঁকিবুঁকিতে ভর্তি পাতার পর পাতা টেবিলজুড়ে পড়ে আছে এবং সে এক অভূতপূর্ব ব্যস্ততায় সেসব নিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছে। আমায় সামনে পেয়ে সে জানতে চাইত যে আমি সারাদিন কী কী দেখলাম ও করলাম, কিন্তু এসব চিত্তবিনোদনকে সে বেহায়াপনা ও নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করত, ফলে সে শীঘ্রই বিরক্ত হয়ে যেত এবং আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তার নিজের পরিকল্পনার কথা, 'আমাদের' ও 'তাদের' কথা বলতে শুরু করে দিত।

এরপর সে আরও একবার মনে করিয়ে দিত যে সবকিছুই আমাদের মনের অজানা আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই সে তার সম্পূর্ণ প্রকল্পটি গড়ে তুলেছিল। বহু জিনিষে পরিপূর্ণ দেরাজের সঙ্গে তুলনীয় আমাদের মস্তিষ্কের গঠন কীভাবে অস্ত্রের নকশা তৈরিতে সহায়ক হতে পারে তা আমার বোধগম্য হত না। অথচ এই অস্ত্রের উপরেই তার, শুধু তার কেন, আমাদের যাবতীয় আশা ন্যস্ত ছিল। একদা আমার অন্যরকম ধারণা ছিল, কিন্তু এখন আমাদের আশা পূরণে অস্ত্রটির গুরুত্ব কতখানি তার সঠিক আন্দাজ করা কারোর পক্ষেই, এমনকি হোজার পক্ষেও সম্ভব নয় বলেই আমার সন্দেহ হত। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে মানব মস্তিষ্কের যাবতীয় রহস্য কোনো একদিন কেউ না কেউ উন্মোচন করবেই আর সেদিনই তার যাবতীয় ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। প্লেগের প্রকোপের সময় আয়নার সামনে আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড়াতে দেখে তার মনে নাকি এক মহান সত্যের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে, সবকিছু তার সামনে এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং ওই সত্যোপলব্ধির মুহূর্তটির মধ্যেই নাকি অস্ত্রটির সংঘটন পদ্ধতি লুকিয়ে রয়েছে। বোধগম্য না হলেও এসব কথা শুনে আমি প্রভাবিত হয়ে পড়তাম। কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে কাগজের উপর আঁকা এক অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য আকৃতির দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

প্রতিবারই আকৃতিটি দেখার সময়ে লক্ষ্য করতাম যে সেটি আর একটু সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। কালো ছোপের মতো আকৃতিটি আমাকে কিছু একটার কথা মনে করিয়ে দিত। তার সঙ্গে কীসের মিল আছে তা তার দিকে তাকালেই যেন আমার মুখে প্রায় এসে যেত, কিন্তু মুহূর্তের দ্বিধায় বা আমার মন আমাকে নিয়ে খেলছে এরূপ মনে করে আমি চুপ করে থাকতাম। চার বছর ধরে পাতার পর পাতা জুড়ে থাকা ওই আকৃতিটির ছবি সে আমাকে দেখিয়ে গেছে এবং সামান্যতম পরিমার্জন ঘটালেও সে তাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তবুও তার আকার আমার কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়নি। অবশেষে বহু বছরব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অপরিসীম অর্থব্যয়ের পরে আকৃতিটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল। দেখার পরে তাকে কখনো আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস বলে মনে হল, কখনো আমাদের স্বপ্নে দেখা ছবি বলে মনে হল তো আবার কখনো আমাদের অতীত স্মৃতিচারণায় চর্চিত দু'একটি জিনিসের মতোও মনে হল। কিন্তু মনে ভেসে ওঠা দৃশ্যকল্পগুলোর মধ্যে কোনোটিকেই আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বাকিগুলোর থেকে এগিয়ে রাখতে পারলাম না। তাই বিভ্রান্তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি অপেক্ষায় রইলাম অস্ত্রটি কখন আপন রহস্য নিজেই উন্মোচন করে। চার বছর বাদে সেই ছোট্ট কালো ছোপটি বিশাল এক মসজিদের মতো আয়তন বিশিষ্ট এবং ভয়জাগানো প্রেতের মতো এক অদ্ভুত দর্শন বস্তুতে পরিণত হল। হোজা তাকে এক প্রকৃত যুদ্ধাস্ত্র বলে অভিহিত করল এবং গোটা ইস্তাম্বুলের প্রত্যেকেই তার সঙ্গে কিছু না কিছুর মিল খুঁজে পেল। অস্ত্রটি কেমনভাবে জয়ের পথ সুগম করবে সে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা হোজা আমাকে আগেই দিয়েছিল কিন্তু তবু তা নিয়ে আমার ধোঁয়াশা কাটল না। ঘুম ভাঙার পরে বিস্মৃতপ্রায় কোনো স্বপ্নকে মনে করার জন্য মস্তিষ্ককে যেমন প্রবল পরিশ্রম করতে হয়, আমাকেও তেমনি অতীব কষ্টে অস্ত্রসম্পর্কিত ভয়ংকর খুঁটিনাটিগুলো আবার

সুলতানসমীপে পেশ করতে হত। হোজার কাছ থেকে অগুন্তিবার শোনা চাকা, গুলতিসদৃশ নিক্ষেপণ যন্ত্র, গম্বুজ, বারুদ ও লিভারের কথা আমি আবার তার সামনে উপস্থাপন করতাম। আমার কথায় ব্যবহৃত শব্দগুলোও আমার ছিল না, আবার শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোজার তীব্র আবেগের কণামাত্রও আমার কণ্ঠে থাকত না, তবুও সুলতান তাতেই প্রভাবিত হতেন। জয় ও মুক্তি সম্পর্কে হোজার দীপ্ত কাব্যিক উচ্ছ্বাস আমার ধোঁয়াশাভরা উপস্থাপনায় নিতান্তই অমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুলতানের মতো গুরুগম্ভীর মানুষ যে আশায় বুক বাঁধছেন এই ব্যাপারটা আমাকেও প্রভাবিত করত। সুলতান বলতেন যে আমিই হলাম হোজা অথচ হোজা তখন বাড়িতে বসে আছে। তার এসব বৌদ্ধিক লেখা আমার মস্তিষ্ককে পুরোপুরি গুলিয়ে দিলেও আমাকে আর বিস্মিত করতে পারত না। তিনি যখন আমাকে হোজা বলে অভিহিত করতেন তখন আমার মনে হত যে তার যুক্তিকে অনুসরণ করার চেষ্টা না করাই শ্রেয় কারণ শীঘ্রই তো তিনি আবার বলবেন যে আমিই হোজাকে এসব শিখিয়েছি। এই আমি বর্তমানের অলস আমি নই, এই আমি সুদূর অতীতের সেই আমি যে হোজাকে পাল্টে দিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে আমার কেবল তার সাথে বিনোদন, জন্তু-জানোয়ার, অতীতের উৎসব বা দোকানদারদের শোভাযাত্রার প্রস্তুতি প্রভৃতি নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা হত। এরপরে সুলতান এও বলেছিলেন যে আমিই যে আদতে অস্ত্রপ্রকল্পটির প্রকৃত প্রাণপুরুষ তা নাকি সকলেই জানে।

এই ব্যাপারটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে তুলল। হোজাকে জনসমক্ষে বহু বছর দেখা যায়নি, লোকে এখন তাকে প্রায় ভুলেই গেছে। হোজার বদলে আমাকেই এখন প্রাসাদে বা শহরে সুলতানের পাশে পাশে প্রায়শই দেখা যায়। এখন তারা আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। তারা এখন আমার মতো এক অবিশ্বাসীর প্রতি দাঁত কিড়মিড় করছে। তার কারণ শুধু এই নয় যে বহু মেষপাল, জলপাইকুঞ্জ বা সরাইখানা থেকে উপার্জিত অর্থ এক দুর্জ্ঞেয় অস্ত্রপ্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বা আমি সুলতানের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, এগুলোর থেকেও বড় কারণ হচ্ছে এই যে অস্ত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেকের বিষয়ে নাক গলিয়ে ফেলেছি। তাদের কুৎসা যখন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না তখন আমি আমার আতঙ্কের কথা হোজা ও সুলতানকে জানালাম।

কিন্তু তাদের কাছ থেকে খুব একটা সাড়া পাওয়া গেল না। হোজা তো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কাজের মধ্যে ডুবিয়েই রেখেছিল। বৃদ্ধরা যেমন যৌবনের দুর্দমনীয় আবেগের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ থাকে আমিও তেমনি হোজার ক্রোধসঞ্চারের প্রত্যাশায় ছিলাম। বিগত কয়েক মাস ধরেই হোজার দম ফেলার ফুরসৎ ছিল না। সেই কালো দুর্বোধ্য ছোপ এক দৈত্যাকৃতি অস্ত্রের রূপ নিল এবং কামানের পক্ষেও অভেদ্য এমন পুরু লোহার পাত দিয়ে তা ঢালাই করতে গিয়ে সে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জলের মতো খরচ করতে লাগল যে আমার কোনো কথা সে কানেই তুলল না। তার কেবল দূতদের প্রাসাদ নিয়ে উৎসাহ ছিল কারণ সেখানে তার কাজের চর্চা চলত। হোজা জানতে চাইত এসব দূতেরা কেমন প্রকৃতির মানুষ, তারা কী ভাবে, এই অস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কোনো মতামত আছে কিনা এবং সর্বোপরি, তাদের দেশে আমাদের সাম্রাজ্যের দূতাবাস স্থাপনার্থে দূত প্রেরণের কথা সুলতান কখনো ভাবেন না কেন?

আমি বুঝতে পারতাম যে সে নিজের জন্য ওই পদটি কামনা করত যাতে সে এখানকার নির্বোধদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার কথা সে কখনো ব্যক্ত করেনি, এমনকি হতাশা যখন তাকে গ্রাস করত যেমন কোনোদিন হয়তো ঢালাইয়ের পরে তাতে ফাটল দেখা দিল বা অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল, তখনো সে এই ইচ্ছার কথা মুখে আনেনি। কেবল একবার কি দু'বার সে মুখ ফুটে বলে ফেলেছিল যে সে তাদের, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। তার আশা ছিল যে মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তর নিয়ে তার আবিষ্কার সম্ভবত তারা বুঝতে পারবে। ভেনিস, ফ্ল্যাণ্ডার্স বা বহু দূরবর্তী যে কোনো দেশের কথাই যদি সেই সময় তার মনে পড়ত তবে সেই দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই সে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইত। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারা, তারা কোথায় বাস করে, তাদের সঙ্গে কীভাবে যোগযোগ করা যেতে পারে—এসব কি আমি দূতদের কাছ থেকে জানতে পারি? সেই সময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমার উৎসাহ খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। হোজার আশা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতাশা নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কৌতুক অনুভব করত আর আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

শক্রদের কেচ্ছায় সুলতানও কোনো পাত্তা দিলেন না। অস্ত্রটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। হোজা এমন একজন সাহসী লোক খুঁজছিল যে ওই পাহাড়সদৃশ ভয়ংকর ধাতব অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ও লোহার জং-এর শ্বাসরোধী গন্ধ সহ্য করে যন্ত্রের চাকাটা ঘোরাতে পারবে। এই সময়ে সুলতানের কাছে আমার আশঙ্কার কথা জানাতে গেলে তিনি তা শোনারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তার বদলে সর্বদা তিনি যেমন করেন তেমনই হোজার বক্তব্য আমার মুখ থেকে শুনে নিতেন। তিনি হোজাকে বিশ্বাস করতেন, সবকিছু নিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন, হোজার উপরে বিশ্বাস রাখায় তার কোনো আক্ষেপও ছিল না। এসবের জন্যই তিনি আমার প্রতি কৃতার্থ ছিলেন, কারণ আমিই তো নাকি তাকে সবকিছু শিখিয়েছি। হোজার মতোই তিনিও মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তর নিয়ে কথা বলতেন এবং তারপর নিজের এই উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অপর প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন। হোজার মতো সুলতানও আমার কাছে জানতে চাইলেন যে আমার পুরনো দেশে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করে। আমি সুলতানকে স্বপ্নের সাহায্যে মাতিয়ে রাখতাম। আমার গল্পগুলো প্রকৃতই আমার যৌবনের অভিজ্ঞতার ফসল নাকি আমার কলম বেয়ে নেমে আসা কল্পদৃশ্যের সংকলন মাত্র তা এখন আর আমি বলতে পারব না। তবে তারা যাই হোক না কেন বার বার বলতে বলতে আমি তাদেরকে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। তবে একথাও ঠিক যে কখনো কখনো দু-একটি মজাদার কাহিনী হঠাৎ মাথায় এলে তা আমি বানিয়েও বলে দিতাম। আবার বার বার বলতে বলতেও কিছু গল্প তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পোশাকের খুঁটিনাটিতে সুলতানের উৎসাহ– ছিল বলে আমি আমার গল্পের চরিত্রদের পোশাকে অগুনতি বোতাম জুড়ে দিতাম। গল্পের উৎসস্থল আমার স্মৃতি না স্বপ্ন তা নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও তাতে অগুনতি বোতামের বর্ণনাটা রাখতে ভুলতাম না। কিন্তু এমন কিছু কাহিনীও ছিল যা বাস্তবিকই ঘটেছিল এবং যা আমি পঁচিশ বছরেও ভুলিনি। লেবু গাছের তলায় রাখা টেবিলে বসে প্রাতরাশ সারার সময়ে মা-বাবা, ভাইবোনেদের সঙ্গে আমার কথোপকথন আজও আমার স্মৃতিতে সজীব! কিন্তু এই

খুঁটিনাটিগুলোই সুলতানকে সবচেয়ে কম আকর্ষণ করত। তিনি একবার আমাকে এমনও বলেছিলেন যে প্রতিটি জীবনই আসলে অন্য আরেকটি জীবনের মতোই। কি জানি কেন তার এই বক্তব্য আমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, সুলতানের মুখে শয়তানির এমন প্রকাশ এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। এই বক্তব্যের দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চাইছেন তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। আশঙ্কিতচিত্তে তার মুখের দিকে তাকালেও আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে বলি 'আমি আমিই'। এই অর্থহীন বাক্যবন্ধটি বলতে পারলেই যেন আমাকে অন্য কোনো ব্যক্তিতে পরিণত করে দেওয়ার যে খেলা হোজা ও সুলতান খেলছিলেন এবং নানান গুজব তাতে ঘি ঢালছিল সেই খেলা আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম এবং নিজের অস্তিত্বের সীমার মধ্যে আবার শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারতাম। কিন্তু কিছু বলে উঠতে পারলাম না। নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো অনিশ্চয়তার উল্লেখেও মানুষ যেমন কুঁকড়ে যায় আমিও তেমনি আতঙ্কে চুপ করে রইলাম।

এসব বসন্তকালের কথা। হোজা ততদিনে অস্ত্রের কাজ শেষ করে ফেললেও তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেনি কারণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লোক সে জোগাড় করে উঠতে পারেনি। এর অব্যবহিত পরেই আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে সুলতান হঠাৎই তার বাহিনী নিয়ে পোলদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বিধ্বংসী অস্ত্রটি কেন সঙ্গে নিলেন না, কেন আমাকে নিলেন না, আমাদেরকে কি তিনি বিশ্বাস করেন না? ইস্তাম্বুলে পড়ে থাকা বাকিদের মতো আমরাও ধরে নিলাম যে সুলতান যুদ্ধ নয়, শিকার করতে গেছেন। আরও এক বছর সময় হাতে পেয়ে যাওয়ায় হোজাও খুশি হল, আর আমারও যেহেতু কোনো কাজ বা বিনোদন ছিল না তাই আমরা আবার অস্ত্রটি নিয়ে একযোগে কাজ করতে লাগলাম।

যন্ত্রটি চালনা করার জন্য লোক নিয়োগ করতে গিয়ে মহাসমস্যা দেখা দিল। ভয়ংকর ও রহস্যময় যন্ত্রটির ভেতরে প্রবেশ করতে কেউই রাজী হচ্ছিল না। হোজা জানিয়ে দিল যে সে অনেক বেশি মজুরী দেবে। শহর, জাহাজঘাটা, কামারশালা সর্বত্র আমরা ঢেঁড়া পেটাবার ব্যবস্থা করলাম, কফির দোকানে বসে থাকা অলস, গৃহহীন বা অভিযানপ্রিয় লোকদের মধ্যেও সন্ধান করতে লাগলাম। যাদের পাওয়া গেল তারা ভয়কে জয় করে ওই লোহার স্তূপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল বটে, কিন্তু ভেতরের অসহ্য গরমে চাকা ঘোরাতে না পেরে শীঘ্রই পালিয়ে গেল। গ্রীষ্মের শেষাশেষি যখন যন্ত্রটাকে শেষ পর্যন্ত নড়ানো গেল ততদিনে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কৌতূহলীদের হতভম্ব ও ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে কোনোরকমে যন্ত্রটাকে খাড়া করা হল, চতুর্দিকের উচ্ছ্বাসের মাঝে কাল্পনিক কোনো দুর্গের উদ্দেশ্যে তার থেকে গোলা ছিটকে বেরোল এবং তারপর যন্ত্রটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম ও জলপাইকুঞ্জগুলো থেকে আরও অর্থ আসতে লাগল, কিন্তু যন্ত্রচালনার দলটিকে ধরে রাখা এতই ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়াল যে হোজা লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

শীতকাল অপেক্ষাতেই কেটে গেল। অভিযান থেকে ফেরার সময়ে সুলতান তার প্রিয় এডির্নেতে থেমে গিয়েছিলেন। কেউই আমাদের খোঁজ করল না, আমরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে রইলাম। সকালে গিয়ে গল্প শুনিয়ে কারোর মনোরঞ্জন করব এমন কেউ

প্রাসাদে ছিল না, আবার সন্ধ্যাবেলা আমার মনোরঞ্জন করতে পারে এমন কেউও হর্ম্যগুলোতে ছিল না, ফলে আমাদের কিছুই করার রইল না। ভেনিসের এক চিত্রশিল্পীকে দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে ও সঙ্গীত শিক্ষা করে আমি দিন কাটাচ্ছিলাম আর হোজা মুহুর্মুহু কুলেদিবির পুরনো প্রাচীরের গায়ে তার অস্ত্রের হাল দেখতে ছুটে যাচ্ছিল। অস্ত্রটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য সেখানে একজন রক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছিল। অস্ত্রটির এদিক ওদিক টুকটাক নতুন কিছু যোগ না করতে পারলে হোজা শান্তি পেত না, কিন্তু তাতেও সে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমাদের একত্রে কাটানো শেষ শীতের রাতগুলোতে সে তার অস্ত্র বা অস্ত্রসম্পর্কিত পরিকল্পনা কোনোকিছু নিয়েই আর কথা বলত না। একধরনের আলস্য তাকে গ্রাস করেছিল, তবে তার কারণ এই নয় যে তার উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, আসলে আমার অনুপ্রেরণার অভাবে তাকে আলস্য চেপে ধরেছিল।

রাতের অধিকাংশ সময় আমরা অপেক্ষা করেই কাটাতাম, কখনো বাতাস বা তুষারপাত থামার অপেক্ষা, কখনো গভীর রাতের রাস্তায় পথিকের শেষ কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা আবার কখনো বা আগুন নিভে আসার অপেক্ষা যাতে আমরা চুল্লীতে আরও কাঠ ঠেসে দিতে পারি। এরকমই এক শীতের রাতে হোজা হঠাৎ বলে বসল যে আমি নাকি অনেকটাই পাল্টে গেছি, আমি নাকি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ বনে গেছি। সেদিন আমরা খুব অল্পই কথা বলছিলাম, মূলত নিজ নিজ চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম। হোজার কথা শুনে আমার পেটে জ্বলুনি শুরু হল, আমি ঘামতে লাগলাম। আমি তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি সাজাতে চাইছিলাম, তাকে বলতে চাইছিলাম যে সে ভুল করছে, আমি বরাবর যেমন ছিলাম তেমনই আছি, আমাদের একে অপরের সঙ্গে অনেক মিল, আগের মতো আমার প্রতি তার মনোযোগ দেওয়া উচিত, এখন বহু বিষয় নিয়ে আমাদের কথা বলার আছে। কিন্তু না, সেই তো ঠিক বলছিল! দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা নিজের প্রতিকৃতিতে আমার চোখ আটকে গেল। সেদিন সকালেই বাড়িতে নিয়ে আসা প্রতিকৃতিটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছিল যে আমি পাল্টে গেছি : ভোজের আসরে খেয়ে খেয়ে আমি মোটা হয়ে গেছি, আমার দ্বৈত চিবুক তৈরি হয়েছে, আমার ত্বক শিথিল হয়ে পড়েছে, আমার নড়াচড়া শ্লথ হয়ে গেছে এবং আরও খারাপ ব্যাপার হল এই যে আমার মুখটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে। প্রমত্ত হুল্লোড়বাজদের সঙ্গে পানাহার ও সঙ্গমের ফলশ্রুতি হিসেবে আমার মুখের কোণায় একটা অভব্য ভাব ফুটে উঠেছে, বেখাপ্পা সময়ে ঘুমানো ও পানোন্মত্ততার জন্য চোখে একটা নিস্তেজ ভাব এসেছে এবং নিজেদের ও নিজেদের জীবন নিয়ে ও এই দুনিয়া নিয়ে যেসব নির্বোধ তৃপ্ত বোধ করে তাদের মতো আমার দৃষ্টিতেও এক অমার্জিত আত্মসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে। তবে আমি এও জানতাম যে আমি আমার নতুন অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট, তাই আমি কিছু বললাম না।

পরে আমাদেরকে জানানো হয়েছিল যে সুলতান যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে অস্ত্রসহ আমাদেরকে এডির্নেতে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই খবর জানার আগে পর্যন্ত একটি স্বপ্ন বার বার আমার ঘুমের মধ্যে ফিরে আসত : ভেনিসে এক মুখোশপরা নাচের আসরে আমরা উপস্থিত হয়েছি। হুড়োহুড়িতে যা ইস্তাম্বুলের ভোজসভার মতোই। সেখানে উপস্থিত জনতা যখন মুখোশ খুলে ফেলল তখন আমি ভিড়ের মধ্যে আমার

মা ও প্রেমিকাকে চিনতে পারলাম। তারাও আমাকে চিনতে পারবে এই আশায় আমিও মুখোশ খুলে ফেললাম, কিন্তু তারা আমাকে চিনতে পারল না, আমার বদলে তারা আমার পিছনে দাঁড়ানো কারোর দিকে তাদের মুখোশ তুলে দেখাতে লাগল। আমি দেখার জন্য পিছনে ফিরতেই বুঝতে পারলাম যে তারা যাকে দেখাচ্ছে সে হল হোজা। হোজা তো জানবে যে আমিই হলাম আমি। তাই সে আমাকে চিনতে পারবে এই বিশ্বাসে তার দিকে এগিয়ে যেতে হোজা বলে যে লোকটিকে ভাবছিলাম সে কোনো কথা না বলে তার মুখ থেকে মুখোশটা সরিয়ে নিল এবং সেই মুখোশের পিছন থেকে জেগে উঠল আমার যৌবনের মুখচ্ছবি, সঙ্গে সঙ্গে এক অপরাধবোধের যন্ত্রণা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলল এবং প্রতিবারই আমার স্বপ্নটা এই জায়গাতেই ভেঙ্গে যেত।

# ১০

গ্রীষ্মের শুরুতে যে মুহূর্তে খবর এল যে সুলতান অস্ত্র ও আমাদের আশায় এডির্নেতে অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে সঙ্গে হোজা কর্মতৎপর হয়ে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে হোজা অস্ত্রচালক দলটির সঙ্গে গোটা শীতকাল জুড়েই যোগাযোগ রেখে গেছে এবং সবকিছু বিলকুল তৈরী রেখেছে। তিনদিনের মধ্যেই আমরা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। হোজা শেষ রাত্রিটি এমন ব্যস্ততার মধ্যে কাটাল যেন তার পরের দিনই আমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাব। বাঁধাই খুলে আসা পুরনো বই, অর্ধসমাপ্ত নিবন্ধ, বহু রচনার হলদে হয়ে আসা প্রাথমিক খসড়া বা নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র প্রভৃতি সে টেনে বের করল, মরচে পড়া প্রার্থনা ঘড়িটি আবার চালু করল, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতিগুলো ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করল। পঁচিশ বছর ধরে লেখা যাবতীয় বইয়ের খসড়া এবং বিভিন্ন অস্ত্রের নমুনা ও নকশা প্রভৃতি ঘাঁটাঘাঁটি করে সে রাত পার করে দিল। প্রথম আতসবাজী প্রদর্শনীর সময়ে আমি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলাম এবং সেই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণগুলো একটি ছোট নোটবইয়ে লিখে রেখেছিলাম। সূর্যোদয়ের সময়ে দেখলাম যে সে সেই নোটবইটির হলদে হয়ে যাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া পাতা ওলটাচ্ছে। আমি তাকে লক্ষ্য করছি দেখে সে সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করল : এগুলো কি আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত? আমার কি মনে হয় এদের কি আর কোনো দরকার আছে? কিন্তু তারপর যখন সে দেখল যে আমি তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি তখন সে বিরক্তির চোটে জিনিসগুলো এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

যাই হোক না কেন, আমরা এডির্নের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দশদিনব্যাপী এই যাত্রাকালে অতীতের মতো অতটা না হলেও আমরা পরস্পরের অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। সর্বোপরি হোজাকে আশাবাদী দেখাচ্ছিল। লোকে আমাদের অস্ত্রটিকে সৃষ্টিছাড়া, পতঙ্গ, শয়তান, কচ্ছপ, ধানুকী, চলমান চূড়া, লৌহস্তূপ, লাল মোরগ, চাকার উপর চাপানো কেটলি, দৈত্য, একচোখা দানব, রাক্ষস, শুয়োর, জিপসী, নীলচোখো ক্ষ্যাপাটে এবং না জানি আরও কত নামে ডাকছিল। বহু বিশেষণে বিশেষিত অস্ত্রটি রোমহর্ষক প্রবল চিৎকার ও আর্তনাদের মধ্যে অবশেষে অতি ধীরে রাস্তায় নামল। হোজা যা আশা করেছিল তার চেয়েও বেশি গতিতে অস্ত্রটি চলতে লাগল। চারিপাশের গ্রাম থেকে আগত কৌতূহলীরা রাস্তার দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা অস্ত্রটির কাছাকাছি যেতে ভয় পেলেও তাকে একবার দেখার জন্য

হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। এসব দেখে হোজা খুশি হল। অন্ধকার হওয়ার পরে এক জায়গায় তাঁবু পড়ল। আমাদের লোকেরা দিনভর ঘাম, রক্ত, চোখের জল ঝরিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে দ্রুত গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। তখন বাইরে ঝিঁঝির ডাক থেকে রাতের নিস্তব্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল। এই সময় হোজা আমার কাছে তার লাল মোরগের ধ্বংসক্ষমতা বর্ণনা করছিল। একথা ঠিক যে সে আর আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত না। এও সত্যি যে অস্ত্রটির প্রতি সুলতানের ঘনিষ্ঠতম বৃত্ত বা সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে বা আক্রমণের ব্যূহ রচনায় অস্ত্রটির গুরুত্ব বা স্থান নিয়ে সে আমার মতোই চিন্তিত ছিল। তথাপি সে তখনো তৃপ্তি ও নিশ্চয়তাসহকারে আমাদের 'শেষ সুযোগ' সম্বন্ধে, ঘটনাক্রমকে আমাদের নিজেদের স্বপক্ষে আনতে পারা নিয়ে এবং সর্বোপরি, তার বরাবরের বাতিক, 'তাদের ও আমাদের' সম্বন্ধে কথা বলে যাচ্ছিল।

এডির্নেতে প্রবেশের সময়ে অস্ত্রটি যা অভ্যর্থনা পেল তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে সুলতান ও তার সঙ্গী কিছু বেহায়া চাটুকার ছাড়া আর কারোর মধ্যেই অস্ত্রটি নিয়ে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। সুলতান হোজাকে একজন পুরনো বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে প্রচুর গুজব শোনা গেলেও প্রস্তুতি বা ব্যস্ততা খুব অল্পই চোখে পড়ল। সুলতান ও হোজা আবার একত্রে দিনাতিপাত শুরু করলেন আর আমিও তাদের সঙ্গে যোগদান করলাম। তারা যখন ঘোড়ায় চেপে সন্নিহিত ঘন জঙ্গলে পাখির গান শুনতে যেতেন, ব্যাঙ দেখার জন্য তুঞ্জা বা মেরিচ নদীতে নৌকা বেয়ে বহুদূর চলে যেতেন, ঈগলের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে নখরাঘাতে আহত সারসকে পোষ মানাতে সেলিনিয় মসজিদে পৌঁছে যেতেন বা অস্ত্রটির কলাকৌশল আরও একবার নতুন করে তদারক করতে যেতেন, সর্বদাই আমি তাদের সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু তীব্র বিরক্তি ও গ্লানি সহকারে আমি এটা উপলব্ধি করতাম যে তাদের কথোপকথনে বাড়তি কিছু যোগ করার মতো আমার বলার কিছুই নেই, এমন কিছুও আমি খুঁজে পেতাম না যা আমি আন্তরিকভাবে তাদেরকে বলতে পারি বা তারা শুনতে আগ্রহ বোধ করতে পারেন। সম্ভবত আমি তাদের অন্তরঙ্গতায় ঈর্ষাবোধ করছিলাম, কিন্তু আমি এও বুঝে গিয়েছিলাম যে এই সবকিছুর প্রতিই আমার চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। হোজা সেই একই কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছিল, জয়, 'তাদের' শ্রেষ্ঠত্ব, ভবিষ্যৎ, মানব মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ রহস্য প্রভৃতি নিয়ে পুরনো অতিরঞ্জিত গল্পগুলোই আওড়ে যাচ্ছিল এবং সেই একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে এখন মাথা তুলে দাঁড়াবার ও ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে। সুলতান যে এখনো সেই পুরনো চর্বিতচর্বনে এতটা প্রভাবিত হচ্ছেন তাই দেখেই আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একদিন হোজা এসে জানাল যে তার একজন শক্তসমর্থ সঙ্গীর প্রয়োজন এবং আমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে। যুদ্ধের গুজব তখন চতুর্দিকে প্রবল আকার ধারণ করেছে। এডির্নের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে জিপসী ও ইহুদি এলাকা ছাড়িয়ে আমরা এক ধূসর রাস্তায় এসে পড়লাম। এর আগেও এই রাস্তায় হাঁটবার সময়ে আমার একটা দমবন্ধ করা অনুভূতি হয়েছিল, সেই অনুভূতিটি এখন আবার ফিরে এল। রাস্তার দুপাশের সব বাড়িই প্রায় একইরকম দেখতে, তাতে দরিদ্র মুসলমানরা বাস করে। এক সময় হঠাৎই আমার উপলব্ধি হল যে আইভি লতায় ঢাকা

যে বাড়িগুলোকে আগে আমি আমার বাঁদিকে দেখেছিলাম তারাই এখন আমার ডানদিকে চলে এসেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ওই একই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমরা আবার আগের জায়গাতেই ফিরে এসেছি। জানতে চাইলে হোজা বলল যে আমরা ফিলদামি অঞ্চলে রয়েছি। হোজা হঠাৎই একটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। বছর আষ্টেকের সবুজ চোখের একটি শিশু এসে দরজা খুলতেই সে তাকে বলল, 'সিংহ, সুলতানের প্রাসাদ থেকে সিংহরা পালিয়ে গেছে। আমরা তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।' শিশুটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বাড়িটাতে ঢুকে পড়ল, আমি তার পিছু নিলাম। বাড়ির আধো-অন্ধকার অন্দরমহল থেকে কাঠের গুঁড়ো আর সাবানের গন্ধ ভেসে আসছিল। আমরা দ্রুত অন্দরমহল পেরিয়ে একটি জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে একটি বড় হলঘরে প্রবেশ করলাম। সেই ঘর থেকে অন্যত্র প্রবেশের দরজাগুলো হোজা খুলে খুলে দেখতে লাগল, প্রথম ঘরে একজন বৃদ্ধ বসে ঝিমোচ্ছিল, তার হাঁ-করা ফোকলা মুখের তলায় ঝুলে থাকা দাড়ি ধরার জন্য দুটি শিশু লাফাচ্ছিল আর হাসছিল। হোজা সেই দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে অন্য একটি দরজা খুলল, সেখানে কম্বল ও কম্বল তৈরির উপকরণ স্তূপাকৃতি করে রাখা ছিল। তৃতীয় দরজার কাছে হোজা পৌঁছনোর আগেই যে শিশুটি সদর দরজা খুলে দিয়েছিল সে পৌঁছে গেল। দরজার হাতল ধরে শিশুটি বলল, 'এখানে কোনো সিংহ নেই, এখানে কেবল আমার আম্মু ও চাচি আছে।' হোজা তবু দরজা খুললই। ঘরের ভিতরের হালকা আলোয় দেখা গেল দুই নারী দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে নামাজ পড়ছে। চতুর্থ ঘরে একটি লোক কম্বল সেলাই করছিল। লোকটির সঙ্গে আমার নিজের সাদৃশ্যই বেশি বলে মনে হল কারণ তার দাড়ি ছিল না। হোজাকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আরে পাগল, তুই এখানে কী করছিস? কী চাস তুই আমাদের কাছে?' হোজা জিজ্ঞাসা করল, 'সেমরা কোথায়?' 'সে দশ বছর আগে ইস্তাম্বুলে চলে গেছে,' লোকটি বলল, 'আমরা শুনেছি যে সে প্লেগের বলি হয়েছে। তার সঙ্গে তোরও মরণ হল না কেন?' হোজা বিনা বাক্যব্যয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এল। তার পিছন পিছন বেরিয়ে আসার সময়ে আমি শিশুটির চিৎকার শুনতে পেলাম, 'আম্মু, এখানে সিংহরা এসেছিল!' তার উত্তরে এক নারীকণ্ঠও কানে এল, 'না বেটা, তোমার চাচা ও তার ভাই এসেছিল!'

দুসপ্তাহ বাদে এক ভোরবেলায় আমি আবার সেই একই জায়গায় ফিরে গেলাম। সম্ভবত আমি সেদিনের ঘটনাটি ভুলতে পারছিলাম না। আমার নতুন জীবন বা এই যে বইটি আপনারা এখনও ধৈর্য্য সহকারে পড়ে চলেছেন তার প্রস্তুতির জন্যই হয়ত ওখানে গিয়েছিলাম এমনও হতে পারে। সদ্য ফোটা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে খুঁজে পেতেও প্রথমে অসুবিধা হয়েছিল। তারপর যখন বাড়িটি খুঁজে পেলাম তখন সেখান থেকে বেয়াজিত মসজিদের হাসপাতালে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটিকে সহজতম বলে মনে হল সেটি ধরে ফিরতে লাগলাম। হোজা ও তার মা নিশ্চয় সহজতম পথটা ধরেই যাতায়াত করত আমার এমন ধারণা করাই সম্ভবত ভুল হয়েছিল। পপলার গাছে ঢাকা স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেই সেতু অভিমুখী রাস্তাটা আমি খুঁজেই পেলাম না। পপলার গাছে ঢাকা একটি রাস্তা পেলাম বটে, কিন্তু যার তীরে বসে অতদিন আগে তারা হালুয়া খেতে খেতে বিশ্রাম নিতে পারে এমন কোনো নদী সেই

রাস্তার কাছাকাছি ছিল না। হাসপাতালটির অবস্থাও আমার কল্পনার সাথে মোটেই মিলল না—কাদা তো দূর, ঝকঝকে পরিষ্কার একটি হাসপাতাল, উপরন্তু সেখানে না পেলাম রঙিন বোতল, না পেলাম প্রবহমান জলের শব্দ। শিকলে বাঁধা এক রোগীকে দেখে আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। এক চিকিৎসকের কাছে তার সম্বন্ধে জানতে চাইলাম : সে প্রেমে পড়েছিল, পাগল হয়ে গেছে এবং এখন অধিকাংশ পাগলদের মতো সেও বিশ্বাস করে যে সে আসলে অন্য কেউ। চিকিৎসক হয়ত আমাকে আরও কিছু বলতেন, কিন্তু আমি সেই স্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম।

অবশেষে গ্রীষ্মের একেবারে শেষবেলায় এসে যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এই সিদ্ধান্ত কখনোই নেওয়া হবে না, কিন্তু আমাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে যুদ্ধের ঘোষণা জারি হল এবং তাও এমন একটা দিনে যেদিন এমন ঘোষণার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে কম। পোলরা গত বছরের পরাজয় এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চড়া হারের কর কোনোটাই মেনে নিতে পারেনি, তাই তারা বার্তা পাঠিয়েছিল 'তোমাদের তরবারির জোরে কর আদায় করে নিয়ে যাও।' আক্রমণের পরিকল্পনা রচনার সময়ে আমাদের অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা নিয়ে বাহিনীর কেউ কোনো মাথাই ঘামাল না। পরবর্তী কয়েকদিন হোজা রাগে থম্ মেরে রইল। পেটা লোহার ওই স্তূপটিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতে কেউই চাইছিল না। ওই দৈত্যাকার কেটলির থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা কারোরই ছিল না এবং এর থেকেও খারাপ ব্যাপার হল যে অস্ত্রটিকে সকলেই একটি অশুভ চিহ্ন বলেই মনে করছিল। যুদ্ধযাত্রা শুরুর আগের দিন হোজা অভিযান সম্পর্কিত বিভিন্ন লক্ষণ খতিয়ে দেখছিল, সেই সময়ে আমাদের কাছে খবর এল যে আমাদের বিরোধীপক্ষ নাকি প্রকাশ্যেই বলাবলি করছে যে অস্ত্রটি যেমন আমাদের জয়ের কাণ্ডারি হতে পারে তেমনি আমাদের কাছে অভিশাপ হয়েও দেখা দিতে পারে। হোজা আমাকে জানাল যে এই অভিশাপের দায়ভার তার থেকে আমারই বেশি বলে সবাই বিশ্বাস করে এবং এই কথা শুনে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সুলতান অবশ্য হোজা ও অস্ত্রের প্রতি তার আস্থা ব্যক্ত করলেন এবং বিতর্ক এড়াবার জন্য নির্দেশ দিলেন যে অস্ত্রটিকে যেন সরাসরি তার ও তার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বরের শুরুতে এক তপ্ত দিনে আমরা এডির্নে ত্যাগ করলাম।

অভিযান শুরু করতে যে বড় দেরী হয়ে গেছে এ নিয়ে কোনো মতান্তর ছিল না, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ আলোচনাও হল না। আমি তখন সবে বুঝতে শিখছিলাম যে যুদ্ধের সময়ে সৈন্যরা শত্রুর মতোই অশুভ লক্ষণকেও ভয় পায়, তাদেরকে এই ভয়ের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয় এবং কখনো কখনো এই ভয়ই বেশি জোরদার হয়। প্রথম দিনে আমরা অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও সেতু পেরিয়ে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হলাম। আমাদের অস্ত্রের ভারে সেতুগুলো যেন চাপা আর্তনাদ করতে লাগল। প্রথম রাতেই সুলতানের তাঁবুতে আমাদের ডাক পড়ল। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে সুলতানও তার সৈন্যদের মতো শিশুসুলভ হয়ে উঠেছেন। নতুন কোনো খেলার শুরুতে শিশু যেমন উৎসাহী ও উত্তেজিত থাকে তিনিও তেমনি অবস্থায় ছিলেন। নিজ সৈন্যদের মতোই তিনিও হোজার কাছে বিভিন্ন লক্ষণের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন অস্তগামী সূর্যের সামনে লাল মেঘ, নীচ দিয়ে উড়ে যাওয়া বাজপাখী, গ্রামের কোনো

বাড়ির ভগ্নপ্রায় চিমনি, সারসের ঝাঁকের দক্ষিণ দিকে উড়ে যাওয়া—এসবের অর্থ কী? হোজা সবকিছুরই সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দিল।

তবে আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হল না। আমরা দুজনেই যাত্রাপথে এই তথ্যটা ক্রমশ আবিষ্কার করলাম যে রাত্রিবেলায় অদ্ভুতুড়ে ভয়ের গল্প শুনতে সুলতান বিশেষ পছন্দ করেন। বেশ কয়েক বছর আগে আমরা সুলতানকে একটি আবেগঘন ও কাব্যগুণসম্পন্ন বই উপহার দিয়েছিলাম। আমাদের বইগুলোর মধ্যে সেটিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিল। হোজা সেই বই থেকে বেছে বেছে রক্তাক্ত মৃতদেহ, যুদ্ধ, পরাজয়, প্রতারণা, দুর্দশা প্রভৃতি সম্পর্কিত দৃশ্যকল্প সুলতানকে শোনাত, কিন্তু শেষপর্যন্ত এসব দৃশ্যকল্পের এক কোণে প্রজ্বলিত জয়ের শিখার দিকেই সে সুলতানের বিস্ফারিত দৃষ্টিকে চালিত করত। 'তাদের ও আমাদের' বুদ্ধির হাপর দিয়ে সেই শিখাতে হাওয়া দিতে হবে, মানব মস্তিষ্কের ভিতরের গোপন সত্যকে জানতে হবে, যথাশীঘ্র তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে নিজেদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে—এসব হোজা আমাকে বছরের পর বছর ধরে বলে গেছে, কিন্তু এখন আমি সেসব ভুলতে চাইতাম। এসব তিক্ত গল্প শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু হোজা প্রতিরাতেই তার গল্পে নৈরাশ্য, কদর্যতা, অসূয়া ও হিংসার পরিমাণ বাড়িয়েই যাচ্ছিল কারণ সে সম্ভবত ভেবেছিল যে এমনকি সুলতানেরও বোধহয় গল্পগুলোতে একঘেয়েমি এসে গেছে। তবে এও আমি অনুভব করছিলাম যে মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তর নিয়ে কথা বললেই সুলতান পুলকিত বোধ করতেন।

এডির্নে ত্যাগের এক সপ্তাহ পরে শিকারাভিযান শুরু হল। কেবল এই উদ্দেশ্যেই সেনাদলের সঙ্গে পৃথক একটি দল এসেছিল। গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করে, আবাদী জমি পেরিয়ে, গোটা এলাকাটিকে জরিপ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই দলটিই সর্বাগ্রে এগিয়ে যেত। তারপর সুলতান শিকারীদের দল ও আমাদের নিয়ে গ্যাজেল হরিণে ভরা জঙ্গলের দিকে বা বন্য শূকরে পূর্ণ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বা শিয়াল ও খরগোশে পরিপূর্ণ কোনো বনের অভিমুখে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলা এসব বিনোদনের পরে এমন তূর্যনিনাদের সঙ্গে আমরা স্কন্ধাবারে ফিরতাম যে মনে হত আমরা বুঝি যুদ্ধ জয় করে ফিরছি। সেনাবাহিনী যখন সুলতানকে অভিবাদন জানাত তখন তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আমরা সেই দৃশ্য উপভোগ করতাম। এসব অনুষ্ঠানকে হোজা ক্ষোভ ও ঘৃণার সঙ্গে সহ্য করত, কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগত। সুলতানের সঙ্গে সান্ধ্য আলোচনায় যুদ্ধাভিযান, ফেলে আসা গ্রাম বা শহরের সাম্প্রতিকতম অবস্থা বা শত্রুর সর্বশেষ খবর প্রভৃতির চেয়ে শিকার নিয়ে কথা বলতেই আমি বেশি উপভোগ করতাম। এসব আলোচনাকে হোজা নির্বোধ ও অর্থহীন বলে মনে করত, রেগে গিয়ে সে নিজের গল্প ও ভবিষ্যদ্বাণীর ঝাঁপি খুলে বসত এবং প্রতিরাতেই তাতে হিংসার পরিমাণ আগের রাতের থেকেও বেড়ে যেত। এসব ভয়ংকর গল্পে, মনের অন্ধকার আনাচকানাচ সম্পর্কিত নানান ভৌতিক কাহিনীতে সুলতানকে প্রত্যয় স্থাপন করতে দেখে তার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের অন্য সদস্যদের মতো আমারও খারাপ লাগত।

কিন্তু এর থেকেও শোচনীয় ঘটনার সাক্ষীও আমাকে হতে হল! আমরা আবার শিকারে বেরিয়েছিলাম। কাছাকাছির মধ্যে অবস্থিত একটি গ্রামকে খালি করে দিয়ে

সব গ্রামবাসীকে জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এক জায়গায় ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম আর গ্রামবাসীরা টিনের ক্যানেস্তারা সহযোগে হৈ-হল্লা করে শুয়োর ও হরিণ তাড়িয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরেও আমরা কোনো প্রাণীর দেখা পেলাম না। দ্বিপ্রহরের তীব্র দাবদাহের ফলে অনুভূত ক্লান্তি ও অস্বস্তি কাটানোর জন্য সুলতান হোজাকে এমন কিছু গল্প শোনানোর আদেশ দিলেন যেগুলো সাধারণত রাত্রিবেলায় তার বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিত। আমরা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, বহুদূর থেকে ক্যানেস্তারা পেটানোর ক্ষীণ শব্দ কানে আসছিল। এমতাবস্থায় আমরা একটি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের অন্য সব বাড়ি ফাঁকা হলেও একটি বাড়ির দরজা দিয়ে এক হাড়জিরজিরে বৃদ্ধ মাথা বের করেছিল, সুলতান ও হোজা অঙ্গুলিহেলনে তাকে কাছে ডাকলেন। একটু আগেই তারা 'তাদের' ও তাদের মাথার অভ্যন্তর নিয়ে আলোচনা করছিলেন আর এখন তাদের মুখে মুগ্ধতার ছোঁয়া দেখে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমি আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। হোজা দোভাষীর মাধ্যমে লোকটিকে প্রশ্ন করছিল আর তার দাবী ছিল যে সে যেন বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা না করেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় তার জীবনের সবচেয়ে মাত্রাছাড়া কাজ কী? সবচেয়ে খারাপ কাজ সে কী করেছে?

গ্রামবাসীটির স্লাভ উচ্চারণরীতি বুঝতে দোভাষীটিরও সমস্যা হচ্ছিল। সে ঘড়ঘড়ে গলায় বিড়বিড় করে বলল যে সে একজন নির্দোষ, নিষ্পাপ বৃদ্ধ, কিন্তু হোজা এক অদ্ভুত প্রাবল্যের সঙ্গে বৃদ্ধটিকে নিজের সম্বন্ধে আরও বলার জন্য জোর করতে লাগল। অবশেষে বৃদ্ধটি যখন দেখল যে তার কথা শোনার জন্য সুলতানও হোজার মতোই উৎসুক হয়ে আছেন তখন সে স্বীকার করে নিল যে সে পাপ করেছে : হ্যাঁ, সে দোষী, গ্রামের বাকিদের সঙ্গে তারও বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল, তার ভাইবোনদের সঙ্গে তারও শিকারে অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সে অসুস্থ, জঙ্গলের মধ্যে সারাদিন ধরে ছুটে বেড়ানোর মতো সক্ষমতা তার নেই। এরপর সে বুকে হাত রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। এতে হোজা রেগে গিয়ে চিৎকার করে তাকে জানিয়ে দিল যে এসব নয়, সে তার প্রকৃত পাপ সম্বন্ধে জানতে চায়। দোভাষীটি হোজার বক্তব্য তাকে বারংবার বুঝিয়ে বলতে লাগল, কিন্তু বৃদ্ধটি প্রশ্নটাই বুঝতে পারল না। আর কোনোকিছুই বলার না থাকায় সে দুঃখিত মুখে কেবল বুকের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এরপরে দ্বিতীয় একজন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে আসা হল। সেও যখন একই কথা বলল তখন হোজা রাগে লাল হয়ে উঠল। সে আমার ছেলেবেলার নানা মাত্রাছাড়া বদমাইশি, ভাইবোনদের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমার মিথ্যা কথা বলার অভ্যেস, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আমার বিভিন্ন যৌন হঠকারিতা প্রভৃতি তাকে শোনাতে লাগল। গ্রামবাসীটিকে উসকে দেওয়ার জন্য তার সামনে ধূর্ততা ও পাপের উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে হোজা এমনভাবে কথাগুলো বলছিল যেন সে কোনো অজানা, অনামা পাপীর অপরাধের বর্ণনা দিচ্ছে। এই বই লিখতে বসে প্লেগের সময়ে আমাদের একত্রে কাটানো সেই দিনগুলোকে এখন তীব্র আবেগের সঙ্গে স্মরণ করলেও তখন হোজার কথা শুনতে শুনতে সেই স্মৃতির জন্য আমি বিরক্ত ও লজ্জাবোধ করছিলাম।

শেষ যে খোঁড়া ব্যক্তিটিকে নিয়ে আসা হল সে অবশ্য ফিসফিসিয়ে স্বীকার করল যে সে লুকিয়ে লুকিয়ে নদীতে মহিলাদের স্নান করা দেখত। এই কথা শুনে হোজা কিঞ্চিৎ শান্ত হল হ্যাঁ, এবার দেখুন, নিজেদের পাপের মুখোমুখি হলে এরা কেমন ব্যবহার করে, এরা তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু আমরা এতক্ষণে সম্ভবত বুঝে গেছি যে মস্তিষ্কের অন্দরমহলে কী কী ঘটে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বিশ্বাস করতে চাইছিলাম যে সুলতান এসব কথায় নিশ্চয়ই প্রভাবিত হবেন না।

কিন্তু সুলতানের উৎসাহ জাগ্রত হয়েছিল দুদিন পরেই আরেকটি হরিণ শিকারাভিযান চলাকালীন ওই একই নাটকের পুনরাভিনয় অনুষ্ঠিত হল। সুলতান সেই সময়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন, হয়ত হোজার পীড়াপীড়িকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না অথবা এই জেরায় তিনি হয়ত আমার আন্দাজের থেকে বেশিই আনন্দ পেতেন। ইতিমধ্যে আমরা দানিয়ুব পেরিয়ে গিয়েছিলাম। নদী পেরিয়ে আমরা আবারও একটি খ্রীস্টধর্মাবলম্বী গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম আর হোজা গ্রামবাসীদের প্রশ্ন করা শুরু করল। প্রশ্নের ধাঁচে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ছিল না। আমার তখন প্লেগের সময়কার রাতগুলোর বীভৎসতার কথা মনে পড়ছিল যখন আমি হোজাকে দিয়ে তার নিজের পাপের কথা প্রথমবারের মতো লেখাতে পেরেছিলাম। গ্রামবাসীরা প্রশ্নকর্তা তথা সুলতানের সমর্থনপুষ্ট এই অনামা বিচারক ও তার প্রশ্ন উভয়কেই ভয় পাচ্ছিল। প্রথমে তো গ্রামবাসীদের উত্তর শোনার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না, তীব্র বিবমিষা আমাকে কাবু করে ফেলেছিল। আমি সবকিছুর জন্য হোজার থেকেও সুলতানকেই বেশি দায়ী বলে মনে করছিলাম, হয় তিনি হোজার দ্বারা বেকুব বনেছিলেন অথবা এই দুর্ভাগ্যজনক খেলার আকর্ষণকে তিনি এড়াতে পারেন নি। কিন্তু ওই একই নেশায় আক্রান্ত হতে আমারও বেশি সময় লাগল না। আমার মনে হল যে শুনলে তো আর কিছু হারানোর নেই এবং তাই তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আগের বারের থেকে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর এবং পেলব এক ভাষায় তারা নিজেদের পাপাচারের কাহিনী বর্ণনা করছিল। অধিকাংশ পাপ ও অপকর্মের পারস্পরিক সাদৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মতো, সাধারণ মিথ্যে, ছোটখাটো প্রবঞ্চনা, দু-একটি নোংরা চাল, কতিপয় পরকীয়া এবং খুব বেশি হলে অল্প কয়েকটি ছিঁচকে চুরি।

সন্ধ্যাবেলা হোজা বলল যে গ্রামবাসীরা সবকিছু প্রকাশ করেনি, তারা সত্য গোপন করে গেছে। আমি তো আমার লেখায় এর থেকে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলাম তারা নিশ্চয় আরও গভীর, আরও বাস্তব কোনো পাপ করেছে যার সাহায্যে তাদেরকে আমাদের থেকে পৃথক করা যাবে। এই কথা সুলতানকে বোঝানোর জন্য, সেই সত্যের নাগাল পাওয়ার জন্য, 'তারা' এবং বিশেষত 'আমরা' কেমন প্রকৃতির মানুষ তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনে সে হিংসার আশ্রয়ও নেবে।

এই কুরুচিকর নৃশংসতার বোধশূন্যতা ও তীব্রতা প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছিল। শুরুতে সবকিছুই অনেক সহজ সরল ছিল। আমাদের অবস্থা ছিল খেলার ফাঁকে নিরীহ দুষ্টুমিতে মাতোয়ারা শিশুদের মতো দীর্ঘ ও মনোরম শিকারাভিযানের মধ্যবর্তী অবসরে অনুষ্ঠিত আমাদের প্রশ্নোত্তরের আসরগুলো অনেকটা কোনো নাটকের দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ছোটখাটো মনোরঞ্জনের মতোই ছিল। কিন্তু সময় গড়াবার সাথে সাথে তা এমন এক প্রথায় পরিণত হল যা আমাদের

ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য্য বা স্নায়ুর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, অথচ আমরা তা থামাতে পারলাম না। আমি দেখতাম যে হোজার প্রশ্ন ও তার অবোধ্য ক্রোধের চোটে গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের কাছ থেকে ঠিক কী জানতে চাওয়া হচ্ছে তা যদি গ্রামবাসীরা বুঝতে পারত তবে হয়ত তারা তাদের সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত। ক্লান্ত ও ফোক্‌লা বৃদ্ধরা গ্রামের চকে এসে জড়ো হত, তাদের প্রকৃত অথবা কল্পিত কুকর্মের স্বীকারোক্তি উগরে দেওয়ার আগে তারা তাদের চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে ও আমাদের কাছ থেকেও হতাশ চোখে সাহায্য ভিক্ষা করত। অল্পবয়সীদের পাপ ও স্বীকারোক্তি সন্তোষজনক না হলে তাদেরকে মারধোর করা হত, মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের আবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করা হত। আমি একবার টেবিলে কিছু একটা লিখে রেখেছিলাম। সেটা পড়ার পরে 'তুমি, তুমি একটা বদমাইশ' বলতে বলতে হোজা কেমনভাবে আমার পিঠে কিল বসিয়ে দিয়েছিল এবং আমি কী করে এমন হলাম সেই চিন্তায় নিজের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল তা আমার এখনো মনে আছে। খুব স্পষ্ট না হলেও নিজের অনুসন্ধান ও কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইতিমধ্যে হোজার একটা ধারণা তৈরী হয়েছিল। সে অন্যান্য পদ্ধতিও পরখ করে দেখেছিল অর্ধেক ক্ষেত্রেই সে গ্রামবাসীদের থামিয়ে দিয়ে তারা মিথ্যা বলছে বলে অভিযোগ করত আর তারপর আমাদের লোকেরা তাদের ধরে উত্তমমধ্যম দিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে কথার মাঝে তাদের থামিয়ে দিয়ে সে দাবী করত যে তাদের বন্ধুরা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে গেছে। কখনো কখনো সে দুজন করে গ্রামবাসীকে সামনে ডেকে এনে তাদের একযোগে সাক্ষ্য দেওয়ানোর চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু শারীরিক নির্যাতন সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা যখন পরস্পরের সামনে লজ্জাবোধ করতে লাগল এবং তাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে কৃত্রিমতা থেকেই গেল তখন হোজা রাগে ফেটে পড়ল।

ইতিমধ্যে ভারী বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমিও ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলাম। আমার এখনো মনে পড়ে যে গ্রামবাসীরা খুব অল্পই কথা বলত, বেশি কিছু বলার ইচ্ছাও তাদের ছিল না, বৃথাই তাদেরকে মারধোর করা হত। গ্রামের কর্দমাক্ত চকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাদের অপেক্ষা করার দৃশ্য আমার এখনো মনে পড়ে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে শিকারের আকর্ষণও ফিকে হয়ে এল এবং শিকারাভিযানকে কাটছাঁট করা হতে লাগল। কদাচিৎ একটি করুণ চোখের গ্যাজেল বা মোটা বুনো শুয়োর শিকার করলেও সুলতান সেই নির্বিচার হত্যায় দুঃখ পেতেন। তবে এখন শিকারের বদলে মানবমস্তিষ্কের অভ্যন্তরের অনুসন্ধান নিয়েই আমরা বেশি ব্যস্ত থাকতাম। শিকারের মতোই এই অনুসন্ধানের প্রস্তুতিও যথেষ্ট আগে থাকতেই শুরু হত। রাতে হোজা তার অনুভূতির ঝাঁপি আমার সামনে এমনভাবে মেলে ধরত যেন সে তার নিজের সারাদিনের কৃতকর্মের জন্য অপরাধবোধে ভুগছে। যা কিছু ঘটছিল তা নিয়ে হোজাও বিচলিত ছিল, হিংসার বাড়াবাড়ি নিয়ে সে নিজেও অস্বস্তিতে ভুগছিল, কিন্তু তার কিছু একটা প্রমাণ করার ছিল, এমন একটা কিছু যা আমাদের সবার উপকারে আসবে। সে সুলতানের সামনে জলজ্যান্ত উদাহরণ পেশ করে দেখাতে চাইত আর তাছাড়া, কেনই বা গ্রামবাসীরা মিথ্যে বলছিল? এর পরে হঠাৎ তার মাথায় খেলল যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য এই পরীক্ষাটি কোনো মুসলমান গ্রামেও করা উচিত, কিন্তু সে যেমন আশা

করেছিল তেমন ফল পাওয়া গেল না। সে তাদেরকে জেরা করার সময় বিশেষ জবরদস্তি করেনি, কিন্তু ফল একইরকম দাঁড়াল। তাদের স্বীকারোক্তি বা কাহিনী তাদের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের থেকে কিছু আলাদা ছিল না। সেই সময়ে বৃষ্টি যেন থামার কোনো নামগন্ধই করছিল না। হোজা মৃদু স্বরে বলার চেষ্টা করেছিল যে এরা প্রকৃত মুসলমানই নয়, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সারাদিনের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা চলাকালীন আমি লক্ষ্য করলাম যে সে উপলব্ধি করেছে যে সত্যিটা সুলতানেরও নজর এড়ায়নি।

এই উপলব্ধি কেবল তার ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দিল এবং তাকে আরও হিংস্র করে তুলল। এত হিংসা সুলতানও আর সহ্য করতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি, আমারই মতো, সম্ভবত এক বিষাদাচ্ছন্ন কৌতূহল নিয়ে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আরও উত্তরে যেতে যেতে আমরা আবারও একটা জঙ্গলে-ঘেরা স্লাভ গ্রামে এসে পৌঁছলাম। সেই ছোট্ট, শান্ত গ্রামের এক সুঠাম কিশোরের উপর হোজা হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল কারণ সে একটি মাত্র ছেলেমানুষী মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছিল না। হোজা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এমন সে আর কখনো করবে না, সন্ধ্যাবেলায় সে এমন অপরাধবোধে ভুগতে লাগল যা আমার কাছেও রীতিমতো বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। আরেকবার, হলুদাভ বৃষ্টির মাঝে আমি দূর থেকে গ্রামের মহিলাদের কাঁদতে দেখেছিলাম। গ্রামের পুরুষদের নিদারুণ দুর্দশা দেখে তারা আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। আমাদের সৈন্যরা নিজেদের দায়িত্ব নিপুণতার সঙ্গেই পালন করছিল, কিন্তু এই একই ঘটনার ক্রমাগত পুনরাভিনয় তাদেরকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে জেরার জন্য পরবর্তী লোকটিকে আমাদের আগে তারাই বেছে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তার দিকে প্রথম প্রশ্নটি হোজার আগে দোভাষীই ছুঁড়ে দিচ্ছে আর হোজাকে নিষ্ফলা রাগের চোটে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। অবশ্য নিজেদের পাপের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে আগ্রহী এমন কোনো আকর্ষণীয় শিকার যে আমরা কখনোই পাইনি তা নয়, তারা যেন মনে মনে এমন একটা জেরার অধিবেশনের জন্যই বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। আমাদের নির্যাতনের গল্প কিংবদন্তীর মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। হয় এই কিংবদন্তী নতুবা অভেদ্য রহস্যময়তায় মোড়া কোনো চূড়ান্ত ন্যায়ের করাল ছায়া দ্বারা আতঙ্কিত ও হতবুদ্ধি হয়ে নিশ্চয়ই তারা তাদের হৃদয় উজাড় করে দিত। তবে স্বামী বা স্ত্রীর পরকীয়া বা ধনী প্রতিবেশীর প্রতি গরিব গ্রামবাসীর ঈর্ষার গল্পে হোজার আর কোনো উৎসাহই ছিল না। সে বারবার এক গভীরতর সত্যের কথা বলত, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে তা আদৌ আবিষ্কার করা সম্ভব কি না তা নিয়ে আমাদের মতো সে নিজেও সন্দিহান ছিল। আর কিছু না হোক, সে আমাদের সন্দেহকে অনুভব করতে পেরেছিল এবং তাতেই সে রাগে ফেটে পড়ত, সুলতান ও আমিসহ বাকি সকলেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে সে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সম্ভবত এই কারণেই হোজাকে নিজের হাতে লাগাম তুলে নিতে দেখলেও আমরা নিশ্চুপই দর্শক হিসেবেই থেকে যেতাম। একদিন হঠাৎ বৃষ্টি নামায় আমরা এক ছাদের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু হোজা বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েও এক কিশোরকে জেরা করে যেতেই লাগল। কিশোরটি তার মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য তার সৎ বাবা ও সৎ ভাইদের ঘৃণা

করত। দৃশ্যটি দেখে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হোজা এই বলে বিষয়টিকে নস্যাৎ করে দিল যে কিশোরটি নিতান্তই সাধারণ এবং সে মোটেই মনে রাখার মতো নয়।

আমরা ক্রমাগত উত্তর থেকে আরও উত্তরে অগ্রসর হতে লাগলাম। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী গভীর কালো জঙ্গলকে চিরে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা, কর্দমাক্ত রাস্তায় বাহিনী খুব ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। জঙ্গলের পাইন ও বীচ গাছের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা ভারী, ঠাণ্ডা বাতাসে আমার প্রাণ ভরে গেল। কুয়াশাচ্ছন্ন নীরবতা চতুর্দিককে অস্পষ্ট করে দেওয়াতে সামনের সব কিছু নিয়েই আমাদের মনে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কারোর মুখে কোনো নাম না শুনলেও আমার মনে হল যে আমরা কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। শৈশবে আমার বাবার কাছে ইউরোপের একটি মানচিত্রে আমি এই পর্বতমালার ছবি দেখেছিলাম। কোনো মাঝারিমাপের চিত্রকরের আঁকা সেই মানচিত্রে এই পর্বতমালাটি হরিণ ও গথিক দুর্গের ছবি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হোজার ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তার অসুস্থতা সত্ত্বেও সকালে জঙ্গলে প্রবেশের প্রাত্যহিক কর্মসূচী চলতেই থাকল। বাহিনী যে রাস্তা ধরে চলছিল তা এত আঁকাবাঁকা ছিল যে দেখে মনে হত তার বুঝি ফুরোবার কোনো ইচ্ছাই নেই। শিকারাভিযানের কথা আমরা যেন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কোনো হ্রদের পারে বা পাহাড়চূড়ায় আমাদের দীর্ঘ অপেক্ষার উদ্দেশ্য যেন আর মোটেই হরিণ শিকার নয়, আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ গ্রামবাসীদের প্রতীক্ষাকে দীর্ঘায়িত করাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সঠিক সময় সমাগত বলে মনে হলে আমরা কোনো একটি গ্রামে প্রবেশ করতাম এবং প্রথামাফিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হলে আবার হোজার পিছু পিছু চলতে থাকতাম আর হোজা আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে আবারও একটি নতুন গ্রামে গিয়ে হাজির হত। সে তার কাঙ্ক্ষিত সম্পদ কখনোই খুঁজে পেত না, অথচ তা পাওয়ার জন্য যে হিংস্রতার আশ্রয় সে নিত তা ভোলার জন্য ও নিজের হতাশাকে মন থেকে মুছে ফেলার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। একবার সে একটি পরীক্ষা করতে চাইল সুলতান আরও একবার তার বিস্ময়কর ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে কুড়িজন রক্ষীকে পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ করলেন। হোজা প্রথমে রক্ষীদের প্রশ্ন করল, তারপর সেই একই প্রশ্ন নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হতবুদ্ধি গ্রামবাসীদেরও করতে লাগল। আরেকবার সে গ্রামবাসীদের বাহিনীর কাছে নিয়ে এল, কর্দমাক্ত রাস্তার সঙ্গে তাল মেলাতে বাহিনীর অস্ত্রগুলোতে ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ হচ্ছিল। হোজা গ্রামবাসীদেরকে অস্ত্রগুলো দেখিয়ে সে সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চাইল এবং লিপিকারদের দিয়ে তাদের উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখল। কিন্তু তার নিজের উৎসাহই দ্রুত কমে এল। কেন এমন হল তার কারণ আমি ঠিক বলতে পারব না—হয়ত আমরা সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, অথবা হয়ত অর্থহীন হিংসার চোখ রাঙানিতে সে নিজেও কাবু হয়ে পড়েছিল, হয়ত রাতে তার মনে অপরাধবোধ ভীড় করে আসত, অথবা আমাদের অস্ত্র ও জঙ্গলের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পাশাদের ও বাহিনীর বিরুদ্ধ মতামত শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আবার এমনও হতে পারে যে তার নিজের অসুস্থতাই তার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছিল। তার রুক্ষ কণ্ঠে আর আগের মতো জোর ছিল না, জেরা করার উৎসাহেও টান

পড়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় সে যখন জয়, ভবিষ্যৎ, আমাদের আত্মরক্ষা, ঘুরে দাঁড়ানো প্রভৃতি নিয়ে কথা বলত তখন সেই ক্রমক্ষীয়মাণ কণ্ঠস্বর শুনে মনে হত যে সে নিজেই বোধহয় সেসব কথা বিশ্বাস করছে না। হোজা সম্পর্কিত শেষ যে ছবি আমার মনে ভাসে তাও এক জেরা করারই দৃশ্য। সালফারের ধোঁয়ার মতো হলুদাভ বৃষ্টি তখন সবে শুরু হয়েছে। সেই প্রত্যয়শূন্য জেরার প্রশ্নোত্তর শোনার মতো কোনো উৎসাহ আমাদের আর ছিল না, তাই আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বৃষ্টিতে মোলায়েম হয়ে আসা মায়াবী আলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে সে হতবুদ্ধি স্লাভ গ্রামবাসীদের জেরা করতে গিয়ে তাদের হাতে এক বিশাল আয়না ধরিয়ে দিচ্ছে আর তারা গিল্টি করা ফ্রেমে আটকানো জলে ভেজা সেই আয়নার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

আর কোনো 'শিকার' অভিযানে আমরা বেরোইনি। নদী পেরিয়ে আমরা পোলদের দেশে প্রবেশ করলাম। এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছিল এবং প্রতিদিনই তার তেজ একটু একটু করে বাড়ছিল। বৃষ্টির চোটে রাস্তা বলতে অবশিষ্ট ছিল কেবল গলে যাওয়া মাটি। ফলে আমাদের অস্ত্র আর এগোতে পারছিল না। বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল অথচ এখনই আমাদের আরও দ্রুতগতিতে এগোনোর প্রয়োজন ছিল। ঠিক এই সময়েই আমাদের নির্মিত অস্ত্রটি সম্বন্ধে গুজবের পরিমাণ হঠাৎ করেই বেড়ে গেল। পাশারা তো আগে থেকেই অস্ত্রটিকে অপছন্দ করত আর এখন তার উপর গুজব রটে গেল যে অস্ত্রটি দুর্ভাগ্য, এমনকি অভিশাপও ডেকে আনতে পারে। হোজার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যোগদানকারী সৈন্যদের দেওয়া তথ্য সেই গুজবে আরও ইন্ধন জোগাল। বরাবরের মতো এবারও সবাই হোজার বদলে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করল কারণ আমি হলাম কাফের। এরপরেও যখন হোজা সুলতানের তাঁবুতে বসে অস্ত্রটির অপরিহার্যতা, শত্রুর শক্তি, আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো প্রভৃতি সম্পর্কিত তার বস্তাপচা বুলি কবিতার ছন্দে গেঁজিয়ে তুলে আবার আওড়াতে শুরু করল তখন স্বয়ং সুলতানেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল এবং উপবিষ্ট পাশাদের মনেও এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল যে আমরা জাদুকরই বটে এবং আমাদের অস্ত্র কেবল দুর্ভাগ্যই ডেকে আনবে। তাদের কাছে হোজা ছিল এমন একজন বেপথুমান অসুস্থ মানুষ যার সঠিক পথে ফিরে আসার সব আশা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। তাদের কাছে আমিই ছিলাম প্রকৃত বিপজ্জনক এবং আসল দোষী যে হোজা ও সুলতানকে প্রতারিত করেছে এবং এসব অশুভ ধারণা উদ্ভাবন করেছে। রাতে নিজেদের তাঁবুতে ফেরার পরও হোজা বিধ্বস্ত কণ্ঠে পাশাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগল, ঠিক যেমন অতীতে নির্বোধদের বিরুদ্ধে করত, কিন্তু বহু বছর যাবৎ যে আনন্দ ও আশাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম বলে আমি মনে করতাম তার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যাই হোক না কেন, সে যে হাল ছাড়ার বান্দা নয় তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তবে দু'দিন বাদে অগ্রসরমান বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অস্ত্রটি যখন কাদায় বসে গেল তখন আমি সব আশা হারিয়ে ফেললাম। হোজা কিন্তু অসুস্থ শরীরেও লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। আমাদের সাহায্যার্থে কোনো লোক বা এমনকি একটা ঘোড়া দিতেও কেউ রাজি হচ্ছিল না। হোজা সুলতানের কাছে গিয়ে প্রায় চল্লিশটার মতো ঘোড়া কামান থেকে খুলে নিয়ে এল এবং একদল লোকও জোগাড় করে ফেলল। যারা চাইছিল যে অস্ত্রটি কাদার মধ্যে ডুবে গিয়ে ওখানেই পড়ে থাকুক তাদের চোখের

সামনেই সারাদিন ধরে সেটিকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলল। সন্ধ্যার দিকে রাগের চোটে সে ঘোড়াগুলোকে চাবকাতে শুরু করল এবং তখনই হঠাৎ দৈত্যাকার অস্ত্রটিকে নড়ানো সম্ভব হল। পাশারা আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল, তাদের যুক্তি ছিল যে অস্ত্রটি বাহিনীর শক্তি শুষে নিচ্ছে ও দুর্ভাগ্যও ডেকে নিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে তর্ক করে হোজা সারা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিল, কিন্তু তর্ক চালিয়ে গেলেও জয়লাভের বিশ্বাস তার আর নেই বলেই আমার মনে হল।

অভিযানে আসার সময়ে আমি একটি উদ্ নিয়ে এসেছিলাম। সে রাতে তাঁবুতে বসে উদে যখন কিছু একটা বাজানোর চেষ্টা করছি তখন হোজা আমার হাত থেকে বাদ্যযন্ত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমার কি জানা আছে যে অনেকে আমার মাথা চাইছে? আমি জানি। সে বলল যে আমার মাথার পরিবর্তে তার মাথা দাবি করলেই সে খুশি হত। আমি তাও জানতাম, কিন্তু কিছু বললাম না। আমি আবার উদ্‌টাকে তুলতে যেতেই সে আমাকে থামিয়ে দিল এবং আমার দেশ সম্বন্ধে আরও কিছু তাকে শোনাতে বলল। সুলতানের মতো তাকেও আমি কয়েকটা মনগড়া কাহিনী শোনালাম। তাতে সে রেগে গেল। সে সত্য চায়, প্রকৃত তথ্য জানতে চায়, সে আমার মা, প্রেমিকা, ভাইবোনদের সম্পর্কে জানতে চায়। যখন আমি তাকে 'সত্য' বর্ণনা দিতে শুরু করলাম তখন তাতে সেও যোগদান করল। আমার কাছ থেকে শেখা ইতালীয় শব্দভাণ্ডার থেকে চয়ন করে সে নানান কটু শব্দ ও ছোট ছোট অসম্পূর্ণ বাক্য বলতে লাগল যার অধিকাংশই আমার কাছে বোধগম্য হল না।

পরবর্তী কয়েকদিনে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গগুলোকে দখল করে নিল। এর ফলে হোজার মনে কিছু অদ্ভুত ও ক্লেদাক্ত ভাবনা বেপরোয়াভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে বলে আমার মনে হল। এরপর একদিন সকালে একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদেরই কামানের গোলায় বিধ্বস্ত গ্রামটির একটি পাঁচিলের গোড়ায় কিছু মুমূর্ষুকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে সে ঘোড়া থেকে নেমে তাদের দিকে ছুটে গেল। দূর থেকে তাকে দেখে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যে সে বুঝি তাদের সাহায্য করতে চায়, সঙ্গে একজন দোভাষী থাকলে সে বোধহয় তাদের কাছে তাদের আঘাত সম্বন্ধে জানতে চাইত। কিন্তু তারপর হঠাৎই আমার উপলব্ধি হল যে সে এক প্রবল উদ্দীপনায় ভর করে ছুটে যাচ্ছে এবং সেই উদ্দীপনার কারণ আমি সম্ভবত অনুমান করতে পারছি, তাদের কাছ থেকে সে অন্য কিছু জানতে চায়। পরের দিন আমরা যখন সুলতানের সাথে রাস্তার উভয়পারের ভস্মীভূত সব পাঁচিল ও ছোট ছোট স্তম্ভগুলো পরিদর্শন করতে গেলাম তখনো সে একইরকম উদ্দীপিত অবস্থায় ছিল। কামানের গোলায় ধূলিসাৎ বাড়িঘর ও কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক আহতকে পড়ে থাকতে দেখে সে ছুটে গেল। তার মাথাটা তখনো ধড় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। আমি তার পিছু পিছু গেলাম। আমার ভয় ছিল যে সে কোনো একটা হীন কাজ করে বসবে আর লোকে বলবে যে ওই কাজে আমি তাকে প্ররোচিত করেছি। ওরকম কিছু করতে গেলে যাতে আমি আটকাতে পারি তাই তার পিছু নিয়েছিলাম। অবশ্য নিছক স্থূল কৌতূহলও তার পিছু নেওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। তার যেন বিশ্বাস ছিল যে কামানের গোলায় আহতদের ক্ষতবিক্ষত মুখের উপরে মৃত্যুর যবনিকা নেমে

আসার পূর্বে তারা তাকে কিছু একটা বলে যাবে। হোজা তাদেরকে জেরা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল, যদি তারা কিছু বলে দেয়। যদি তাদের কাছ থেকে সে সেই গভীর সত্য জানতে পারে যা মুহূর্তের মধ্যে সবকিছুকে পাল্টে দেবে। কিন্তু তাদের মুখে মৃত্যুর অতীব নিকটবর্তী এমন একপ্রকার হতাশা ফুটে উঠেছিল যা হোজার নিজের হতাশার সঙ্গেও তুলনীয়। এরপর যখন সে তাদের কাছে গেল তখন আর তার কথা বলার মতো শক্তি ছিল না।

সেদিনই গোধূলির সময় খবর এল যে বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে দোপ্পিও দুর্গ দখল করা সম্ভব হয়নি তা শুনে সুলতান কুপিত হয়েছেন। এই সংবাদ জানতে পেরে হোজা পূর্ববৎ উত্তেজিত অবস্থায় সুলতানের কাছে ছুটে গেল। ফেরার পরে তাকে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ বলে মনে হলেও সেই সন্দিগ্ধতার কারণ সে নিজেও জানে বলে মনে হল না। সে সুলতানের কাছে নিবেদন করেছিল যে সে তার অস্ত্রটিকে যুদ্ধে পাঠাতে চায়, এরকম একটা দিনের জন্যই তো সে এতগুলো বছর ধরে যন্ত্রটির পিছনে পড়ে ছিল। সেই মুহূর্ত যে সমাগত সে বিষয়ে সুলতানও অপ্রত্যাশিতভাবে সহমত হলেন, কিন্তু দুর্গ আক্রমণের দায়িত্ব আগে থেকেই যার উপরে ন্যস্ত ছিল সেই স্বর্ণকেশী হুসেইন পাশাকে তিনি আরও খানিকটা সময় দিতে চাইলেন। সুলতান একথা বললেন কেন? বছরের পর বছর ধরে হোজার প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে এই প্রশ্নটিও ছিল এবং বাকিগুলোর মতো এটিও সে আমাকে নাকি নিজেকে জিজ্ঞেস করছে তা আমার কাছে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। এসব দুশ্চিন্তা আমি অনেক ভোগ করেছি, নানান কারণে আমি নিজেকে আর তার ঘনিষ্ঠ বলে ভাবতে পারতাম না, প্রশ্নের উত্তর হোজা নিজেই দিয়ে দিল : সে জয়ের গৌরবে ভাগ বসিয়ে ফেলতে পারে বলে তারা আশঙ্কিত।

পরের দিন দুপুরে খবর এল যে স্বর্ণকেশী হুসেইন পাশা তখনো দুর্গ দখল করতে সমর্থ হয়নি, অথচ ততক্ষণে হোজা নিজের কাছে আপন মতামতের যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টায় নিজের যাবতীয় শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমি অভিশপ্ত ও চর এই গুজব রটে যাওয়ার পর থেকে আমি আর সুলতানের তাঁবুতে যেতাম না। সেই রাতে সারাদিনের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হোজা সুলতানকে জয় ও সৌভাগ্যের গল্প শোনানোর সুযোগ পেয়ে গেল এবং সুলতানও তাতে আস্থা ব্যক্ত করলেন বলেই দৃশ্যত মনে হল। হোজা যখন তাঁবুতে ফিরে এল তখন তাকে দেখে মনে হল যে সে বেশ আশাবাদী যে শয়তানের ঠ্যাং সে শেষপর্যন্ত ভেঙে দিতে পারবে। কিন্তু তার কথা যত শুনছিলাম তত তার আশাবাদের চেয়ে আশাবাদকে জিইয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টাই আমার বেশি করে নজরে পড়ছিল।

হোজা আবার আমাদের ও তাদের এবং আসল জয়ের সেই একই পুরনো গল্প শুনিয়ে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এক অশ্রুতপূর্ব বিষণ্ণতা ছিল। সেই বিষণ্ণতা যেন গল্পগুলোর করুণ নেপথ্য সঙ্গীত হয়ে আমার কানে বাজল। তার গল্প বলা শুনে মনে হচ্ছিল যে আমরা যেন একসাথেই জীবন কাটিয়েছি এবং সে শৈশবের এমন কোনো স্মৃতিচারণ করছে যা আমরা দুজনেই খুব ভালো করে জানি। আমি উদ্‌টা হাতে নিলাম কিন্তু সে আপত্তি করল না, এমনকি আন্‌তাবড়ি ঝঙ্কার তোলাতেও তার কোনো ভাবান্তর ঘটল না, সে ভবিষ্যতের কথা বলে যাচ্ছিল, নদীর স্রোতধারা আমাদের পছন্দসই অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে পারলে তারপর আমাদের দিন কেমন সুন্দর কাটবে

তাই নিয়ে সে কথা বলছিল, কিন্তু আমরা দুজনেই জানতাম যে তার সব কথাই প্রকৃতপক্ষে অতীতচারণ : আমার চোখের সামনে প্রশান্তির ছবি ভেসে উঠল, সুন্দর সব গাছে ঘেরা একটি বাড়ির পিছনের বাগান, আলোকোজ্জ্বল উষ্ণ ঘর, খাওয়ার টেবিল ঘিরে একটি সুখী পরিবারের জমায়েত। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম হোজা আমাকে শান্তি দিল। যখন সে বলল যে ছেড়ে যাওয়াটা বেশ কষ্টকর হবে তখন আমি তার অনুভূতিটা উপলব্ধি করতে পারলাম : সে এখানকার মানুষদের ভালোবেসে ফেলেছে। তারপর সেইসব ভালোবাসার মানুষদের কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার নির্বোধদের কথা মনে পড়ে গেল এবং সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমার মনে হল যে তার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্টই কারণ আছে। তার আশাবাদকে ভড়ং বলে মনে হল না, হয়ত তার কারণ এই যে একটি নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে এই অনুভূতিটা আমাদের দুজনেরই হচ্ছিল, আবার এমনও হতে পারে যে তার জায়গায় থাকলে আমিও হয়ত তার মতো করেই ভাবতাম। তবে এই দুটি কারণের মধ্যে কোন্‌টি যে প্রযোজ্য তা আমি সঠিক বলতে পারব না।

পরদিন সকালবেলা আমাদের অস্ত্রটিকে পরীক্ষা করার জন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই শত্রুপক্ষের একটি ক্ষুদ্র দুর্গের সামনে এনে হাজির করা হল তখন আমাদের দুজনের মনেই এক অদ্ভুত আশঙ্কা দেখা দিল যে অস্ত্রটি বোধহয় খুব একটা কার্যকরী হবে না। আমাদের সাহায্যার্থে সুলতান শতখানেক লোক পাঠিয়েছিলেন। প্রথমবার গোলা নিক্ষেপের সময়েই তারা ব্যূহবিন্যাস ভেঙে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, কেউ কেউ যন্ত্রটির তলাতেই পিষে গেল। প্রাথমিক গোলা নিক্ষেপণ খুব একটা কাজের হল না, তারপর যন্ত্রটি হঠাৎই গাধার মতো কাদার মধ্যে আটকে গেল। তখন আবার উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় কেউ কেউ শত্রুপক্ষের হাতে ধরাশায়ী হল। অধিকাংশই দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় পালিয়ে গেল এবং নতুন করে আক্রমণের জন্য আমরা তাদেরকে আর জড়ো করতেই পারলাম না। এমনটাই যে হবে তা নির্ঘাত আমরা উভয়েই ভেবেছিলাম।

পরে বলশালী হাসান পাশা ও তার দলবল যখন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই দুর্গটিকে দখল করে নিল তখন হোজা গূঢ় বিজ্ঞানের এই নমুনাটিকে আরও একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। কী আশায় তার আরও একবার পরীক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা জাগল তা আমি খুব ভালোই বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেই দুর্গের সবকটা কাফের সৈন্যই তো তলোয়ারের কোপে কচুকাটা হয়ে গেছিল। জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যার তখনো শেষ নিঃশ্বাস পড়তে বাকি রয়েছে। সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাথাগুলো এককোণে জড়ো করে রাখা ছিল। সেদিকে হোজার চোখ পড়তেই তার মনে কী চলছে আমি বুঝতে পারলাম, এমনকি সেই দৃশ্যের প্রতি তার মুগ্ধতাকেও আমার যথোচিত বলেই মনে হল, কিন্তু অতদূর পর্যন্ত ঘটনাটিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার শক্তি ততক্ষণে আর আমার মধ্যে ছিল না। তাই আমি তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিছু পরে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আবার যখন তার দিকে ফিরলাম তখন দেখি সে মুণ্ডুর স্তূপ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আমার আর কোনোদিনই জানা হয়ে ওঠেনি যে সে শেষাবধি কতদূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিল।

দুপুরে মূল বাহিনীর কাছে ফিরে এসে জানতে পারলাম যে দোপ্পিও দুর্গ তখনো দখল করা সম্ভব হয়নি। সুলতান দৃশ্যতই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিলেন এবং হুসেইন পাশাকে শাস্তিদানের ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন। ঠিক হল যে আমরা সবাই, সমগ্র বাহিনী অভিযানে অংশ নেব, সুলতান হোজাকে জানিয়ে দিলেন যে সন্ধ্যার মধ্যে দুর্গ দখল সম্ভব না হলে পরদিন সকালের আক্রমণে আমাদের অস্ত্রটি ব্যবহার করা হবে। এই সময় সুলতান মন্তব্য করলেন যে গোটা দিন ধরে একটি ক্ষুদ্র দুর্গও দখল করতে পারে না যে অপদার্থ সেনাপতি তার গর্দান নেওয়াই উচিত। কিন্তু দুর্গ দখলে আমাদের অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বা আমাদের অস্ত্র দুর্ভাগ্যের বাহক এই গুজবে তিনি কর্ণপাতই করলেন না। অস্ত্রের ব্যর্থতার খবর ততক্ষণে গোটা বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, হোজাও আর জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার কথা বলল না। সে না বললেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে প্রাক্তন রাজগণকের মৃত্যুর কথা তার মনে পড়ছে। আবার আমি যখন আমার শৈশব বা আমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারদের কথা ভাবছিলাম তখন আমি জানতাম যে ওই একই জিনিস তার মাথাতেও ঘুরছে। দুর্গ জয় যে আমাদের শেষ আশা এই কথা সেও ভাবছিল, কিন্তু আমি এও জানতাম যে সেই সুযোগে তার বিশ্বাস ছিল না এবং তা সে চায়ওনি। আমি জানতাম যে দুর্গটিকে দখল করতে না পারার রাগেই নিকটবর্তী গ্রামের ছোট্ট গির্জাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই গির্জার সাহসী যাজকের কণ্ঠে উচ্চারিত প্রার্থনা আমাদের এক নতুন জীবনের দিকে আহ্বান করছে। আমি এমনকি এও জানতাম যে আরও উত্তরে এগোনোর সাথে সাথে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের পিছনে অস্তগামী সূর্য আমার মতো হোজার মনেও এক পূর্ণাঙ্গতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে। সেই পূর্ণাঙ্গতা হল পরিসমাপ্তির দিকে নীরবে ও সাবধানে অগ্রসরমান কোনো কিছুর পূর্ণাঙ্গতা।

অবশেষে আমরা যখন দোপ্পিওর দুর্গ চাক্ষুষ করতে পারলাম ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে, আমরা স্বর্ণকেশী হুসেইন পাশার ব্যর্থতার সংবাদ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি এবং এও জানতে পেরেছি যে দুর্গরক্ষার জন্য পোলদের সঙ্গে অস্ট্রিয়, হাঙ্গেরীয় ও কাজাকরাও যোগদান করেছে। দুর্গটি একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, তার পতাকাশোভিত মিনারগুলো অস্তগামী সূর্যের মৃদু লাল আভা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুর্গটির রঙ সাদা, বিশুদ্ধ ও সুন্দর সাদা। কেন জানি না আমার মনে হল যে এরকম সুন্দর ও অপ্রাপনীয় বস্তু কেবল স্বপ্নেই দেখা যায়। সেই স্বপ্নে জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ ধরে আপনি দৌড়াতে থাকবেন পাহাড়ের চূড়ার উজ্জ্বল দিবালোকে ঝলমলে সেই গজদন্ত প্রাসাদে পৌঁছবার জন্য, সেখানে যেন এক বিশাল নাচের আসর বসেছে যাতে যোগদান করার জন্য আপনি উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কারণ সুখলাভের এমন সুযোগ আপনি হারাতে চান না। আপনি প্রতি মুহূর্তে আশা করবেন যে জঙ্গলের ঘনান্ধকার রাস্তাটি এবার শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আদতে তা কখনোই শেষ হবে না। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের পাদদেশের মধ্যবর্তী স্থানে বানভাসি নদীটি এক থকথকে জলাভূমির সৃষ্টি করেছিল। পদাতিক কাহিনী বহুকষ্টে জলাভূমি পার হয়, কিন্তু তারপর কামানের গোলার সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তারা কোনোমতেই পাহাড়ের ওই ঢাল বেয়ে উঠতে পারল না। তখন যে রাস্তা দিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম তার কথা আমার মনে পড়ে। বিশুদ্ধ সাদা দুর্গের মিনারে মিনারে পাখির উড়ে বেড়ানো,

লাল কালচে হয়ে আসা দুরারোহ পর্বতগাত্র বা অন্ধকার, নিথর জঙ্গলের মতো চারপাশের সবকিছুকেই নিখুঁত বলে মনে হচ্ছিল। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে বছরের পর বছর ধরে যা যা কিছুকে আমি সমাপতন বলে ভেবে এসেছি তার অনেক কিছুই আসলে অবধারিত ছিল। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে ওই দুর্গের সাদা মিনারে আমাদের সৈন্যরা কখনোই পৌঁছতে পারবে না এবং অনুভব করলাম যে এই একই কথা হোজাও ভাবছে। আমি এও খুব ভালো করেই জানতাম যে সকালের অভিযানের সময়ে আমাদের অস্ত্রটি তার ভিতরের ও চারপাশের মানুষকে মরার জন্য ফেলে রেখে ওই জলার মধ্যে আটকে যাবে এবং তারপর তার ফলস্বরূপ অভিশাপের গুজব এবং সৈন্যদের আতঙ্ক ও ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য আমার গর্দান নেওয়ার দাবি উঠবে। হোজাও যে এটা খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছে তাও আমি জানতাম। আমার মনে পড়ল যে বহু বছর আগে একবার হোজাকে তার নিজের সম্বন্ধে কথা বলানোর চেষ্টায় আমি তাকে আমার এক ছোটবেলাকার বন্ধুর কথা শুনিয়েছিলাম। সে আর আমি একই সময়ে একই কথা ভাবার অভ্যাস রপ্ত করেছিলাম। হোজাও যে এখন সেই কথাই ভাবছিল তা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না।

সেদিন গভীর রাতে হোজা সুলতানের তাঁবুতে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যে সে যেন আর কখনো ফিরবেই না। সুলতান যে সেদিনের ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি হোজাকে পাশাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে বলবেন তা প্রত্যাশিতই ছিল এবং সেটা করতে গিয়ে হোজা কী বলবে তা সহজেই অনুমেয় ছিল। সেই অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে হোজাকে সেখানেই বোধহয় হত্যা করা হয়েছে এবং ঘাতকরা শীঘ্রই আমার খোঁজে এখানেও এসে হাজির হবে। পরে আবার আমার মনে হল যে সে হয়ত সুলতানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেছে, আমাকে কিছু না বলেই ওই সাদা দুর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং রক্ষীদের নজর এড়িয়ে, জলা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেখানে হয়ত সে পৌঁছেও গেছে। আমি বিশেষ কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নতুন জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক এই সময়ে সে ফেরত এল। সেদিন সুলতানের তাঁবুতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দীর্ঘ বাক্যালাপের সুবাদে বহু বছর পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে সেখানে হোজা ঠিক তাইই বলেছিল যা আমি আন্দাজ করেছিলাম। সেই মুহূর্তে কিন্তু সে আমার কাছে কিছুই ভেঙে বলেনি, কেবল যাত্রার প্রস্তুতিতে মগ্ন কোনো ব্যক্তির মতো ব্যস্তপদে ছোটাছুটি করছিল। সে জানিয়েছিল যে বাইরে অত্যন্ত ঘন কুয়াশা রয়েছে। আমি কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।

দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি দেশে কী কী ফেলে রেখে এসেছিলাম তাই তাকে শোনালাম, কীভাবে সে আমার বাড়ি খুঁজে পাবে তা তাকে বলে দিলাম, আমার মা, বাবা, ভাইবোনদের সম্পর্কে অনেক কথা বললাম এবং এমনকি এমপোলি ও ফ্লোরেন্সে আমাদের পরিবারকে কী চোখে দেখা হয় তাও তাকে না শুনিয়ে ছাড়লাম না। এমনকি ছোটখাটো কিন্তু বিশেষ কিছু চিহ্নের কথাও তাকে বলে দিলাম যার সাহায্যে সে একজনের থেকে অন্যকে সহজেই পৃথক করতে পারবে। কথা বলতে বলতেই আমার মনে পড়ে গেল যে এসব কথা এমনকি আমার ছোট ভাইয়ের পিঠের বড় তিলটার কথাও আমি তাকে আগেও বহুবার বলেছি। সুলতানের মনোরঞ্জন

করতে গিয়ে বা এখন এই বই লিখতে বসে কখনো কখনো এই গল্পগুলোকে সত্যের বদলে নিছক আমার কল্পনার প্রতিফলন বলে মনে হয়েছে, কিন্তু আমি এই গল্পগুলোতেই বিশ্বাস রেখেছি আমার বোনের তোতলামিটা যেমন সত্য, আমাদের জামায় বহু সংখ্যক বোতাম যেমন সত্য তেমনি জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখা আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানের বিভিন্ন জিনিসও সত্য। সকালের দিকে আমার মনে হল যে এসব গল্পগুলো যেন আমায় প্রলোভিত করেছে কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে সেগুলো যেখানে থেমেছিল দেরি হলেও সেখান থেকেই আবার শুরু হবে। আমি জানতাম যে হোজাও একই কথা ভাবছে, সে তার নিজের গল্পকে খুশি মনে বিশ্বাস করছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ও কোনোরকম তাড়াহুড়া ছাড়াই আমরা আমাদের পোষাক অদলবদল করে নিলাম। এত বছর ধরে তার কাছ থেকে বাঁচিয়ে রাখা আংটি ও পদক আমি এখন তাকে দিয়ে দিলাম। তার ভেতরে আমার ঠাকুমার মায়ের একটি ছবি ও আমার প্রেমিকার এক গোছা চুল ছিল। সে চুল এতদিনে সাদা হয়ে গেছে। আমার মনে হল যে জিনিসটা তার পছন্দ হয়েছে কারণ সেটা সে গলায় পরে ফেলল। তারপর সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং রওনা দিল। আমি তাকে ধীরে ধীরে নিশ্চল, নীরব কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। কুয়াশার চাদর আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছিল। নিজেকে ভারি ক্লান্ত লাগল, আমি তার বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবং পরম শান্তিতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

## ১১

এখন আমি আমার বইয়ের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমার কাহিনী আদতে অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে একথা বুঝে গিয়ে সজাগ পাঠকেরা হয়তো ইতিমধ্যে বইটিকে সরিয়েও রেখে দিয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন আমিও এরকমই ভাবতাম। আর কখনো পড়ার ইচ্ছা না থাকায় অনেক বছর আগেই আমি একটি তাকের মধ্যে এই পাতাগুলোকে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। সেই সময় আমি এই বইটিকে, এই কাহিনীটিকে ভুলতে চাইতাম। একদা আমি সুলতানের বদলে কেবল নিজের আনন্দের জন্যই বেশ কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী উদ্ভাবন করেছিলাম। সেসব কাহিনীতে আমার কদাপি না দেখা জনহীন প্রান্তরে বা বরফজমা জঙ্গলে নেকড়ের মতো ধূর্ত এক বণিক ঘুরে বেড়াত। সেই সময় আমার ইচ্ছা ছিল এসব কাহিনীর মধ্যে নিজের মনটাকে ডুবিয়ে রাখব। যত যা কিছু শুনেছি ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার পরে ব্যাপারটা যে আদৌ সহজ হবে না তা আমি জানতাম, তবু হয়ত আমি সাফল্য লাভ করলেও করতে পারতাম যদি না সপ্তাহ দুয়েক আগে এক অতিথি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে আবার বইটি বার করার ব্যাপারে রাজি না করাত। আর আজ? আজ আমি অবশেষে বুঝতে পেরেছি যে আমার সব বইয়ের মধ্যে এটিই আমার সর্বাধিক প্রিয়। এর সমাপ্তি যেমন হওয়া উচিত, যেমন আমি চেয়েছি, যেমনভাবে শেষ করার স্বপ্ন দেখেছি তেমনভাবেই আমি একে শেষ করব।

আমার পুরনো লেখার টেবিলে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ছোট পালতোলা নৌকা সমুদ্রপথে জেন্‌নেথিসার থেকে ইস্তাম্বুলের দিকে যাচ্ছে, দূরে অলিভ কুঞ্জের মধ্যে কলের ডানা ঘুরছে, বাগানে লেবু গাছের তলায় ক্রীড়ারত শিশুরা একে অপরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে। আর ওই দেখা যাচ্ছে ধুলোভরা রাস্তা ইস্তাম্বুল থেকে গেব্‌জের দিকে চলে গেছে। শীতকালে বরফের সময়ে খুব অল্প লোকই এই পথে চলাচল করে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে আনাতোলিয়া এবং এমনকি বাগদাদ ও দামাস্কাস অভিমুখী পূর্বগামী যাত্রীদল চোখে পড়ে। ষাঁড়ে টানা ভগ্নপ্রায় গাড়ির শম্বুক গতিতে চলার দৃশ্য আমি এসময় প্রায়শই দেখতে পাই, আবার কখনো কখনো দূরে কোনো অশ্বারোহীকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি। দূর থেকে তার পোষাক চেনা যায় না, কিন্তু নিকটবর্তী হলে বুঝতে পারি যে সে আমার কাছে আসছে না। বর্তমানে কেউ আর আসে না, আর এখন আমি জেনে গেছি যে আর কেউ আসবেও না।

কিন্তু তাতে আমার কোনো অভিযোগ নেই, আর আমি নিঃসঙ্গও নই। রাজগণক হিসেবে কাজ করার সময়ে আমি প্রচুর পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম, আমি বিবাহ করেছিলাম, আমার চারটি সন্তান আছে। আমি আসন্ন সমস্যাকে আঁচ করতে পেরেছিলাম বলেই সঠিক সময়ে পদত্যাগ করেছিলাম। আমার দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি সম্ভবত এই দূরদৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছিলাম। সুলতানের সেনাদল ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে, পরাজয়-পরবর্তী উন্মত্ততার কালে পা-চাটা ভাঁড়গুলোর ও আমার উত্তরসূরী রাজগণকের গর্দান যাওয়ার পূর্বে, আমাদের পশুপ্রেমী সুলতানের সিংহাসনচ্যুত হওয়ার বহু পূর্বেই আমি এই গেব্জেতে পালিয়ে চলে এসেছিলাম। তারপর এই বাড়িটি বানিয়ে আমার প্রিয় বইপত্র, সন্তান ও জনা দুয়েক ভৃত্য নিয়ে এখানে উঠে আসি। রাজগণকের পদে থাকাকালীনই আমি বিবাহ করেছিলাম। আমার স্ত্রী বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট এবং অত্যন্ত গৃহকর্মনিপুণা। সমগ্র গৃহস্থালি ও আমার অন্যান্য টুকিটাকি কাজ সেই সামলে নেয় যাতে আমি আমার লেখা ও স্বপ্ন নিয়ে মগ্ন থাকতে পারি। সত্তরের দোরগোড়ায় পৌঁছে সারাটা দিন এই ঘরে আমি একাই থাকি। এই পরিবেশে, আমি এখন প্রাণভরে তার কথা চিন্তা করি যাতে আমার কাহিনী ও আমার জীবন এক যথাযথ সমাপ্তি খুঁজে পায়।

অথচ প্রথম কয়েক বছরে এই চেষ্টা কিন্তু আমি মোটেই করিনি। এক দু'বার তার সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে সুলতান বুঝে গিয়েছিলেন যে বিষয়টি আমায় আদৌ আকর্ষণ করছে না। আমার বিশ্বাস তিনিও আর বিষয়টি নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করতে চাননি। তিনি কেবল কৌতূহলী ছিলেন, কিন্তু ঠিক কী বিষয়ে তার কৌতূহল এবং তার তীব্রতা কতটা তা আমি কখনোই বুঝে উঠতে পারিনি। প্রথমে তিনি বলতেন যে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলে বা তার থেকে কিছু শিখে থাকলে তার জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। তিনি তো প্রথম থেকেই জানতেন যে বছরের পর বছর ধরে যত বই, দিনপঞ্জি বা ভবিষ্যদ্বাণী আমি তাকে উপহার হিসেবে প্রদান করেছি তা সবই তারই লেখা। আমি যখন ঘরে বসে আমাদের অস্ত্রের নকশাটা নিয়ে মাজাঘষা করছি তখন এই কথা তিনি তাকে বলেওছিলেন। তিনি এও জানতেন যে একথা সে আমাকে জানিয়েছে। আমিও তো তাকে সবকিছু বলতাম। আমরা উভয়েই সুতোর শেষপ্রান্ত সম্ভবত তখনো হারিয়ে ফেলিনি, কিন্তু আমি এটা উপলব্ধি করেছিলাম যে আমার চেয়ে সুলতানের পা অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রোথিত। তখন আমি ভাবতাম যে সুলতান আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, যা কিছু তার জানার কথা তার সবই তিনি জানেন এবং আমাকে নিয়ে তিনি নিতান্তই ছিনিমিনি খেলছেন যাতে আমাকে আরও ভালো করে তালুবন্দী করে রাখতে পারেন। সেই জলাভূমিতে উপ্ত পরাজয়ের জীবাণু এবং অভিশাপের গুজবে উন্মত্ত হয়ে ওঠা সৈন্যদের ক্রোধ থেকে তিনি আমায় উদ্ধার করেছিলেন বলে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম। সৈন্যরা যখন জানতে পেরেছিল যে কাফেরটি পালিয়ে গেছে তখন তাদের অনেকেই আমার গর্দান নেওয়ার দাবি তুলেছিল। ফলত সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ আমাকে সম্ভবত প্রভাবিত করে থাকবে। প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যদি স্পষ্টভাবে আমার কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাইতেন তবে আমার বিশ্বাস যে আমিও তাকে সেই সম্বন্ধে অকপটে সবকিছু খুলে বলতাম। আমি যা ছিলাম তা আসলে আমি নই এই গুজব

তখনো শুরু হয়নি। আমি চাইতাম যে যা ঘটেছিল তা নিয়ে আমি কারোর সঙ্গে কথা বলি, আমি তার অভাব বোধ করতাম।

এত বছর ধরে যে বাড়িতে তার সাথে একসাথে বাস করে এসেছি সেখানে একা একা থাকতে গিয়ে আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। আমার পকেট অর্থে পরিপূর্ণ ছিল, আমার পদযুগলও দাসবাজারে যাওয়ার রাস্তা শীঘ্রই চিনে নিল। আমার চাহিদামতো দাস খুঁজে পাওয়ার জন্য বেশ কয়েক মাস আমাকে দাসবাজারে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল। অবশেষে আমার বা তার সঙ্গে কোনো মিল নেই এমন একটি বেচারা গোছের দাসকে কিনে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেই রাতে যখন আমি তাকে তার জানা সবকিছু আমাকে শেখাতে বললাম, তার দেশ, তার অতীত ও এমনকি তার যাবতীয় পাপের কথা আমাকে শোনাতে বললাম এবং যখন তাকে আয়নার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম তখন সে আমাকে ভয় পেতে লাগল। সে ছিল এক ভয়ংকর রাত, বেচারা লোকটির জন্য আমার করুণা হচ্ছিল। সকালে তাকে মুক্ত করে দেব এমনই মনস্থির করেছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার কঞ্জুসি ও নীচতাই জয়লাভ করল। ফলত, বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আমি তাকে আবার দাস বাজারে নিয়ে গেলাম। এরপর আমি বিবাহ করব বলে ঠিক করলাম এবং আমার ইচ্ছার কথা আশেপাশে ছড়িয়ে দিলাম। তারা খুশি মনেই আমার ইচ্ছায় সাড়া দিল। তারা ভেবেছিল যে অবশেষে আমাকে তারা তাদেরই একজন করে নিতে পারবে এবং রাস্তাঘাটে শান্তি ফিরে আসবে। তাদের মতো হতে পারব ভেবে আমারও নিজেকে তৃপ্ত লাগছিল। আমার ধারণা ছিল যে গুজব থেমে গেছে এবং সুলতানের জন্য কেবল কাহিনী উদ্ভাবন করেই আমি বছরের পর বছর শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারব। ফলে আমি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে আমি নিজের পত্নীচয়ন করেছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় সে এমনকি আমায় উদ্ বাজিয়ে শোনাত।

গুজব আবার যখন ছড়াতে শুরু করল তখন আমি তাকে সুলতানের আরেকটা কারসাজি বলেই ধরে নিয়েছিলাম কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে ঘাবড়ে দেওয়া প্রশ্ন করতে ও আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে তিনি সবিশেষ পছন্দ করেন। 'আমরা কি নিজেদেরকে চিনি? সে কে তা প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা দরকার।' এসব কথা তিনি যখন আমাকে আচমকা বলতে শুরু করলেন তখন তা নিয়ে আমি খুব একটা ভাবিত হইনি। তার চারপাশে আবার মোসাহেবদের ভিড় জমছিল, তাদের মধ্যে গ্রীক দর্শনে আগ্রহী কিছু সবজান্তাও ছিল। আমি ভেবেছিলাম যে এই ঘাবড়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো তিনি তাদের কাছ থেকেই শিখে থাকবেন। তিনি যখন আমাকে এই বিষয় নিয়ে কিছু লিখতে বললেন তখন আমি গ্যাজেল হরিণ ও চড়াই নিয়ে লেখা আমার শেষ বইটি তাকে দিলাম। গ্যাজেল হরিণ ও চড়াই খুব তৃপ্ত মনে জীবন অতিবাহিত করে কারণ তারা কখনোই নিজেদের সম্বন্ধে ভাবে না এবং তারা যে আসলে কী সে সম্বন্ধে তারা বিন্দুবিসর্গও জানে না। বইটিকে সুলতান যখন বেশ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলেন ও আনন্দের সাথে পড়তে লাগলেন তখন আমি কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু গুজব এবার আমার কান পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে লাগল বলা হচ্ছিল যে আমি নাকি সুলতানকে নির্বোধ বলে মনে করি, আমি যার স্থান গ্রহণ করেছি তার সঙ্গে আমার সামান্য সাদৃশ্যটুকুও নেই, সে অনেক রোগা ও কমনীয় ছিল, তুলনায় আমি অনেক

মোটা হয়ে গেছি, সে যা জানত তার সবকিছুই আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় এই কথা আমি যখন বলি তখন আসলে আমি মিথ্যা বলি, আবার কোনো যুদ্ধের দিনে আমিও দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে আসব এবং তারপর তার মতো পরিত্যাগ করে চলে যাব, সাম্রাজ্যের গোপন কথা শত্রুর কানে তুলে দিয়ে আমি পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস ছিল যে এসব গুজব সুলতান নিজেই ছড়াচ্ছিলেন। এদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমি ভোজসভা ও উৎসবানুষ্ঠানে হাজিরা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম, জনসমক্ষে বের হওয়ায় লাগাম টানলাম, ওজন কমিয়ে ফেললাম এবং সেই শেষ রাতে সুলতানের তাঁবুতে কী কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে সতর্ক অনুসন্ধান চালাতে লাগলাম। আমার স্ত্রী একের পর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল, আমার উপার্জন ভালো ছিল, আমি গুজবগুলোকে এবং তাকে এবং অতীতকে ভুলে যেতে চাইছিলাম আর শান্তিতে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে চাইছিলাম।

আমি আরও প্রায় সাত বছর নিজের কাজ চালিয়ে গেলাম। আমার স্নায়ু যদি আরও শক্তিশালী হত, অথবা তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সুলতানের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে শুদ্ধিকরণ অভিযান চালানো হবে এটা যদি আমি আঁচ করতে না পারতাম তবে আমি হয়ত শেষপর্যন্ত থেকে যেতাম। সুলতান আমার জন্য যে দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন আমি তা পার হয়ে চলে যেতাম এবং আমার বিস্মরণীয় অতীত জীবনকে বয়ে যেতে দিতাম। আমার স্বরূপ নিয়ে তোলা প্রশ্নের সামনে একসময় আমি রক্ষণাত্মক বোধ করলেও এখন তার উত্তর দিতে গিয়ে আমি যথেষ্ট নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিলাম। আমি বলতাম, 'মানুষ আসলে কে তা জানার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমরা কী করেছি এবং কী করব সেটাই হল গুরুত্বপূর্ণ।' আমার বিশ্বাস যে এই রন্ধ্রপথেই সুলতান আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন! যে দেশে সে পালিয়ে গিয়েছিল সেই ইতালি সম্বন্ধে তিনি যখন আমাকে বলতে বললেন আর আমি উত্তরে জানালাম যে সেই দেশ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্তই অল্প তখন তিনি রেগে গেলেন। তিনি জানতেন যে সে আমাকে সবকিছু বলেছিল, আমি ভয় পাচ্ছি কেন, সে যা বলেছিল তা মনে থাকলে সেটাই তো যথেষ্ট। সুতরাং আমি আবার সুলতানের সামনে তার শৈশব ও তার সুন্দর সব স্মৃতির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুরু করলাম। সেসব স্মৃতির কিছু কিছু আমি এই বইতেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রথমদিকে আমার স্নায়ু যথেষ্ট ঠিকঠাকই কাজ করছিল, আমি যেমনভাবে চাইতাম তেমনভাবেই সুলতান আমার কথা শুনতেন—যেন তিনি এমন কারোর কথা শুনছেন যে শুধু অন্য কারোর কাছ থেকে শুনে বলছে তাই নয়, কয়েক বছর চলে যাওয়ার পরে নিজের মন থেকে বাড়তি কিছু যোগ করেও বলছে। তিনি এমনভাবে আমার কথা শুনতেন যেন সে-ই কথা বলছে। তিনি আমার কাছে এমন সব খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চাইতেন যা কেবল তার পক্ষেই জানা সম্ভব, তিনি আমাকে অভয় দিতেন, বলতেন, আমার মাথায় আসা প্রথম উত্তরটিই যেন দিই  কোন্ ঘটনার ফলে তার বোনের তোতলামি বেড়ে গিয়েছিল? পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্থান হল না কেন? ভেনিসে তার ভাই প্রথমবার আতসবাজী প্রদর্শনী দেখার সময়ে কী রঙের পোশাক পরে ছিল? ঘটনাগুলো যেন আমার সঙ্গেই ঘটেছিল এমন ভাব করে আমি সেসব খুঁটিনাটি সুলতানের কাছে বর্ণনা

করতাম আর তা শুনতে শুনতে তিনি দিনভর জলপথে বিহার করতেন, ব্যাঙ ও লিলিফুলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর পাশে বিশ্রাম নিতেন, রূপালি খাঁচায় বন্দী বেহায়া বাঁনরদের পর্যবেক্ষণ করতেন অথবা তাদের যুগল পদচারণার স্মৃতিবাহী কোনো বাগানে হেঁটে বেড়াতেন। স্মৃতি নিয়ে আমাদের খেলা বাগানের ফুলের মতো ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলত। এই সময় আমার গল্পে খুশি হলে সুলতান আমাকে কাছের লোক বলে মনে করতেন এবং তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করতেন। সুলতানের কাছে সে ছিল এমন এক পুরনো বন্ধু যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুলতানের বক্তব্য ছিল যে সে পালিয়ে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে, তাকে সুলতানের আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও তার বেয়াদবি এবং তাকে মেরে ফেলা হবে এই চিন্তা প্রায়শই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত। তিনি এমন কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতেন যা আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিত কারণ আমাদের কোন্ জনের সম্বন্ধে তিনি বলছেন তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তবে তিনি ভালোবেসে কথা বলতেন, তার কণ্ঠস্বরে কোনো হিংস্রতা ছিল না : এমনও দিন গেছে যখন তিনি ভয় পেতেন যে তার আত্ম-অজ্ঞতাকে সহ্য করতে না পেরে রাগের চোটে তাকে বোধহয় তিনি মেরেই ফেলবেন—সেই শেষরাতে তো তিনি ঘাতকদের ডাকার মতো অবস্থাতেও পৌঁছে গিয়েছিলেন! পরে তিনি বললেন যে আমি বেয়াদব ছিলাম না, আমি নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করতাম না, আমি প্লেগের আতঙ্ককে নিজের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিনি, খুঁটিতে বেঁধে হত্যা করা হয়েছিল এমন কোনো নাবালক রাজার কাহিনী শুনিয়ে আমি সকলকে রাতভর জাগিয়ে রাখিনি। কিন্তু এখন! এখন তো আর এমন কেউ রইল না যার কাছে ফিরে গিয়ে সুলতানের কাছ থেকে শুনে আসা স্বপ্ন নিয়ে টিপ্পনি কাটতে পারি, যার সাথে বসে সুলতানকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার জন্য হাস্যকর ও মনোরঞ্জক কাহিনী রচনা করতে পারি! শুনতে শুনতে আমার কেবল মনে হচ্ছিল যে আমি স্বপ্নের মতো বাইরে থেকে আমাকে, আমাদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছি এবং এই সময়ে আমার উপলব্ধি হল যে আমরা সুতোর শেষপ্রান্তটি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু শেষ কয়েক মাসে যেন আমাকে পাগল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সুলতান আরও বহুদূর এগিয়ে গেলেন : আমি তার মতো ছিলাম না, তার মতো আমি কূট তার্কিকদের কাছে মাথা মোড়াইনি যারা 'তাদের' ও 'আমাদের' মধ্যে পৃথকীকরণ করত! আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আতসবাজী প্রদর্শনের সময়ে অষ্টমবর্ষীয় সুলতান অপর পাড় থেকে দেখেছিলেন কেমনভাবে আমার অন্তরের পিশাচটা তার জন্য অন্ধকার আকাশে অন্য পিশাচটিকে জয় এনে দিল আর সে এখন তার সঙ্গে এমন দেশে পাড়ি জমিয়েছে যেখানে সে শান্তি পাবে বলে মনে করে। সারা বছর একইরকম দেখতে থাকে এমন এক বাগানে হাঁটতে হাঁটতে পরে কোনো এক সময় সুলতান চিন্তাশীলভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের চার কোণার ও সাতটি স্তরের সব মানুষই যে পরস্পরের মতোই তা বুঝতে গেলে কি সুলতান হতেই হবে? আমি তো ভয়ে ভয়ে নিরুত্তর রইলাম। আমার প্রতিরোধের অন্তিম প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যই যেন তিনি আবার একবার জিজ্ঞাসা করলেন মানুষ যে একে অপরের স্থান গ্রহণ করতে পারে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ কি এটাই নয় যে সব জায়গার মানুষই অবিকল আরেকজনের মতোই?

যেহেতু আমার আশা ছিল যে কোনো একদিন সুলতান ও আমি উভয়েই তাকে ভুলতে সক্ষম হব এবং যেহেতু আরও বেশি পরিমাণে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম তাই ধৈর্য্যসহকারে এই অত্যাচার আরও সহ্য করা যেতেই পারত, আর তাছাড়া রহস্যে মোড়া অস্পষ্ট আতঙ্ক সহ্য করে চলতে আমি তখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার মনের দরজা অতি নির্দয়ভাবে খুলতেন ও বন্ধ করতেন, যেন কোনো জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে খরগোশের পিছনে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন। আরও গুরুতর ব্যাপার ছিল এই যে কাজটি তিনি এখন সর্বসমক্ষেই করতে শুরু করেছিলেন। পা-চাটা ভাঁড়েরা এখন আবার তাকে ঘিরে থাকত। আমার ধারণা ছিল যে আবার একবার শুদ্ধিকরণ অভিযান হবে এবং আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে। ফলে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। সমস্যা যে শীঘ্রই আসতে চলেছে তা আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। তারপর একদিন ইতিমধ্যেই বহুবর্ণিত এমন কিছু জিনিস যেমন ভেনিসের সেতু, তার ছোটবেলাকার প্রাতরাশের টেবিলে পাতা কাপড়ে লেসের নকশা, তার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা বাড়ির পিছনের বাগান প্রভৃতির বর্ণনা সুলতান আবার আমার কাছে শুনতে চাইলেন। ইসলাম গ্রহণে অরাজি হওয়ার অপরাধে তাকে যখন শিরচ্ছেদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার ওই বাগানের কথা মনে পড়েছিল। এরপর এই কাহিনীগুলো নিয়ে একটি বই লেখার জন্য যখন তিনি আমাকেই আদেশ করলেন যেন ঘটনাগুলো আমার জীবনেই ঘটেছে এবং কাহিনীগুলো আমারই নিজস্ব নথি, তখন ইস্তাম্বুল থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব পালানোর ব্যাপারে মনস্থির করতে আমি বাধ্য হলাম। গেব্‌জেতে একটি অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠলাম যাতে তাকে ভুলে থাকতে পারি। প্রথম প্রথম আমার ভয় ছিল যে প্রাসাদরক্ষীরা হয়ত আমার পিছু পিছু এখানে এসে হাজির হবে। কিন্তু কেউই আমার খোঁজ করল না এবং আমার উপার্জনেও কোনো হাত পড়ল না, হয় আমি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলাম নয় তো সুলতান গোপনে আমার উপর নজর রাখছিলেন। আমিও আর এ নিয়ে ভাবলাম না, নিজের কাজ শুরু করে দিলাম, এই বাড়িটি বানানো হল, আমার মনের মতো করে পিছনের বাগানটি সাজালাম। আমার বইগুলো পড়ে, নিজের আনন্দের জন্য কাহিনী রচনা করে ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের উপদেশ দান করে আমি সময় কাটাতে লাগলাম। অনেকেই জানতে পেরেছিল যে আমি একজন ভূতপূর্ব গণক এবং তাই তারা আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসত। অর্থের চেয়ে মজাই ছিল এই কাজের প্রধান আকর্ষণ। শৈশব থেকে যে দেশে বাস করে এলাম সেই দেশ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান আমি বোধহয় এই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাছ থেকেই আহরণ করেছিলাম। প্রতিবন্ধী, সন্তান বা ভাই হারানোর শোকে ব্যাকুল মানুষ, বারোমেসে রোগী, অনূঢ়া কন্যাদের পিতৃবর্গ, অন্ধ, নাবিক, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির হতাশ প্রেমিক—আমার কাছে পরামর্শ চাইতে যেই আসত তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তাদের মুখ থেকেই আমি তাদের জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনে নিতাম এবং রাতে সেসব আমার খাতায় লিখে রাখতাম যাতে পরে আমার কাহিনীতে তা ব্যবহার করতে পারি। এই বইতেও সেসব কাহিনী আমি ব্যবহার করেছি।

এই সময়েই এক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মুখে গভীর বিষাদের ছাপ নিয়ে সে যখন আমার ঘরে প্রবেশ করল তখন তাকে দেখেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সে আমার থেকে কমপক্ষে দশ বা পনেরো বছরের বড় হবে। এভ্‌লিয়া [এভ্‌লিয়া চেলেবি (১৬১১-৮২ খ্রী.) ছিলেন 'সিয়াহতনামে' (ভ্রমণ) নামে এক বিখ্যাত বইয়ের লেখক] নামক সেই বৃদ্ধটির মুখে বিষাদের ছাপ লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে নিঃসঙ্গতাই হল তার সমস্যা। সে কিন্তু তা বলল না। মনে হল সে তার সমগ্র জীবন পরিক্রমার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং ভ্রমণ সম্পর্কে লেখা তার দশ খণ্ডের বইও এখন শেষ হওয়ার মুখে। মৃত্যুর পূর্বে সে আল্লাতালার দুই প্রিয়তম স্থান মক্কা ও মদিনায় যেতে চায় এবং সেই ভ্রমণ সম্পর্কে লিখতেও চায়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তার বইয়ে একটি অভাব রয়ে গিয়েছে যা তাকে পীড়া দিচ্ছে। ইতালির ফোয়ারা ও সেতুর সৌন্দর্যের বর্ণনা সে এত শুনেছে যে তা সে তার পাঠকদেরও শোনাতে চায়। এখন সে জানতে চায় যে আমি তাকে সে সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। ইস্তাম্বুলে আমার খ্যাতির কথা শুনে সে আমার কাছে এসেছিল। আমি যখন তাকে বললাম যে আমি কখনো ইতালি যাইনি তখন সে বলল যে সেটা সেও জানে কিন্তু সে শুনেছে যে একদা আমার একটি ইতালিয় দাস ছিল এবং সে আমাকে সেখানকার সবকিছুর বর্ণনা দিয়েছে। আমি যদি সেই বর্ণনাগুলো এভ্‌লিয়াকে শোনাই তবে সেও আমাকে তার বদলে নানান আকর্ষণীয় কিস্‌সা শোনাবে। কাহিনী উদ্ভাবন ও আকর্ষণীয় কাহিনী শোনার চেয়ে মধুরতর আর কিছু কি এই জীবনে হতে পারে? সে বিব্রত মুখে তার ঝোলা থেকে একটি মানচিত্র বের করল। ইতালির এত খারাপ কোনো মানচিত্র আমি আর কখনো দেখিনি। আমি ঠিক করলাম যে তার চাহিদামতো বর্ণনা আমি তাকে শোনাব। সে তার শিশুসুলভ গোলগাল হাত দিয়ে মানচিত্রের উপর শহরগুলোকে চিহ্নিত করতে লাগল এবং প্রতিটি শহরের নাম কেটে কেটে উচ্চারণ করার পরে আমার দেওয়া বর্ণনাগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিখে নিতে লাগল। প্রতিটি শহরের জন্য একটি করে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীও তার প্রয়োজন ছিল। যে দেশ আমি আমার জীবনে এই প্রথম দেখছি সেই দেশের তেরোটি শহরে তেরো রাত কাটিয়ে আমরা দেশটির উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চষে ফেললাম। তারপর আমরা সিসিলি থেকে নৌকায় চেপে ইস্তাম্বুলে ফিরে এলাম। এভাবে গোটা সকাল কেটে গেল। আমার বর্ণনা শুনে সে এত খুশি হল যে সেও আমাকে আনন্দ দেবে বলে ঠিক করল। দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটিয়েরা কীভাবে অ্যাক্‌রের আকাশে মিলিয়ে যায় বা কনিয়ার এক মহিলা কীভাবে এক হাতির জন্ম দিয়েছিল এসব শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে সে নীলনদের সন্নিহিত এলাকার নীল ডানাওয়ালা ষাঁড়, গোলাপী বিড়াল, ভিয়েনার ঘড়ি-স্তম্ভ, সেখানে বাঁধানো সামনের দাঁত যা সে হেসে দেখিয়ে দিল, আজভের সমুদ্রপাড়ের কথা-বলা গুহা, আমেরিকার লাল পিঁপড়ে প্রভৃতিরও নানা বর্ণনা শোনাতে লাগল। এসব কাহিনী শুনে কি জানি কেন মনটা ভারি বিষণ্ন হয়ে গেল। আমার প্রায় কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় আমার ঘর তখন ভেসে যাচ্ছিল। এরপর এভ্‌লিয়া যখন জানতে চাইল যে আমার ঝুলিতেও এরকম বিস্ময়কর কোনো কাহিনী আছে কি না তখন আমি তাকে প্রকৃতই চমকে দেব বলে ঠিক করলাম এবং তাকে তার ভৃত্যাদিসহ রাতে থেকে যাওয়ার

আমন্ত্রণ জানালাম। তাকে সত্যি সত্যিই আনন্দদানের মতো একটি কাহিনী আমার কাছে ছিল : দুটি লোকের কাহিনী যারা নিজেদের জীবন বদলাবদলি করে নিয়েছিল। সে রাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে ঢুকে যাওয়ার পরে এবং বাড়ি জুড়ে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত নীরবতা নেমে আসার পরে আমরা আরও একবার ঘরে এসে ঢুকলাম। সেই প্রথম আমার মনে হল যে আমি এবার কাহিনীটি শেষ করার মতো জায়গায় চলে এসেছি! আমার বলা কাহিনীটিকে বানানো বলে মনেই হল না, মনে হচ্ছিল তা প্রকৃতই ঘটেছে। অন্য কেউ একজন যেন ফিসফিস করে আমাকে শব্দগুলো জুগিয়ে যাচ্ছিল, ক্রম মেনে বাক্যগুলোও যেন একের পর এক এসে হাজির হয়ে যাচ্ছিল 'তুর্কী নৌবহর যখন দেখা গেল তখন আমরা ভেনিস থেকে নেপলসের দিকে যাচ্ছিলাম...'

আমার কাহিনী যখন শেষ হল তখন মধ্যরাত পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। তারপরেও দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। আমরা দুজনেই যে তার কথা ভাবছিলাম তা আমি অনুমান করতে পারলাম, কিন্তু এভ্‌লিয়ার মনে সে যে চেহারায় ধরা দিয়েছে তা আমার মনে উপস্থিত তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আমার কোনো সন্দেহই ছিল না যে এভ্‌লিয়া প্রকৃতপক্ষে তার নিজের জীবনের কথাই ভাবছে! আর আমি! আমি ভাবছিলাম আমার নিজের জীবনের কথা, তার কথা, আমার তৈরি করা কাহিনীটিকে আমি কত ভালোবাসি সেকথা; যা কিছু আমি যাপন করেছি বা যা কিছুর স্বপ্ন দেখেছি তার প্রতিটির জন্যই আমি গর্ববোধ করলাম। আমরা উভয়েই একদা কী হতে চেয়েছিলাম এবং শেষপর্যন্ত কী হয়েছি এই সম্পর্কিত বিষণ্ন স্মৃতিতে আমাদের ঘর ভরে গেল। এই প্রথম আমি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারলাম যে আমি তাকে কখনোই ভুলতে পারব না এবং এর জন্য আমার জীবনের বাকি দিনগুলো বিষণ্নতায় কাটবে। আমি বুঝে গেলাম যে একাকী আমি কখনোই বাস করতে পারব না। আমার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যরাতের অন্ধকারে এক লোভন মায়ামূর্তির ছায়াও যেন আমার ঘরে ঢুকে এল, তা একই সঙ্গে আমাদের কৌতূহলও জাগিয়ে তুলল আবার আমাদের রক্ষণাত্মক হতেও বাধ্য করল। তখন ভোর প্রায় হয়ে এসেছে, আমার কাহিনী অতিথির পছন্দ হয়েছে শুনে আমি খুশি হলাম, কিন্তু সে এও যোগ করল, যে কিছু কিছু খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে সে ভিন্নমত পোষণ করে। আমার জুড়িদারের অস্বস্তিকর স্মৃতিকে এড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব আবার আমার নতুন জীবনে ফিরে আসার জন্য আমি তার কথায় মনোনিবেশ করলাম।

সে আমার কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একমত হল যে অদ্ভুত ও বিস্ময়করের খোঁজ আমাদের করতেই হবে। হ্যাঁ, এই দুনিয়ার ক্লান্তিকর একঘেয়েমির সঙ্গে লড়াই করতে গেলে সম্ভবত এটিই একমাত্র উপায়। শৈশব ও বিদ্যালয়ের একঘেয়ে দিনগুলো থেকেই যেহেতু সে এই সত্যটি উপলব্ধি করে এসেছে তাই জীবনে কখনোই সে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকার কথা ভাবেনি। অন্তহীন রাস্তাতেই সর্বদা সে কাহিনীর খোঁজ করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই অদ্ভুত ও বিস্ময়করকে খুঁজতে হবে এই দুনিয়ায়, নিজেদের মনের ভিতরে তাদের খুঁজতে গেলে চলবে না! অদ্ভুত ও বিস্ময়করকে নিজেদের অন্তরে খুঁজতে গেলে, নিজেদের সত্তা সম্পর্কে এত দীর্ঘ ও তীব্র চিন্তা করলে তা কেবল আমাদের অসুখীই করে তুলবে। আমার কাহিনীর চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক

এটিই ঘটেছে, এই কারণেই নায়করা তাদের নিজেদের সত্তাকে কখনোই সহ্য করতে পারে না, এই কারণেই তারা সর্বদা অন্য কেউ হতে চায়। ধরে নেওয়া যাক আমার কাহিনীতে যা কিছু ঘটেছে তার সবই সত্যি। নিজেদের জায়গা অদলবদল করে নিল ওই যে দুটি মানুষ তারা তাদের নতুন জীবনে খুশি হতে পারবে বলে কি আমি বিশ্বাস করি? আমি চুপ করে রইলাম। পরে কোনো এক কারণে সে আমার কাহিনীর একটি জায়গা আমাকে মনে করিয়ে দিল  কোনো একহাতওয়ালা স্পেনীয় দাসের আশায় আমরা নিজেদেরকে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেতে দিতে পারি না! কিন্তু ওই জাতীয় কাহিনী লিখে বা নিজেদের অন্তরে খোঁজ করতে গিয়ে আমরা যদি একটু একটু করে হলেও সেই চেষ্টাই করতে থাকি তবে আমরাও অন্য কেউ হয়ে যাব, এবং আল্লাহ না করুন, আমাদের পাঠকরাও তাই হয়ে যাবে। মানুষ যদি সবসময় নিজের ও নিজের অদ্ভুতত্ব নিয়ে কথা বলে, যদি তার বই ও কাহিনীর বিষয় সর্বদা এইই হয় তবে দুনিয়া কি ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে তা সে কল্পনাতেও আনতে চাইল না।

কিন্তু আমি চাইলাম! এই ছোটখাটো বৃদ্ধটিকে আমি একদিনের মধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ভোরবেলায় নিজের সঙ্গীসাথীদের জড়ো করে সে যেইমাত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল, আমিও অমনি নিজের কাহিনী লিখতে বসে পড়লাম। আমার পাঠকদের সুবিধার্থে আমি আমার কাহিনীর সেই ভয়ংকর দুনিয়ায় আমাকে ও আমার থেকে অচ্ছেদ্য তাকে জীবন্ত করে তোলবার যারপরনাই চেষ্টা করলাম। কিন্তু ষোলবছর আগে যার থেকে সরে এসেছি তার দিকে আবার ফিরে তাকাতে গিয়ে আমার সম্প্রতি এটাই মনে হয়েছে যে আমি খুব একটা সফল হতে পারিনি। তাই মানুষ, বিশেষত যে মানুষ এরকম বিভ্রান্তিকর আবেগের মাঝে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয় সে নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখলে তা পড়তে যেসব পাঠক পছন্দ করেন না তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং আমার বইয়ে এই পাতাগুলো যোগ করছি :

আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম, স্বপ্নে দেখা নিজসত্তার অভাগা, অসহায় আবছায়াকে আমি যেমন ভালোবাসতাম তাকেও তেমনি ভালোবেসেছিলাম। আবছায়ার লজ্জা, ক্রোধ, পাপবোধ ও বিষণ্নতা অনুভব করে দমবন্ধ হয়ে আসার মতো, কোনো বন্য পশুকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে লজ্জায় ডুবে যাওয়ার মতো বা নিজের বখে যাওয়া পুত্রের স্বার্থপরতায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠার মতো তীব্র ছিল সেই ভালোবাসার অনুভূতি। তার প্রতি আমার ভালোবাসায় সবচেয়ে বেশি ছিল সম্ভবত আমার নিজেকে জানার নির্বোধ বিতৃষ্ণা ও আনন্দ। নিজের হাতের নিষ্ফলা পতঙ্গসম নড়াচড়ার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার মধ্যে নিহিত ছিল যে ভালোবাসা, প্রতিদিন নিজের মনের দেওয়ালে ধাক্কা মেরে হারিয়ে যাওয়া ভাবনাগুলোকে বোঝার প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত ছিল যে ভালোবাসা, আমার ক্ষয়াটে শরীর, পাতলা হয়ে আসা চুল, কুৎসিত মুখ, কলমধরা গোলাপী হাত প্রভৃতি থেকে নির্গত ঘামের বিশেষ গন্ধটাকে চিনতে পারার মধ্যে নিহিত ছিল যে ভালোবাসা, তেমনই ছিল তার প্রতি আমার ভালোবাসা। এই কারণে আমি প্রতারিত হইনি। আমার বই লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে হাওয়ায় অনেক গুজব ভেসে বেড়ালেও বা আমাদের সুখ্যাতির সুবিধা নিতে উদ্‌গ্রীব মানুষরা অনেক চাল চাললেও তার কোনোকিছুই আমার উপরে বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে

পারেনি!!! কায়রোর কোনো এক পাশা তাকে নিজের আশ্রয়ে রেখে দিয়েছেন এবং এখন সে আবার এক নতুন অস্ত্রের নকশা বানাচ্ছে! ভিয়েনায় ব্যর্থ আক্রমণের সময়ে আমাদের কীভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায় শত্রুকে সেই পরামর্শ শহরের ভিতরে বসে সেই দিয়েছিল! তাকে ভিখারীর ছদ্মবেশে এডির্নেতে দেখা গেছে এবং বণিকদের মধ্যে সে নিজেই ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে সেই ঝগড়া চলাকালীন এক কম্বলওয়ালাকে ছুরি মেরে অদৃশ্য হয়ে গেছে! বহু দূরের এক আনাতোলিয় গ্রামের পার্শ্ববর্তী মসজিদে সে এখন ইমাম, সেখানে সে একটি ঘড়িঘর তৈরি করেছে ও একটি ঘড়িস্তম্ভের জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছে—এই কাহিনীর প্রচারকরা আবার এটিকে সত্য বলে কসম খেত! সে প্লেগের গমনপথ অনুসরণ করে স্পেনে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সেখানে বই লিখে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে! তারা এমনকি এও বলত যে আমাদের দুর্ভাগা সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করার পিছনেও সেই ছিল। সে স্লাভ গ্রামগুলোতে বসবাস করছে, সেখানে একজন কিংবদন্তীসম সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত যাজক হিসেবে তাকে শ্রদ্ধা করা হয়, শেষপর্যন্ত সে সেই সত্য স্বীকারোক্তি শুনতে পেয়েছে এবং তাই সম্বল করে সে হতাশায় পরিপূর্ণ বই লেখে! আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে সে তার ভবিষ্যদ্বাণী ও কাব্যের সাহায্যে কিছু মানুষকে মুগ্ধ করেছিল, তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছে এবং সেই দলে যোগদান করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছে! এই ষোল বছর ধরে আমি কাহিনী রচনা করে গেছি যাতে তাকে ভুলতে পারি, ওইসব ভয়ংকর মানুষ ও তাদের ভয়ংকর ভাবী দুনিয়া দ্বারা নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারি এবং কল্পনার আনন্দকে পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে পারি, আর এই গোটা সময়কাল জুড়েই এসব গুজবের নানা রকমফের আমি শুনেছি, কিন্তু তার কোনোটাই বিশ্বাস করিনি। আমি জানি না অন্যদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটে কি না সোনালি শিঙার সর্বশেষ প্রান্তে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী বলে যখন মনে হত, যখন প্রাসাদ বা অন্য কোথাও থেকে নিমন্ত্রণের আশায় বসে থাকতে থাকতে মনে হত যে তা আর কখনোই আসবে না, যখন পরস্পরের প্রতি ঘৃণা উপভোগ করতে করতে সুলতানের জন্য আরেকটা লেখা প্রস্তুত করে ফেলতাম তখন আমাদের মন দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো খুঁটিনাটিতে নিবদ্ধ রাখতাম : সেদিন সকালে দেখা বৃষ্টিতে ভেজা কোনো কুকুর, দুটি গাছের মাঝখানে দড়িতে ঝোলানো জামাকাপড়ের রঙ ও আকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত জ্যামিতি, হঠাৎ মুখ ফস্কে বলে ফেলা কিছু যা থেকে জীবনের সমরূপতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে! এই মুহূর্তগুলোর অভাবই আমি সবচেয়ে বেশি বোধ করি! এই কারণেই আমি আমার আবছায়ার বইটির কাছে ফিরে এসেছি, আমার ভাবতে ভালো লাগে যে তার মৃত্যুর বহু বছর পরে, হয়ত কয়েকশো বছর পরে, কোনো কৌতূহলী পাঠক তা পড়বে এবং তা থেকে আমাদের জীবনের চেয়ে মূলত তার জীবনেরই ছবি আঁকার চেষ্টা করবে। এই হল সেই বই যা কেউ কখনো পড়বে কি না তা নিয়ে আমার বিশেষ ভাবনাও ছিল না। খুব গভীরে না হলেও এই বইয়ের ভিতরে আমি তার নাম লুকিয়ে রেখেছি, দাফন করে দিয়েছি যাতে প্লেগের রাতগুলো, এডির্নেতে অতিবাহিত আমার শৈশব, সুলতানের বাগানে কাটানো আনন্দমুখর সময়, পাশার দরজায় দাড়িহীন অবস্থায় তাকে প্রথমবার দেখা, শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে আসা প্রভৃতির স্বপ্ন আমি আবার একবার দেখতে পারি। যে

জীবন ও স্বপ্নকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তার উপর পুনর্বার হাত রাখতে গেলে যে আবার সেসবের স্বপ্ন দেখা জরুরী তা প্রত্যেকেই বোঝে  আমি আমার কাহিনীতে বিশ্বাস করেছিলাম! যেদিন আমি বইটি শেষ করব বলে মনস্থির করলাম সেদিনের কথা বলে আমি আমার বইয়ে ইতি টানব  দুই সপ্তাহ আগে একদিন আমাদের টেবিলে বসে অন্য একটি কাহিনী ভাবার চেষ্টা করছিলাম। এই সময় ইস্তাম্বুল থেকে আসার রাস্তা ধরে এক আরোহীকে আসতে দেখলাম। তার সাম্প্রতিক কোনো খবর আমি কারোর কাছ থেকেই পাইনি। অতিথিদের সঙ্গে আমার ব্যবহার সম্ভবত এত রূঢ় ছিল যে আর কোনো নতুন অতিথি আমার কাছে আসবে এ আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু ঢিলেঢালা বহির্বাস পরিহিত ও হাতে ছাতাধরা লোকটির দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্রই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আসছে। ঘরে ঢোকার আগেই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তার মতো অতটা না হলেও সেও অশুদ্ধ তুর্কীতেই কথা বলছিল। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই সে ইতালিয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। যখন সে দেখল যে তার ভাষা শুনে আমার মুখ বেঁকে গেছে ও আমি কোনো উত্তর দিচ্ছি না তখন সে আবার অশুদ্ধ তুর্কীতে ফিরে গিয়ে জানালো যে তার আশা ছিল যে আমি অল্প হলেও ইতালিয় ভাষা জানব। সে জানাল যে আমার নাম ও আমি কে তা সে তার কাছ থেকে জেনেছে। তুর্কীদের সঙ্গে তার অবিশ্বাস্য অভিযান, পশুপ্রেমী ও স্বপ্নপাগল শেষ তুর্কী সুলতান, প্লেগ ও তুর্কী জনগণ, রাজদরবারে বা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে সে দেশে ফেরার পরে অনেক বই লিখেছে। অভিজাত ও বিশেষত বনেদী নারীদের মধ্যে অচেনা প্রাচ্য সম্বন্ধে কৌতূহল সবে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল, ফলে তার লেখাগুলো সাদরে গৃহীত হল, তার বইগুলো প্রচুর পরিমাণে লোকে পড়তে হতে লাগল, সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল এবং এভাবে সে ধনী হয়ে উঠল। অধিকন্তু তার প্রাক্তন প্রেমিকা তার লেখার রোমান্টিকতায় এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে সে নিজের বয়স বা অনতিঅতীতে স্বামীর মৃত্যুর কথা না ভেবে তাকে বিয়েই করে বসল। তার পুরনো পারিবারিক আবাসস্থলটি ভেঙে পড়ছিল এবং বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল। তারা সেই বাড়ি আবার কিনে নিয়ে সেখানে সংসার পেতে বসল, সেই বাড়ি ও বাগান তার আগের চেহারা ফিরে পেল। আমার অতিথি এত কিছু জানে কারণ সে তার লেখার গুণমুদ্ধ হওয়ায় তার সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল। সে অত্যন্ত বিনম্র ব্যবহার করেছে, গোটা দিনটিই সে অতিথির সঙ্গে কাটিয়েছে ও তার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, তার বইতে যত অভিযানের কথা সে লিখেছিল তার সবই তাকে আবার নতুন করে শুনিয়েছে। সেই সময়েই সে আমাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল। 'আমার পরিচিত এক তুর্কী,' এই শিরোনামে সে আমাকে নিয়ে একটি বই লিখেছে। এই বইয়ের মাধ্যমে এডির্নেতে অতিবাহিত আমার শৈশব থেকে শুরু করে তার চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত আমার গোটা জীবনকাহিনী সে তার ইতালিয় পাঠকদের কাছে পেশ করেছে, এর সঙ্গে থাকছে তুর্কীদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা। আমার অতিথিটি বলল, 'আপনি তাকে আপনার নিজের সম্পর্কে এত কিছু বলেছেন!' পরে সে আমার ঔৎসুক্য আরও বাড়ানোর জন্য সেই বইয়ের অল্প যা কিছু সে পড়ার সুযোগ পেয়েছে তাও আমাকে শোনাল  প্রতিবেশী

এলাকার এক ছোটবেলাকার বন্ধুকে নির্দয়ভাবে প্রহার করার পর আমি লজ্জিত হয়েছিলাম এবং অনুশোচনায় কেঁদে ফেলেছিলাম, আমি বুদ্ধিমান ছিলাম, তার শেখানো যাবতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান আমি ছ'মাসের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম, আমি আমার বোনকে খুব ভালোবাসতাম, আমি নিজ ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলাম, আমি নিয়মিত নামাজ পড়তাম, শুকনো চেরী আমি পছন্দ করতাম, আমার সৎ পিতার পেশা, কম্বল সেলাই করার প্রতি আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল, অন্য সব তুর্কীদের মতোই আমি মানুষ ভালোবাসতাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার প্রতি এত উৎসাহ দেখানোয় আমি অনুভব করলাম যে এই সরল মানুষটির সঙ্গে আমি শীতল ব্যবহার করতে পারব না। তার মতো ভ্রমণার্থী নিশ্চিতভাবেই উৎসাহী হবে ভেবে আমি তাকে আমার বাড়ির প্রতিটি ঘর ঘুরিয়ে দেখালাম। বাগানে আমার পুত্ররা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল। তাদের খেলাগুলো দেখে সে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে নিজের খাতায় ডাংগুলি, কানামাছি ও ব্যাংলাফ খেলার যাবতীয় নিয়মকানুন লিখে নিল এবং তাকে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিতে হল। ব্যাংলাফ খেলাটি অবশ্য তার খুব একটা পছন্দ হল না। এই সময় সে বলল যে সে তুর্কীদের গুণমুগ্ধ। আর কিছু করার না থাকায় তাকে প্রথমে আমার বাগান ও তারপর গেব্‌জে শহর ঘুরিয়ে দেখালাম এবং বহু বছর আগে তার সাথে যে বাড়িতে আমি একসাথে থাকতাম সেই বাড়িটিও তাকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। তখন সে আবার তার গুণমুগ্ধতার কথা বলল। এরপর তাকে আমাদের রান্নাঘরে নিয়ে এলাম। মোরব্বা, আচার, অলিভ তেল বা ভিনিগারের বয়ামের ভীড়ের মধ্যে তাকে আকৃষ্ট করল আমার একটি তৈলচিত্র যেটি আমি এক ভেনেসীয় চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়েছিলাম। এই সময়ে কোনো গোপন কথা ফাঁস করার ভঙ্গিতে অতিথিটি আমার কাছে স্বীকার করে নিল যে সে আদতে তুর্কীদের প্রকৃত সুহৃদ নয় এবং তুর্কীদের শুনতে ভালো লাগবে না এমন অনেক কথা সে লিখেছে : সে লিখেছিল যে আমাদের দিন ফুরিয়ে আসছে, আমাদের মস্তিষ্ককে সে আজেবাজে জিনিসে পরিপূর্ণ তাকের সঙ্গে তুলনা করেছিল, সে বলেছিল যে আমাদেরকে পাল্টানো সম্ভব নয়, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে আমাদের একমাত্র উপায় হল সত্বর নিজেদেরকে সমর্পণ করা এবং এরপর আমরা যাদের অধীনতা স্বীকার করব তাদের অনুকরণ করা ছাড়া পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না। তাকে থামানোর জন্য আমি বললাম, 'কিন্তু সে আমাদের বাঁচাতে চেয়েছিল' এবং সে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল, হ্যাঁ, আমাদের জন্য সে এমনকি একটি অস্ত্রও বানিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাকে বুঝতে পারিনি; ঝড়ের পরে জলদস্যুদের জাহাজের যেমন অবস্থা হয় জলাভূমিতে আটকে গিয়ে সেই যুদ্ধাস্ত্রটিরও ওই একই দশা হয়েছিল। তারপর অতিথিটি আরও যোগ করল হ্যাঁ, সে সত্যিই চেয়েছিল, ভীষণভাবেই চেয়েছিল আমাদের বাঁচাতে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে তার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না, সব প্রতিভাধরই ওরকম হয় : আমার তৈলচিত্রটি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে প্রতিভা সম্পর্কে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগল : আমাদের হাতে দাসত্ব ভোগ করার বদলে সে যদি নিজের দেশে জীবনযাপনের সুযোগ পেত তবে হয়ত সে সপ্তদশ শতাব্দীর লিওনার্দোও হয়ে উঠতে পারত। তারপর সে তার প্রিয় বিষয় অসততায় ফিরে গেল এবং অর্থ ও তাকে জড়িয়ে দু'একটি কুৎসিত গুজব শোনাল।

এগুলো আমি আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। 'সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল,' সে তারপর বলল, 'যে আপনি তার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হননি!' অতিথিটি বলল যে সে আমাকে ভালোবেসে জানতে এসেছিল, সে বিস্ময় প্রকাশ করল এতগুলো বছর ধরে একসাথে বসবাস করেছে যে দুটি মানুষ তাদের মধ্যে এত অল্প সাদৃশ্য কী করে থাকতে পারে, কী করে তারা পরস্পরের থেকে এত অন্যরকম হতে পারে তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। আমার আশঙ্কা ছিল যে সে আমার প্রতিকৃতিটি চেয়ে বসতে পারে, কিন্তু তা সে চাইল না। সেটিকে জায়গামতো রেখে দিয়ে সে কম্বল দেখতে চাইল। 'কোন্ কম্বল?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বিস্মিত হওয়ার পালা এবার তার : অবসর সময়ে কি আমি কম্বল সেলাই করি না? এই প্রশ্ন শুনে আমি ঠিক করলাম যে তাকে সেই বইটি দেখাব যেটি গত ষোল বছরে আমি কখনো স্পর্শ করিনি।

বইটি দেখার সম্ভাবনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানাল যে সে তুর্কী পড়তে পারে এবং তার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ের ব্যাপারেই সে অত্যন্ত উৎসুক। বাগানের উপরে আমার লেখার ঘরে আমরা গিয়ে ঢুকলাম। সে আমাদের টেবিলে গিয়ে বসল। ষোল বছর আগে আমি বইটিকে যেখানে গুঁজে রেখেছিলাম সেখান থেকেই টেনে বের করলাম, মনে হল আমি বোধহয় গতকালই বইটি ওখানে রেখেছি। তার সামনে আমি বইটি মেলে ধরলাম, ধীরে ধীরে হলেও সে তুর্কী ভাষা পড়তে পারল। সে বইটির মধ্যে ডুবে গেল, কিন্তু নিজের স্বাভাবিক ও নিরাপদ দুনিয়াকে ছাড়ল না। এই বৈশিষ্ট্যটি আমি সকল ভ্রমণার্থীর মধ্যেই লক্ষ্য করি এবং রীতিমতো ঘৃণাও করি। আমি তাকে একা ছেড়ে দিলাম, বাগানে গিয়ে খড়বিছানো খাটটির উপরে বসলাম। খোলা জানালা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে তাকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল, জানালা দিয়ে হেঁকে সে আমাকে বলল, 'এ তো একদম পরিষ্কার যে আপনি কখনোই ইতালিতে পা রাখেননি!' কিন্তু শীঘ্রই সে আমাকে ভুলে গেল, পরবর্তী তিন ঘণ্টা তার বইটা পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আমি বাগানে বসে রইলাম এবং মাঝেমাঝে আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করছিলাম। তখনো তার মুখে বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার ছাপ ছিল, কিন্তু ততক্ষণে সে বুঝে গেছে। আমাদের অস্ত্রটিকে গিলে ফেলা জলার পিছনে অবস্থিত সফেদ দুর্গের নামও সে দু-একবার জোরে জোরে উচ্চারণ করল এবং প্রচেষ্টা বৃথা গেলেও আমার সঙ্গে ইতালিয় ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। তারপর সে ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে এতক্ষণ ধরে যা পড়েছে তা আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছিল এবং তার নিজের ধাতস্থ হওয়াও জরুরী ছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে অসীম শূন্যতার মাঝে কোনো অস্তিত্বহীন দৃশ্যবস্তুর দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেল। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ এমন আচরণই করে। কিন্তু তারপর আমার প্রত্যাশা মতোই তার দৃষ্টি স্থিত হল : এখন সে জানালার ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান বাইরের জগতকে দেখছিল। আমার বুদ্ধিমান পাঠকেরা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে সে ততটা নির্বোধ নয় যতটা আমি ভেবেছিলাম। আমার প্রত্যাশানুযায়ীই সে এবার লোভীর মতো আমার বইয়ের পাতাগুলো ঘাঁটতে লাগল। আমিও আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময়ে সে তার প্রয়োজনীয় পাতাটি খুঁজে পেয়ে গেল এবং গোগ্রাসে পড়ে নিল। তারপর বাগানের দিকের খোলা জানালাটি

দিয়ে আমার বাড়ি ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সে কী দেখল। একটি টেবিলের উপর ঝিনুকের বহুবর্ণ খোলায় করে পিচ ও চেরী ফল রেকাবীতে সাজিয়ে রাখা ছিল, টেবিলের পিছনে খড়ের মাদুর বিছানো একটি খাট পাতা আর তার উপরে সবুজ জানালার ফ্রেমের মতো একই রঙের তাকিয়া রাখা ছিল। সত্তর ছুঁই ছুঁই আমি তখন সেখানে বসেছিলাম। আরও পিছনে অলিভ ও চেরী গাছে ঘেরা একটি কুয়ার কিনারে একটি চড়ুই বসেছিল। তার সেদিকে চোখ পড়ল। আখরোট গাছের উঁচু ডাল থেকে লম্বা দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটি দোলনা মৃদুমন্দ হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছিল।

-০-